বেদের পরিচয়

(বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস)

ডঃ যোগীরাজ বসু, এম্. এ. (ট্রিপস্), পি. এচ্. ডি.
প্রধান অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগ,
গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়।
পরিদর্শী অধ্যাপক (Visiting Professor), প্রাচ্য বিদ্যা বিভাগ,
গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম জার্মানী।

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২ : : ১৯৫৭

ওঁ

ওঁ স্বস্তি

উৎসর্গ

যে দুইজন অলোকসামান্য প্রতিভাবান্ পরমশ্রদ্ধেয় আচার্যের নিকট ছাত্রজীবনে বেদ অধ্যয়নের সৌভাগ্য হইয়াছিল সেই শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রীর করকমলে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করিলাম।

স্নেহধন্য অন্তেবাসী
যোগীরাজ বসু।

ওঁ

মুখবন্ধ

আমার একাধারে পরমস্নেহাস্পদ ও গৌরবাস্পদ ছাত্র কল্যাণীয় শ্রীমান যোগীরাজ বসুর রচিত 'বেদের পরিচয়' গ্রন্থটি পাঠ করিয়া সন্তুষ্টি ও গভীর-তৃপ্তি লাভ করিলাম। বাংলাভাষায় এরূপ একটি গ্রন্থের অতীব প্রয়োজন ছিল। বেদ-বিষয়ক বহু তথ্যসম্বলিত এরূপ মূল্যবান্ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ শুধু বাংলা-ভাষায় নহে, কোনও ভারতীয় ভাষায় বা ইংরাজী ভাষায় নাই। বাংলা ভাষায় বেদপরিচয়মূলক অল্পসংখ্যক পুস্তক আছে কিন্তু সে সকল গ্রন্থ অসম্পূর্ণ, একদেশদর্শী। কোনটিতে সামান্য বেদের কথা লিখিয়া বৈষ্ণব-সঙ্গীতাদিতে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে, কোনটিতে বেদের সূক্তের অনুবাদে শতাধিক পৃষ্ঠা পূর্ণ, কোনটিতে আবার বেদবহির্ভূত বিষয় সিংহলী প্রবাদবাক্যাদি স্থান পাইয়াছে; কোনটি আবার ইংরাজীভাষানিবদ্ধ বেদের ইতিহাসের সংক্ষেপ মাত্র। শ্রীমান্ যোগীরাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্. বেদের লক্ষণ, বেদাঙ্গ, বেদের শাখা, বেদের স্বর, বেদ পাঠের ভিন্ন ভিন্ন রীতি, যজ্ঞ, দেবতাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছে। বেদের শাখা, বেদ পাঠের ভিন্ন ভিন্ন রীতি, যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ, দেবতাবিচার, গ্রীক ভাষার স্বর প্রভৃতির সহিত তুলনামূলকভাবে বেদের স্বর প্রভৃতির আলোচনা বেদের ইতিহাস-মূলক অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বেদের প্রামাণ্য নিত্যত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব বিচারে শ্রীমান্ ছয়টি দর্শনের সিদ্ধান্ত ও সেই সকল সিদ্ধান্তের তুলনামূলক আলোচনা এবং ছয় দর্শন ব্যতীত পাণিনি, পতঞ্জলি প্রভৃতির সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছে; লেখকের সুগভীর পাণ্ডিত্য, ব্যাপক-অধ্যয়ন, দর্শনশাস্ত্রে অধিকার ও সূক্ষ্মবিচারশক্তি এই সকল আলোচনায় সুপ্রকটিত। বেদভাষ্যের উপক্রমণিকাতে সায়ণাচার্য অপৌরুষেয়ত্ব নিত্যত্ব প্রামাণ্য প্রভৃতি বিচারে ছয় দর্শনের সিদ্ধান্ত দেন নাই ও সর্ববিধ দার্শনিক আলোচনা করেন নাই। বসুর গ্রন্থটি সহজবোধ্যভাষায় সাবলীল ভঙ্গীতে লিখিত। শুধু সাধারণ পাঠক সমাজ নহে, স্নাতকশ্রেণী ও স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণের একটি বড় অভাব এই গ্রন্থদ্বারা দূর হইল। বেদ শাস্ত্রের সর্ববিধ তথ্য, বৈদিক বাঙ্ময়ের ইতিহাসের সঙ্গে পূর্বমীমাংসার বেদবিষয়ক নিত্যত্ব, প্রামাণ্য, অপৌরুষেয়ত্ব, বেদের লক্ষণের বিস্তৃত আলোচনা স্নাতকোত্তর শ্রেণীর

ছাত্রদের সায়ণকৃত ঋগ্‌ভাষ্যোপক্রমণিকা বুঝিতে ও বেদবিষয়ক অন্যান্য দর্শনের সিদ্ধান্ত জানিতে অশেষ সহায়তা করিবে। অনুরূপভাবে যজ্ঞের বিস্তৃত আলোচনা বিনিয়োগ বুঝিবার এবং দেবতাতত্ত্বের ব্যাপক আলোচনা নিরুক্তের দেবতাবিচার বুঝিবার সহায়ক হইবে। গ্রন্থকার বঙ্গভাষাভাষী পাঠকবর্গের ও সংস্কৃতাধ্যয়নরত ছাত্রসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসার ন্যায্য দাবী রাখে।

চারিবেদের সুবিশাল ব্রাহ্মণগ্রন্থে বৈদিকযুগের কৃষ্টি ও সভ্যতার সর্ববিধ-চিত্র শ্রীমান বসু তাহার রচিত 'India of the age of the Brahmans' অমূল্য গ্রন্থে তুলিয়া ধরিয়াছে। গত বৎসর গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের বিদ্বৎসমাজে অকৃত্রিম সমাদর ও ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে এই বিষয়ে তাহার গ্রন্থই প্রথম গ্রন্থ। ঐ যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যুদ্ধবিদ্যানিষ্ঠ, ধর্ম, দর্শন ও বিবিধ, সর্ববিধ তথ্য গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীমান যোগীরাজের যেমন নাম তার জীবনও তদ্রূপ। সে আজন্ম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তাহার যাবতীয় উপার্জন একটি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে ও একটি ছাত্রকল্যাণকেন্দ্রে উৎসর্গীকৃত। একাধারে সে জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী। মুক্তপুরুষ পরমহংস শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ চালনায় তাহার জীবন গঠিত। পাশ্চাত্ত্য হইতে লোভনীয় Visiting Professor পদে দুইবার আমন্ত্রণ পাইয়াও যায় নাই। এবার আমাদের সনির্বন্ধ নির্দেশে পশ্চিমজার্মানীর বিশ্রুত গোয়েটিংগেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতঃপ্রেরিত আমন্ত্রণে ঐ পদ গ্রহণ করে এবং ছয় মাস তথায় অধ্যাপকদের বেদান্ত, বেদ ও ভারতীয় রসশাস্ত্রের অধ্যাপনা করে। সে-ই প্রথম ভারতীয় যে ঐ বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা (Indology) বিভাগে সর্বপ্রথম Visiting Professor পদ অলঙ্কৃত করিল।

আমি তাহার 'বেদের পরিচয়' গ্রন্থের বহুলপ্রচার কামনা করি এবং তাহাকে অন্তর হইতে অভিনন্দন স্নেহাশীর্বাদ জানাই! ওঁশম্।

সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর
সংস্কৃত-বিভাগের ভূতপূর্ব আশুতোষ
অধ্যাপক এবং নবনালন্দা মহাবিহারের
অবসর প্রাপ্ত ডিরেক্টার্।

ওঁ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বন্দে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরু শ্রীচরণারবিন্দম্।

আমার 'বেদের পরিচয়' বইটির প্রথম সংস্করণ (এক হাজার একশত কপি) এক বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে, বঙ্গভাষাভাষী পাঠক-সমাজের নিকট গ্রন্থটি এরূপ সমাদৃত হইবে ভাবিতে পারি নাই। দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, ছাত্র, ছাত্রীদের নিকট হইতে এ পর্যন্ত তিপ্পান্নটি অনুরোধপত্র আসিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ঋগ্‌বেদীয় যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি, ঋগবেদের সংবাদসূক্ত এবং আরও কয়েকজন দেবদেবীর আলোচনা যুক্ত করা হইয়াছে। এই তিনটি নূতন পরিচ্ছেদের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রস্তুতিকার্যে সাহায্য করার জন্য আমার একান্ত স্নেহভাজন অন্তেবাসী অধ্যাপক সুধেন্দুমোহন ভদ্র, অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র চৌধুরী, কল্যাণীয়া শিপ্রা ভট্টাচার্য ও কল্যাণীয়া কনকবালা প্রামাণিককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও স্নেহাশিস্ জানাইতেছি।

কলিকাতার প্রখ্যাত গ্রন্থপ্রকাশক ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করায় তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

স্বনামধন্য জাতীয় অধ্যাপক আচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য শ্রদ্ধেয়া ডঃ রমা চৌধুরী, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সংস্কৃতবিভাগের অধ্যাপকগণ এবং বহু কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাবৃন্দ গ্রন্থটির প্রশংসা করিয়া মূল্যবান মন্তব্য পাঠাইয়া আমাকে উৎসাহিত করায় এবং কিছু কলেজে গ্রন্থটিকে বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসপত্রের পাঠ্য করায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

"বিরাজ"
ডঃ বসুর রোড
পোঃ ডিব্রুগড়
(আসাম)

যোগীরাজ বসু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বন্দে পরমারাধ্য ওঁ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।

তিন বৎসর পূর্বে শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আমাকে বলেন,—'আমরা হিন্দুরা আমাদের বেদ নিয়ে অহংকার করি কিন্তু বেদ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। বাংলাভাষাতে বেদবিষয়ক এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বইও নেই যা পড়ে বৈদিক সাহিত্যের একটা সামূহিক জ্ঞান হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি বাংলায় একটি বই লেখ।' আমার অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় তারকনাথ সেন (প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক) মহোদয়ও খুব উৎসাহ দেন। গত দুই বছরে অনেকাংশ লেখা শেষ হয়। পরলোকগত ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপির বহুলাংশ পাঠ করিয়া গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধেয় তারকদাও কয়েক খণ্ড পাণ্ডুলিপি দেখিয়া বিশেষ উৎসাহিত করেন।

সাধারণতঃ প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে রচিত বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ প্রভৃতির পরিচয়, কালবিচার ইত্যাদি দেখা যায় কিন্তু চারিবেদের অদ্যাবধি প্রাপ্ত সমস্ত শাখার পরিচিতি, বেদমন্ত্রের বিবিধ প্রকারের পাঠ, বেদের স্বর, বেদের প্রামাণ্য বিচার, নিত্যত্ব বিচার, অপৌরুষেয়ত্ববিচার, ব্রাহ্মণ গ্রন্থের লক্ষণ প্রামাণ্যাদি বিচার, চারিবেদের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সকল ভাষ্যকারের পরিচয়, বৈদিক যুগে পুরুষের ও রমণীর শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ইত্যাদি দৃষ্ট হয় না। এ সকল তত্ত্ব এই গ্রন্থে অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বেদের নিত্যত্ব-প্রামাণ্য-অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে ছয়টি দর্শনের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ছাত্র জীবনে যে দুইজন প্রখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহাদের নামে গ্রন্থটি উৎসর্গ করিয়াছি। গৌহাটী কটন কলেজে স্নাতক-শ্রেণীতে শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বেদ অধ্যয়ন করি। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমীর সাক্ষাৎ অন্তেবাসী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এবং তদুত্তরকালে মহারাষ্ট্রদেশীয় মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রীর নিকট বেদ অধ্যয়ন করি। তিন বৎসর হইল তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। উভয় আচার্যের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিরচনাকার্যে যে সকল স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রী সাহায্য করিয়াছে,—শ্রীমান্ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীমান্ সুধেন্দুমোহন

ভদ্র, ডঃ উমারাণী চক্রবর্তী, সর্বশ্রীমতী শিপ্রা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা ধর, নন্দিতা ভট্টাচার্য ও শিপ্রা দত্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও স্নেহাশীর্বাদ জানাইতেছি। ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠকবর্গ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক।

কলিকাতার সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করায় তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমার নামের বানান সংস্কৃতব্যাকরণমতে 'যোগিরাজ' হওয়া উচিত। আমার জন্মের পূর্বে আমার পরমশ্রদ্ধেয় ঋষিকল্প পিতৃদেব দৈবযোগে আমার নাম পাইয়াছিলেন এবং তাহাতে 'যোগীরাজ' বানান ছিল; তজ্জন্য সেই বানানই রাখিয়াছি।

অশেষ বিদ্যার আকর শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিয়া দেওয়ায় আমি অশেষ কৃতার্থ এবং গ্রন্থটি ধন্য হইল। তাঁহার নিকট আমি বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি এবং তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছি।

যোগীরাজ বসু

"বিরাজ"
ডঃ বসুর রোড্।
ডিব্রুগড় (আসাম)।

বিবৃত সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেদের লক্ষণ

'বেদ' শব্দটি বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিদ্+অচ্=বেদ। 'বেদ' মানে জ্ঞান, পরমজ্ঞান। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান জন্মে তাহা পার্থিব জ্ঞান, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সাহায্যে যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের যে জ্ঞান হয় তাহা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান। এই সকল প্রমাণ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দান করিতে পারে না। নয়ন, শ্রবণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও মানবের বাক্যমন যে রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না সেই অতীন্দ্রিয় পরমজ্ঞান আমরা 'বেদ' হইতে লাভ করিতে পারি। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা ॥'

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করার কোনও উপায় নাই সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান 'বেদ' হইতে লাভ করা যায় তজ্জন্যই এই ধর্মগ্রন্থকে 'বেদ' বলে। বেদ ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক অপৌরুষেয় শ্রুতি প্রবচন। বৈদিক আচার্যগণ বলেন ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব একমাত্র বেদ হইতেই জানা যায়। 'ধর্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে।' বর্ণাশ্রম ধর্ম বেদমূলক। মনু বেদকে অখিল ধর্মের মূল বলিয়াছেন, 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্' (মনুসংহিতা ২'৬)। ধর্মশাস্ত্রকার গৌতমও একই অর্থে বলিয়াছেন, 'বেদো ধর্মমূলম্'। ধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম, কর্মফল যজ্ঞ, যজ্ঞফল স্বর্গ, পরলোকতত্ত্ব, অদৃষ্ট ইত্যাদি ধর্মগত যাবতীয় জ্ঞান ও ব্রহ্ম, মোক্ষ, ইত্যাদি জ্ঞান একমাত্র বেদ হইতেই লাভ করা যায়।

বেদ শব্দের কয়েকটী প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে। যথা শ্রুতি, ত্রয়ীবিদ্যা বা ত্রয়ী, আগম, ছন্দস্ প্রভৃতি। অনাদিকাল হইতে 'বেদ' গুরুশিষ্য পরম্পরা সম্প্রদায়ক্রমে শ্রবণবিধৃত ও স্মৃতিসঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল। বহুকাল পরে তাহা লিপিবদ্ধ হয়। লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যুগাদ্যকাল হইতে আচার্য্যমুখে শ্রবণ করিয়া শিষ্য বেদমন্ত্র শিক্ষা করিত ও মেধাবলে স্মৃতিভাণ্ডে সযত্নে রক্ষা করিত। সেই শিষ্য আবার আচার্য্য হইয়া তদীয় শিষ্যকে ঐভাবে 'বেদ' শ্রবণ করাইত। এইরূপে বৈদিক সম্প্রদায়ে আচার্য, শিষ্য, প্রশিষ্য, প্রশিষ্যের শিষ্য

পরম্পরা পরমজ্ঞানের আকর বেদ শ্রুতিকে রক্ষিত হইত বলিয়া তাহার এক নাম 'শ্রুতি'। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য প্রভৃতি বেদান্তাচার্যগণ সাধারণতঃ 'শ্রুতি' সংজ্ঞায় বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। ঋষি বাদরায়ণও ব্রহ্মসূত্রে 'শ্রুতি' সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন। 'ছন্দস্' বা 'ছন্দঃ' প্রতিশব্দটি পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণ সূত্রে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বৈদিক সংস্কৃতকে ও বেদকে 'ছন্দস্- সংজ্ঞা দ্বারা এবং লৌকিক সংস্কৃতকে 'ভাষা' সংজ্ঞা দ্বারা লক্ষিত করিয়াছেন। দশটি মণ্ডল ঋক্ সংহিতায় আছে, তজ্জন্য নিরুক্তকার ঋগ্‌বেদকে স্থানে স্থানে 'দশতয়ী' বলিয়াছেন।

বেদকে 'ত্রয়ী বিদ্যা' বা কেবল 'ত্রয়ী'ও বলা হয়। ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ এই তিন বেদকে একত্রে 'ত্রয়ী' বলা হয়,—ইহাই প্রচলিত মত। এই মতে অথর্ব বেদ্ 'ত্রয়ী' বিদ্যার অন্তর্গত নহে। কৌটিল্য তাঁহার রচিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন—'ত্রয়ী বলিতে ঋক্,সাম, ও যজুষ্ এই তিন বেদ গণ্য। এই তিন বেদ, অথর্ববেদ ও ইতিহাসবেদ লইয়া সমগ্র বেদ শাস্ত্র প্রতিবোধ্য।' কৌটিল্যের প্রদত্ত বেদের এই লক্ষণ ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী-সঞ্জাত, সর্ববাদিসম্মত নহে কারণ অথর্ববেদ চতুর্বেদ মধ্যে গণ্য ও বেদের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইতিহাসবেদ, বেদের অন্তর্ভুক্ত নহে। 'ত্রয়ী' মধ্যে অথর্ব বেদের স্থান আছে কিনা—এই বিষয়ে বিদ্বৎসমাজে বহু বাদানুবাদ, বিপ্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। একদল বলেন ত্রয়ী শব্দে ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিনটি বেদ গ্রাহ্য, কারণ এই তিনটি বেদেরই যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ আছে। অথর্ববেদ ত্রয়ীর বহির্ভূত কারণ অথর্ব বেদের যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ নাই। যজ্ঞ সম্পাদন জন্য যে ষোলজন পুরোহিতের আবশ্যক তন্মধ্যে চারিজন ঋগ্‌বেদী, চারিজন সামবেদী, চারিজন যজুর্বেদী এবং চারিজন ঋক্-সাম-যজু ত্রিবেদবিৎ; এই ষোলজনের মধ্যে অথর্ববেদীর কোনও স্থান নাই; অপর একদল বলেন ত্রয়ী বলিতে তিন বেদের কথা বলা হয় নাই, ঋক্, সাম ও যজুঃ ত্রিবিদ মন্ত্রের উল্লেখ হইয়াছে। পূর্বমীমাংসাদর্শনরচয়িতা জৈমিনি ঋষি ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন প্রকার মন্ত্রের নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,—

> 'তেষাম্ ঋক্ যত্র অথর্বশেন পাদব্যবস্থা'
> 'গীতিষু সামাখ্যা।'
> 'শেষে যজুঃ শব্দঃ।'

অর্থাৎ বেদের যে মন্ত্রগুলিতে অর্থানুসারে ছন্দঃ ও পাদব্যবস্থা আছে, সেই মন্ত্ররাজিকে 'ঋক্' বলা হয়। এই 'ঋক্' মন্ত্রসকলের মধ্যে যে মন্ত্রগুলি গান

করা যায়, যেগুলি গীতিযুক্ত তাহাদিগকে 'সাম' বলা হয়। এই ঋক্ ও সাম লক্ষণযুক্ত মন্ত্ররাজি ব্যতীত আর যে সকল মন্ত্র আছে সেই অবশিষ্ট মন্ত্র-সমূহকে 'যজুঃ' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে পদ্য ও গদ্য উভয়রূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়। অথর্ববেদের মধ্যে যে সকল মন্ত্র আছে তাহাদের লক্ষণ ঋক্ ও যজুঃ মন্ত্রের লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ; পৃথক কোন বিশিষ্ট লক্ষণ নাই। তজ্জন্যই অর্থাৎ অথর্ববেদের মন্ত্রের পৃথক কোনও লক্ষণ নাই বলিয়াই মন্ত্রলক্ষণের চতুর্থ প্রকারের প্রয়োজন হয় নাই। অতএব 'ত্রয়ী' বলিতে অথর্ববেদও বোধ্য কারণ অথর্ববেদের মন্ত্রলক্ষণ ঐ তিন লক্ষণের বহির্ভূত নহে। এই দলের মতে অথর্ববেদের পৃথক মন্ত্রত্ব বা মন্ত্রলক্ষণ নাই কিন্তু পৃথক স্বতন্ত্র বেদত্ব আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বেদান্ত-মীমাংসা অধ্যাপক অধুনা বিদেহ-প্রাপ্ত মদীয় বিদ্যাচার্য শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহোদয়ও এই মত পোষণ করিতেন। অথর্ববেদের যজ্ঞের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই বলিলে ভুল হইবে। কারণ প্রধান প্রধান যাগের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও অভিচারাদিযাগে ও শান্তি পৌষ্টিকাদি কর্মে অথর্বমন্ত্রের প্রয়োগ আবশ্যক হয়। ঋক্ প্রভৃতি বেদের কতিপয় মন্ত্রও অথর্ববেদে দৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তের নিম্নলিখিত ঋক্‌টিকে ঋগ্‌বেদের প্রকাশ কালেই অথর্ববেদের অস্তিত্বের প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করেন,—

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥"

ঋক্ সংহিতা ১৫-৯০-৯

সেই বিরাট পুরুষকৃত আদি যজ্ঞ হইতে ঋক্ সকল, সাম সকল, ছন্দোরাজি এবং যজুঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। বহু পণ্ডিত বহুভাবে 'সামানি' ও 'ছন্দাংসি' শব্দ দুইটির ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বেদের বিশ্রুত ভাষ্যকার সায়ণাচার্য 'ঋচঃ সামানি যজুঃ' বলিতে ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ বুঝিয়াছেন এবং 'ছন্দাংসি' শব্দে বেদে প্রযুক্ত সাতটি ছন্দ (Metres) বুঝিয়াছেন। একদল 'ঋচঃ সামানি' বলিতে ঋগ্‌বেদের গানযোগ্য মন্ত্রসকল এবং 'ছন্দাংসি' শব্দে সামবেদেয় মন্ত্ররাজি বুঝিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা যুক্তিসহ নহে কারণ ঋগ্‌বেদের অন্যান্য মন্ত্র বাদ দিয়া কেবল গানযোগ্য বা গেয় মন্ত্রসকলের উল্লেখের কোনও হেতু নাই এবং স্পষ্টরূপে 'সামানি' শব্দে সামবেদের উল্লেখ থাকায় এইরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনা মাত্র। কেহ কেহ আবার 'ছন্দাংসি' শব্দে 'অথর্ববেদ' বুঝিয়াছেন, তাহাও কষ্টকল্পনা। এই গোষ্ঠীর পণ্ডিতগণ

অথর্ববেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। উক্ত ঋক্‌মন্ত্রগত 'ছন্দাংসি' শব্দের ক্লিষ্ট ব্যাখ্যা না করিয়াও বেদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে অথর্ব বেদের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে। বেদে অথর্ব বেদের, অথর্বন্ নামক ঋষির ও পুরোহিতের উল্লেখ আছে। এই 'অথর্বন্' পুরোহিতই পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ জন্দ্ আবস্তায় 'অথ্রবন্' নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর্যগোষ্ঠীর ভারতীয় ও ইরাণীয় শাখা যখন সপ্তসিন্ধু-রাজিত 'সুবাস্তু' নামক জনপদে সরস্বতী উপত্যকায় একত্রে বাস করিত তখনই প্রাগৈতিহাসিক যুগে 'অথর্বন্' পুরোহিতের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে এই পৌরোহিত্য কর্মের ও পদবীর সুপ্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়। উপনিষদ্‌রাজি বেদের অন্তর্ভুক্ত। সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে নারদ-সনৎকুমার সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। সনৎকুমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ তাঁহার অধীত শাস্ত্রের ও বিদ্যার নাম কীর্তন করিতেছেন; তন্মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদেরও উল্লেখ আছে। 'ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদম্ অথর্বাণমিতিহাসপুরাণম্......' ইত্যাদি শ্রুতিবচন দ্রষ্টব্য।

শুক্ল-যজুর্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদেও তিনবার অথর্ববেদের উল্লেখ আছে। 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ ঋগ্‌-বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্বাঙ্গিরসঃ' (বৃ, উ, ২-৮-১০, ৪-১-২, ৪-৫ ১১); 'সেই পরমপুরুষের নিঃশ্বাস এই ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ।' উপরের আলোচনা হইতে অথর্ব-বেদের বেদত্ব ও মন্ত্রত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইল। বেদ মধ্যে অথর্ববেদ পরিগণিত এবং ত্রয়ীশব্দে লক্ষিত ত্রিবিধ মন্ত্রের ঋক্ ও যজুঃ মন্ত্র লক্ষণের অথর্ব বেদমন্ত্রে সুসঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'বেদ' শব্দে কোন্ কোন্ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রতিবোধ্য অধুনা আমরা তাহার আলোচনা করিব। বেদের প্রধান বিভাগ দুইটি,—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ; কাত্যায়ন এবং আপস্তম্ব বেদের লক্ষণ করিয়াছেন,—'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্' অর্থাৎ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণকে একত্রে বেদ বলে। সায়নাচার্য স্বরচিত ঋগ্‌বেদের ভাষ্যোপোদ্‌ঘাত বা ভাষ্যভূমিকায় এই লক্ষণেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—'মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক-শব্দরাশির্বেদঃ।' মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুইটি প্রধান বিভাগের ব্রাহ্মণ অংশের পুনঃ দুইটি বিভাগ আছে। যথা:—আরণ্যক ও উপনিষদ্। আরণ্যক ব্রাহ্মণের অন্তিম অংশ এবং আরণ্যকের অন্তিম অংশ

উপনিষদ্। কোনও কোনও উপনিষদ্ ব্রাহ্মণের অঙ্গীভূত; এবং মাত্র একটি উপনিষদ্ মন্ত্রের অঙ্গীভূত; যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে। 'মন্ত্র' ভাগের আরেকটি নাম 'সংহিতা'। ঋক্ মন্ত্র বা ঋক্ সংহিতা, যজুঃ মন্ত্র বা যজুঃ সংহিতা উভয়ই সমানার্থবাচক। অতএব 'বেদ' বলিতে চারি প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ বোধ্য—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। বেদের অন্তর্ভুক্ত এই চারি প্রকার গ্রন্থের প্রথমে আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া পরে বিশেষভাবে লক্ষণসহ আলোচনা করিব। মন্ত্র বা সংহিতা বলিতে প্রতি বেদের সূক্ত, স্তব, স্তুতি, আশীর্বচন, প্রার্থনা এবং যজ্ঞ সংশ্লিষ্ট 'নিবিৎ' প্রভৃতি বুঝায়। 'ব্রাহ্মণ' বলিতে মন্ত্রের বিবিধ আলোচনা, বিবিধ যাগ যজ্ঞের প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ, মন্ত্রের যাগে বিনিয়োগ এবং ইতিহাস পুরাকীর্তি দেবতা যজ্ঞফল-নিষ্ঠ আলোচনা এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ছন্দোবিষয়ক বিশাল গদ্যগ্রন্থ বুঝায়। বিশাল বলার তাৎপর্য এই, বেদের অন্তর্গত চারিটি অংশের মধ্যে মন্ত্র, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ গ্রন্থরাজির বাহ্য কলেবর একত্রে চারি বেদের সমগ্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থমালার অর্দ্ধেকও হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র একটি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার একটি ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ; ইহাতে একশত অধ্যায় আছে। ইহা ব্যতীত প্রতি বেদের কয়েকটি করিয়া ব্রাহ্মণ আছে, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে। ব্রাহ্মণগ্রন্থোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড হইতে যখন বৈদিক যুগের আর্যগণের চিত্ত জ্ঞানযোগের দিকে আকৃষ্ট হইল তখন আরণ্যকের উৎপত্তি হয়। দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের ও উপাসনার প্রাধান্য আরণ্যকে দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থোক্ত যাগযজ্ঞের বাহ্যার্থ পরিহার করিয়া জ্ঞান-যোগমুখে আরণ্যকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আরণ্যকে যে জ্ঞানযোগ ও অধ্যাত্মবিদ্যার সূত্রপাত, উপনিষদে তার পরাকাষ্ঠা। সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মা অনাত্মার বিচার, পরমাত্মা জীবাত্মার তত্ত্ব, ব্রহ্ম ও মোক্ষ তত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যাত্মবিদ্যা উপনিষদে আলোচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্ত্তী স্থান আরণ্যক অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আরণ্যক ও উপনিষদ্ অনেকাংশে সমগোত্রীয় ও উভয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য এক বলিয়া Winternitz (ভিন্টারনিৎস) প্রভৃতি কতিপয় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এই দুইটিকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের চারিটি বিভাগ না করিয়া তিনটি বিভাগ করিয়াছেন; (১) মন্ত্র (২) ব্রাহ্মণ (৩) আরণ্যক ও উপনিষদ্।

উপরের আলোচনা হইতে বেদের দুইটি প্রধান বিভাগ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড স্পষ্ট প্রতীত হয়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রধানতঃ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায়, তজ্জন্য তাহাকে কর্মকাণ্ড বলা যাইতে পারে। আরণ্যকে বিশেষতঃ উপনিষদে জ্ঞানযোগের আলোচনা মুখ্য বিষয়বস্তু, তজ্জন্য তাহাকে জ্ঞানকাণ্ড আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কর্মকাণ্ডপ্রধান ব্রাহ্মণগ্রন্থরাজি এবং জ্ঞানকাণ্ডপ্রধান উপনিষদ্ হইতে দুইটি প্রধান ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণভাগকে অবলম্বন করিয়া পূর্বমীমাংসা দর্শন রচিত হইয়াছে। তাহার রচয়িতা জৈমিনি ঋষি। এই দর্শনকে কর্মমীমাংসা বা ধর্মমীমাংসাও বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রবচনে আপাত দৃষ্টিতে যে সকল বিরোধ দৃষ্ট হয় তাহার সমন্বয় এই দর্শনে করা হইয়াছে এবং বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। উপনিষদ্‌রাজিকে অবলম্বন করিয়া উত্তরমীমাংসাদর্শন রচিত হইয়াছে। রচয়িতা বাদরায়ণ ঋষি। কিংবদন্তী-মতে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা বেদব্যাসেরই আর একটি নাম বাদরায়ণ। এই দর্শনের অপর নাম ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন এবং সূত্রগুলির নাম ব্রহ্মসূত্র। উপনিষদ্ সমূহের প্রবচনে আপাতঃ দৃষ্টিতে যে সকল বিরোধ প্রতিভাত হয় তাহার সমাধান ও সমন্বয় এবং ব্রহ্মতত্ত্ব মোক্ষতত্ত্বাদি প্রতিপাদন বেদান্ত দর্শনের মুখ্য বিষয়বস্তু। দেখা গেল ব্রাহ্মণ গ্রন্থরাজি পূর্বমীমাংসা দর্শনের প্রধান উপজীব্য এবং উপনিষদ্‌নিচয় উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের প্রধান উপজীব্য। সনাতন ধর্মগ্রন্থের বিশ্ববিশ্রুত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা উপনিষদ্ সমূহের সার স্বরূপ। এইজন্য বলা হইয়াছে,—

বেদের দুইটি বিভাগ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড

দুইভাগ হইতে দুইটি দর্শনের উৎপত্তি, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শন

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥"

উপনিষদ্‌সকল গাভী স্বরূপা। গোপালনন্দন নরকলেবরধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গাভীগুলি দোহন করিয়াছেন ; সেই অমৃতকল্প দুগ্ধ হইল গীতা। বৎসের ন্যায় অর্জুন সেই দুগ্ধ গীতামৃত পান করিতেছেন এবং সুধীগণ তাহা ভোগ করিতেছেন। অর্থাৎ বৎসের (বাছুরের) সাহায্য ব্যতীত যেমন দুধ দোহান যায় না তেমনই গীতামৃতরূপ দুগ্ধ নিঃসারণে শ্রোতা অর্জুন নিমিত্তমাত্র।

কর্মকাণ্ডে ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা শ্রুত হয়, যেমন ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের উক্তি, "যজ্ঞো বৈ সুতর্মা নৌঃ" অর্থাৎ যজ্ঞরূপ নৌকা মানুষকে সুখে

অনায়াসে ভবনদী পার করে। উপনিষদে ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞের নিন্দা ও জ্ঞানের প্রশংসা বিঘোষিত। মুণ্ডক-উপনিষদের প্রবচন, 'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ (১-২-৭)' অর্থাৎ যজ্ঞরূপ নৌকা দৃঢ় নহে, তাহা ভবসাগর পার করিতে সক্ষম নহে। একমাত্র জ্ঞানরূপ তরণী অবলম্বনে ভবসাগর পার হওয়া যায়।

এখন আমরা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদের লক্ষণ বিশেষরূপে আলোচনা করিব।

মন্ত্র ঃ মন্ত্র বলিতে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারি বেদের সংহিতা অংশকেই বুঝায়। মন্ত্র শব্দটি মন্ ধাতু নিষ্পন্ন। 'মনন' হইতে মন্ত্র কথাটি আসিয়াছে। ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত একটি। রচয়িতা যাস্কঋষি। বেদের অন্তর্গত বহুশব্দের নিরুক্তি বা নির্বচন বা ব্যুৎপত্তি এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। মন্ত্র শব্দটির নির্বচন প্রসঙ্গে যাস্ক বলেন, 'মন্ত্রা মননাৎ' নিরুক্ত (৭-১২-১); মনন হইতে মন্ত্র শব্দটির উৎপত্তি। যাহা হইতে কর্ম ও তদনুষ্ঠানোপযোগী উপকরণ দ্রব্যাদি এবং অনুষ্ঠানের ফলদাত্রী দেবতার মনন (জ্ঞান) জন্মে তাহাকে মন্ত্র বলে। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেন বেদের মন্ত্রসমূহ হইতে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিযাজ্ঞিক (যজ্ঞসংক্রান্ত) বিষয়াবলীর মনন বা বোধ উৎপন্ন হয়। মন্ত্রসকল যথার্থরূপে বিনিযুক্ত হইলে তবেই অভীষ্ট ফল দান করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই মন্ত্রকে 'মন্ত্র' বলা হয়; ইহাই মন্ত্রের মন্ত্রত্ব।

এই মন্ত্র ঋগ্বেদাদির চারিপ্রকার বিভাগহেতু ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব চতুর্বিধ নামে প্রসিদ্ধ। প্রথম অধ্যায়ে এই চারিপ্রকার মন্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্রের অপর নাম 'সংহিতা'। প্রতি বেদের মন্ত্র অংশকে তজ্জন্য সংহিতাও বলা হইয়া থাকে; যথা,—ঋগ্‌বেদ প্রভৃতির মন্ত্রাংশকে ঋক্-সংহিতা, সামসংহিতা যজুঃসংহিতা ও অথর্বসংহিতা বলা হয়। প্রথমে বেদ অখণ্ড ছিল, অনন্তর ভগবান্ বেদব্যাস তাহাকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারি খণ্ডে বিভক্ত করেন। সুপ্রাচীন কাল হইতে এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে এবং মহাভারতে ও পুরাণে এই কিংবদন্তীর সমর্থন স্বরূপ প্রবচন দৃষ্ট হয়। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার 'বেদব্যাস' নাম হইয়াছিল। বেদব্যাস নামটি অন্বর্থসংজ্ঞা অর্থাৎ যে কার্য্যের জন্য ঐ নাম হইয়াছে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত নামের মধ্যে রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

বেদব্যাসকর্তৃক বেদ বিভাগ

'পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ
অবতীর্ণো মহাভাগো বেদং চক্রে চতুর্বিধম্।' ১২-৬-৪৯

অর্থাৎ ঋষি পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসের রূপে পরমেশ বিভু অবতীর্ণ হইয়া বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছেন,—

'ঋগথর্বযজুঃসাম্নাং রাশীরুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে সূত্রে মণিগণ ইব ॥' ১২।৬।৫০

বেদব্যাস সেই এক অখণ্ড অনাদি বেদ হইতে ঋক্, অথর্ব, যজুঃ ও সাম মন্ত্রগুলিকে উদ্ধৃত করিয়া পৃথক বর্গে চারিটি সংহিতা করিলেন। চারিটি যে সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ নহে, চারিটির মধ্যে যে একত্ব অনুস্যূত আছে, বেদত্বলক্ষণ-সূত্রে চারিটির যে আপাতদৃষ্ট পার্থক্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত আছে ইহা বুঝাইবার জন্য 'সূত্রে মনিগণ ইব' উপমাটি দিয়াছেন। বিভিন্ন মণিসংযোগে রচিত হইলেও যে সূত্রদ্বারা মণিগুলিকে গাঁথা হইয়াছে সেই সূত্রটি এক ও অখণ্ড, তদ্রূপ বেদ চতুষ্টয়ে বেদত্বরূপ একত্ব বিরাজিত বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও এই কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। মহাভারত প্রবচন,—

'বিব্যাসৈকং চতুর্ধা যো বেদং বেদবিদাং বরঃ।' বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ যে বেদব্যাস এক বেদকে চারি ভাগ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ : পূর্বেই উক্ত হইয়াছে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, এই দুইটি লইয়াই বেদ। ব্রাহ্মণ শব্দটির বিভিন্নব্যুৎপত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মন্ শব্দের বিবিধ অর্থমধ্যে বেদ ও ব্রাহ্মণ অর্থও আছে। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মন্ অর্থাৎ বেদ, বেদের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সম্বদ্ধ বলিয়াই 'ব্রাহ্মণ' নাম হইয়াছে। অপর একদল 'ব্রহ্মন্' বলিতে এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বুঝিয়াছেন। যজ্ঞে পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণদেরই বৃত্তি ছিল। সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যজ্ঞ ও যজ্ঞের বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে উক্তিরাজি যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তাহার নাম 'ব্রাহ্মণ'। এই ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত। ব্রহ্মন্ শব্দের ব্রাহ্মণরূপ অর্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। যজুর্বেদের প্রখ্যাত শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তি, 'ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মনই ব্রাহ্মণ। পাণিনিব্যাকরণের মহাভাষ্যরচয়িতা ঋষি পতঞ্জলি পাণিনি সূত্র ৫-১-১ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, 'সমানার্থাবেতৌ ব্রহ্মন্‌শব্দো ব্রাহ্মণশব্দশ্চ' অর্থাৎ ব্রহ্মন্ ও ব্রাহ্মণ শব্দ একই অর্থ বুঝায়। প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার রচিত ঋগ্‌ভাষ্য ভূমিকায় এই বিষয়ে লিখিয়াছেন, 'ব্রহ্মেতি ব্রাহ্মণানাং নামাস্তি। অত্র প্রমাণম্।

ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ'। ব্রাহ্মণদেরই একটি নাম ব্রহ্মন্। এ বিষয়ে শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তি 'ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ' প্রমাণ।

মার্টিন হগ (Martin Haug) প্রভৃতি কতিপয় বিদ্বান্ 'ব্রহ্মন্' শব্দটি সকল পুরোহিত অর্থে না ধরিয়া কেবল যজ্ঞের অধ্যক্ষ ও পুরোহিতগণের প্রধান 'ব্রহ্মা' নামক পুরোহিতের অনুশাসন বা উক্তি বুঝিয়াছেন। এই অর্থ ধরিলে একটি দোষ হয়। ব্রহ্মা নামক যজ্ঞের পরিচালক পুরোহিত ত্রিবেদবিদ; ঋক্, সাম ও যজুর্বেদে তিনি কৃতবিদ্য। অথর্ববেদ বাদ যায় কিন্তু বেদ বলিতে চারিবেদ এবং ব্রাহ্মণ বলিতে চারিবেদের সকল ব্রাহ্মণ বোধ্য। ব্রাহ্মণগ্রন্থ-রাজিতে ব্রহ্মা ব্যতীত হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু প্রভৃতি যথাক্রমে ঋগ্‌বেদীয়, সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় পুরোহিতগণের উক্তি ও কর্ত্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। পুরোহিত সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা এই সকল পুরোহিতগণের লক্ষণ ও কর্ত্তব্য আলোচনা করিব। অতএব ব্রহ্মন্ শব্দে এখানে সকল পুরোহিতরূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত। ঋগ্‌ভাষ্য-ভূমিকায় আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতী ব্রাহ্মণের লক্ষণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আলোচনা করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত 'চতুর্বেদবিদ্ভির্ব্রহ্মভি র্ব্রাহ্মণৈর্মহর্ষিভিঃ প্রোক্তানি যানি বেদব্যাখ্যানানি তানি ব্রাহ্মণানি'। চতুর্বেদবিদ্ মহর্ষি ব্রাহ্মণগণের বেদব্যাখ্যানের নাম ব্রাহ্মণ। স্বনামধন্য বেদাচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয়ও তাঁর 'ঐতরেয়ালোচনম্' গ্রন্থে দয়ানন্দ সরস্বতীর এই মত সমর্থন করিয়াছেন। সামশ্রমীর সম্পাদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অপূর্ব সংস্করণের সুদীর্ঘ ভূমিকার নাম 'ঐতরেয়ালোচনম্'; 'ব্রাহ্মণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত আলোচনা করা হইল। এখন ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিচার করা হইতেছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিবিধ লক্ষণ বা বিবৃতি (definition or description) পূর্বাচার্যগণ দিয়াছেন। পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনি ব্রাহ্মণের লক্ষণ প্রসঙ্গে সূত্র করিয়াছেন 'শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ (পূঃ মী, ২-১-৩৩)'। শেষে অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশে; মন্ত্রব্যতীত বেদের শিষ্ট অংশের নাম ব্রাহ্মণ। সায়নাচার্যকর্তৃক সমর্থিত এই লক্ষণ হইতে ব্রাহ্মণভাগের কোনও বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝিব, তাঁহাতে কি কি বিষয়ের আলোচনা আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসার উত্তর জৈমিনিপ্রদত্ত উক্ত লক্ষণে পাওয়া যায় না। আপস্তম্ব বলেন, 'কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি' অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের চোদনা যে গ্রন্থে আছে তাহাই ব্রাহ্মণ। 'কর্মচোদনা' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আপস্তম্ব বেদের ব্রাহ্মণভাগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে মুখ্যতঃ

ব্রাহ্মণগ্রন্থের লক্ষণবিচার

ছয়টি বিষয় ব্রাহ্মণে আলোচিত হইয়াছে, যথা,—বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি। এই ছয়টি বিষয় ব্যাখ্যা করিলে ব্রাহ্মণের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইবে।

ব্রাহ্মণের আলোচ্য ছয়টি বিষয়

বিধি : বিশেষ বিশেষ কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য যে নির্দেশ বা চোদনাবাক্য শ্রুত হয় তাহাই বিধি। নির্দেশসূচক বলিয়াই বিধি বাক্যগুলির ক্রিয়ায় বিধিলিঙ্, লোট্ প্রভৃতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা—'যজেত' যজ্ঞ কর, 'শংসেৎ' আবৃত্তি কর, ইত্যাদি প্রবচন। 'স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত' 'স্বর্গকামী ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে।' 'বৃষ্টিকামো কারীর্য্যা যজেত'। 'যে বৃষ্টি কামনা করে (অনাবৃষ্টি কালে) সে কারীরী যজ্ঞ করিবে'; ইত্যাদি প্রবচন বিধি বাক্য।

(১) বিধি

অর্থবাদ : বেদমন্ত্রের অর্থপ্রসঙ্গে এবং বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে যে সকল ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় তাহাকে অর্থবাদ বলা হয়। এই ব্যাখ্যানভাগ ব্রাহ্মণের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে এবং এই ব্যাখ্যানভাগই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আলোচনাত্মক বা অনুশীলনাত্মক (speculative) অংশ। ইহার মধ্যে দর্শনগত, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই সকল অর্থবাদপ্রবচনে পরবর্তী দর্শন, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি প্রতিপন্ন করিলে সহজবোধ্য হইবে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রায়ই উক্ত হইয়াছে যে অগ্নিহোত্র, গবাময়ন প্রভৃতি যজ্ঞ করিলে যজমান অর্থাৎ যিনি যজ্ঞ করেন তিনি সেই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত সাযুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য লাভ করেন। সাযুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য ত্রিবিধ ঐক্যের বা তাদাত্ম্যের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু ব্রাহ্মণে এই ত্রিবিধ ঐক্যের গভীর আলোচনা পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই তিনটি শব্দ মোক্ষ বা কৈবল্যের তিনটি বিভিন্ন অবস্থারূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবদর্শনের মোক্ষতত্ত্বে বিশেষস্থান অধিকার করিয়াছে।

(২) অর্থবাদ

নিন্দা : বিরোধী মতের সমালোচনা, খণ্ডন ও পরিহারকে নিন্দা বলে। ইহাতে প্রতিপক্ষদলের মতের নিন্দা ও দোষ দেখান হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিতর্কবহুল পরমতখণ্ডন, স্বমতস্থাপনাত্মক অংশগুলি নিন্দা শব্দে বুঝিতে হইবে। কোন কোন মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বিষয়ে, সূক্তনির্বাচন বিষয়ে এবং কতকগুলি হোম বা যজ্ঞের প্রক্রিয়া বিষয়ে তদানীন্তন পুরোহিতদিগের

মধ্যে মতভেদ ছিল, এবং তাহা স্বাভাবিক। এক ব্রাহ্মণের উক্তি বা নির্দেশ অন্য ব্রাহ্মণে খণ্ডিত হইয়াছে। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

(৩) নিন্দা

'তৎ তথা ন কর্ত্তব্যম্' 'সেই প্রকারে তাহা করিবে না', 'তৎ তথা ন হোতব্যম্' 'তাহা ঐ প্রকারে আহুতি দিবে না', 'তদ্রূপে আবৃত্তি করিবে না' ইত্যাকার ব্রাহ্মণ বাক্য নিন্দাসূচক। শুক্ল-যজুর্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের বহু বিধানের ও বাক্যের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রশংসা : প্রশংসা অর্থে স্তুতি এবং যাহার স্তুতি করা হয় সেই ক্রিয়ার অনুমোদন করা হয়। কোনও ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান বিশেষের প্রশংসার তাৎপর্য্য সেই ক্রিয়ার সম্পাদনজন্য চোদনা। যাহা প্রশংসিত তাহা উপাদেয় ও করণীয় এবং যাহা নিন্দিত তাহা হেয় ও পরিহার্য।

(৪) প্রশংসা

'যৎ স্তূয়তে তদ্ বিধীয়তে, যন্নিন্দ্যতে তন্নিষিধ্যতে।' প্রশংসিত শ্রৌতক্রিয়াদি করা উচিত এবং নিন্দিত কর্ম বর্জন করা উচিত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে সকল বাক্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিশেষ প্রকৃতজ্ঞান সহ সম্পাদন করিলে ঈপ্সিত ফললাভ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে সেই সকল প্রবচন প্রশংসার অন্তর্গত। তজ্জাতীয় ব্রাহ্মণবাক্যে প্রায়শঃই 'য এবং বেদ', 'যে ইহা জানে' এই বাক্যাংশ শ্রুত হয়।

পুরাকল্প : অতি প্রাচীনকালে প্রাগৈতিহাসিকযুগে যে সকল যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাদিগকে 'পুরাকল্প' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। দেবতা-গণের অনুষ্ঠিত যাগ-হোমাদি শ্রৌতক্রিয়াকাণ্ডের যে সকল কাহিনী বা পুরাবৃত্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে সেই-সকল বৃত্তান্তও পুরাকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) পুরাকল্প

দেবতাগণকর্ত্তৃক সম্পাদিত বিবিধ যজ্ঞ-বৃত্তান্ত প্রত্যেক ব্রাহ্মণে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান আরম্ভ করার বহুপূর্বে দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং দেবতানুষ্ঠিত সেই সকল যজ্ঞই পরবর্তীকালে তত্তৎযাগসম্পাদনে মনুষ্যগণের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। আদিপুরুষ বা প্রজাপতি সৃষ্টিসূচনাকালে সর্বপ্রথম যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন এবং সেই প্রথম যজ্ঞ হইতে বিরাট, চতুর্বেদ, বর্ণচতুষ্টয়, গ্রাম্য ও অন্যান্য পশু, পক্ষী, পঞ্চ মহাভূত, সূর্য, চন্দ্র, অন্তরীক্ষাদি চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবাসুর যুদ্ধের বিবরণাদিও এই লক্ষণের অন্তর্গত। মার্টিন হগ, ভিণ্টারনিৎস্ প্রভৃতি প্রতীচ্যের কয়েকজন পণ্ডিত এই দেবাসুরযুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা 'দেব' শব্দে ভারতীয় আর্যগণকে এবং 'অসুর' শব্দে আর্যগোষ্ঠীর ইরাণী আর্যগণকে বুঝিয়াছেন।

বৈদিক আর্যগণ বেদের সূক্ত দ্বারা দেবগণের স্তুতি ও আবাহন করিয়াছেন তজ্জন্য 'দেব' শব্দ ভারতীয় আর্যগণের প্রতীক। জরথুশ্ত্র ধর্মাবলম্বী ইরাণীয়-গণের উপাস্য পরমপিতার নাম অহুরমজ্দা অর্থাৎ অসুরমহদ্ধ্যায়ী। 'অসুর' শব্দই 'অহুর' শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। আর্যগোষ্ঠীর দুটি শাখা ভারতীয় আর্যগণ ও ইরাণীয়গণ ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে সিন্ধু বা সরস্বতী উপত্যকায় সুবাস্তু জনপদে একত্রে বসবাস করিত। ক্রমশঃ যজ্ঞ ও অগ্নিনিষ্ঠ কয়েকটি অনুষ্ঠান লইয়া তাহাদের মতভেদ হয়। আর্যগণ অগ্নি পাবক ও চিরপবিত্র বলিয়া সমস্ত আহুতিই অগ্নিকুণ্ডে প্রক্ষেপ করিতেন কিন্তু ইরাণীয়গণ তাহাদের সযত্নরক্ষিত 'আতশ্' বা অনির্বাণ অগ্নিতে কখনও কিছু আহুতি দিত না যেহেতু অগ্নি চিরপবিত্র। এই সকল মতভেদের জন্য বিরোধ দেখা দেয় ও আর্য ইরাণীয়গণ সিন্ধু উপত্যকা ত্যাগ করিয়া ইরাণ অভিমুখে যাত্রা করেন। বেদের 'দেব' শব্দ ইরাণীয়-দের জরথুশ্ত্র ধর্মের বেদকল্প ধর্মগ্রন্থ জন্দ আবস্তায় 'দএব' রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং তাহার অর্থ অসুর বা দৈত্য; আবার ভারতীয় আর্যগণের 'অসুর' শব্দ আবস্তায় 'আহুর' রূপ লইয়াছে এবং তাহার অর্থ দেবতা। সপ্তসিন্ধুর দেশ হইতে তাহারা ইরাণে গিয়াছে এই বিষয়ের উল্লেখ আবস্তায় আছে। 'সপ্তসিন্ধু' শব্দটি আবস্তায় 'হপ্তহিন্দু' শব্দে পরিণত হইয়াছে। আর্য-সভ্যতার ইতিহাসে এই দুই শাখার বিরোধ ও ইরাণীয় শাখার সিন্ধু উপত্যকা পরিত্যাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবৃত্ত।

পরকৃতি: ব্রাহ্মণের অন্তিম বা ষষ্ঠ লক্ষণ 'পরকৃতি'; পরস্য কৃতিঃ পরকৃতিঃ। পরের কৃতি বা কার্যকে পরকৃতি বলে। এস্থলে যজ্ঞে অভিজ্ঞ খ্যাত-নামা শ্রোত্রিয় বা পুরোহিতগণের কীর্তি, বিশ্রুত নৃপতিগণের যজ্ঞ, দান, দক্ষিণা ইত্যাদির অলোকসামান্য কীর্তি প্রভৃতি পরকৃতি শব্দে বুঝিতে হইবে। প্রথিতযশা যজমানদের যজ্ঞসম্পাদন ও দক্ষিণাজন্য ঐহিক ও পারলৌকিক সাফল্যও পরকৃতির অন্তর্ভুক্ত। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের পঞ্চম পঞ্জিকার ঊনচল্লিশ অধ্যায়ে পুরাকালের বহু খ্যাতনামা পুরোহিতের পরকৃতি ও প্রথিতযশা ভূপতির এতাদৃশ কার্যাবলী কীর্তিত হইয়াছে।

পরকৃতি

অঙ্গনামক রাজাকে উদময় নামক পুরোহিত রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সেই রাজা দক্ষিণাস্বরূপ অষ্টাশীতি (৮৮) শ্বেত অশ্ব, দশ-হাজার হস্তী, দশ হাজার স্বর্ণহার শোভিতা ধনিকপুত্রী (আঢ্যদুহিতা) দান করিয়াছিলেন। এইরূপ বহু পরকৃতি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিপিবদ্ধ আছে।

পুরাকল্প ও পরকৃতি প্রায় এক গোষ্ঠীর, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সামান্য। গুণগত পার্থক্য বিশেষ নাই, সংখ্যাগত পার্থক্য আছে। মীমাংসকগণ বলেন বহু ব্যক্তির (বহু ক্ষত্রিয়ের, বহু ব্রাহ্মণের, দেবতাগণের বা অসুরগণের) বীরত্বব্যঞ্জক ও অন্যান্য কার্য্যাবলীকে পুরাকল্প বলা হয়; আর, এক এক ব্যক্তির বিবিধ কীর্ত্তি-কলাপকে পরকৃতি বলা হয়। পুরাকল্পের বেলায় কর্ত্তার বাহুল্য, পরকৃতির বেলায় কর্ত্তা একক কিন্তু ক্রিয়ার বাহুল্য। পরকৃতিকে পরক্রিয়াও বলা হয়।

পুরাকল্প ও পরকৃতির পার্থক্য

উপরে আলোচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থের স্বরূপনির্দ্ধারক ছয়টি লক্ষণকে কেহ কেহ মাত্র বিধি ও অর্থবাদ দুইটি লক্ষণে পর্যবসিত করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে বিধি ব্যতীত অপর পাঁচটি লক্ষণ অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি অর্থবাদের অন্তর্ভুক্ত। নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি অর্থবাদেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ; অতএব বিধি ও অর্থবাদ বলিলেই ছয়টি লক্ষণই তদন্তর্গত হইবে।

ছয়টি লক্ষণ বিধি ও অর্থবাদের অন্তর্গত

অনেকের ধারণা ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে কেবল যাগযজ্ঞের কথাই আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণকে 'manual of sacrifice' অর্থাৎ যজ্ঞের প্রক্রিয়াপঞ্জী বলিয়াছেন। কেহ কেহ ব্রাহ্মণকে 'Theological twaddle'' ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে অর্থশূন্য-শব্দাড়ম্বরমাত্র বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণগ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কেবল যাগযজ্ঞ বা ক্রিয়াকাণ্ডের কথা নহে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতার বহু তথ্য তাহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যাগযজ্ঞের বর্ণনা ছাড়াও বৈদিক ভারতের জাতিভেদ, অনুলোম প্রতিলোমাদি বর্ণের কথা, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের প্রতিযোগিতা, প্রত্যেক বর্ণের জীবিকা ও বৃত্তি, শিক্ষা ও ছাত্রজীবন, ভৌগোলিক পটভূমিকা, বিবাহসংস্কার, স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও গুরুত্ব, বাণিজ্য, কৃষি, অর্থনৈতিক অবস্থা, খাদ্য, পানীয়, নৃত্যগীতবাদ্যাদি ললিতকলা, রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যাভিষেকবিধি, বহুপ্রকার রাজ্য ও রাজার ক্রমনির্ণয়, সাম্রাজ্য, সার্বভৌম আধিপত্য, তৎকালীন পঞ্জিকা, ভৈষজ, উদ্ভিদ, পশুপক্ষী, স্থাপত্যবিদ্যা, নৌবিদ্যা, অপরাধ ও শাস্তি, ভাষাতত্ত্ব, বিবিধ প্রকারের সাহিত্য, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, মৃতদেহ সংকারবিধি প্রভৃতি বৈদিক আর্যগণের বহুমুখী কৃষ্টি ও সভ্যতার অমূল্য আকর ব্রাহ্মণগ্রন্থরাজিতে। মহামতি ম্যাকস্‌মূলার (Max Muller) তাঁহার 'History of Ancient Sanskrit

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে ব্রাহ্মণগ্রন্থের গুরুত্ব

Literature' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—'ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্থানে স্থানে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা এবং আর্যজাতির তদানীন্তন জীবনধারার যে সকল মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির প্রাচীন গ্রন্থে তাহাদের প্রাচীন কৃষ্টি ও জীবনধারার তাদৃশ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।' ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বেদত্ব আছে কিনা ইহা লইয়া বাদানুবাদ দৃষ্ট হয়। দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ কেহ কেহ বলেন সংহিতা বা মন্ত্রভাগের বেদত্ব আছে, ব্রাহ্মণের বেদত্ব নাই। অর্থাৎ বেদ বলিতে সংহিতা বা মন্ত্র বুঝায়, ব্রাহ্মণ বুঝায় না। কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্বাচার্যগণ ব্রাহ্মণের বেদত্ব স্পষ্টভাষায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পূর্বমীমাংসাসূত্রে জৈমিনি ব্রাহ্মণের লক্ষণ করিয়াছেন, 'শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ' অর্থাৎ বেদের মন্ত্রভাগ ব্যতীত শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশের নাম ব্রাহ্মণ। এই সূত্রে ব্রাহ্মণের বেদত্ব সুপ্রতিপন্ন। অধিকন্তু বেদের কর্মকাণ্ড লইয়া পূর্বমীমাংসা দর্শন রচিত। এই দর্শনের যতগুলি অধিকরণ, সমস্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থের বিষয় ও প্রবচনাদি লইয়া রচিত, সংহিতা প্রবচন লইয়া রচিত নহে। অতএব দয়ানন্দ সরস্বতী যে ব্রাহ্মণের বেদত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তাহা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত নহে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের বেদত্ব

আরণ্যক : অরণ্যে উক্তমিতি ইতি আরণ্যকম্ অর্থাৎ যাহা অরণ্যে উক্ত হয় তাহা আরণ্যক। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে বেদের যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এবং অধ্যাত্মবিদ্যা, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিরহস্য প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ড আরণ্যক ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য। ক্রিয়াকাণ্ডের যাগযজ্ঞের বিবরণাদি আরণ্যক ও উপনিষদে পাওয়া যায় না। দ্রব্যযজ্ঞ আরণ্যকে জ্ঞানযজ্ঞের রূপ লইয়াছে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। বাহ্যক্রিয়াকাণ্ডবহুল 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞকে ঋগ্‌বেদের শাংখ্যায়ন নামক আরণ্যক নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আরণ্যকের আর একটি নাম কৌষীতকি আরণ্যক। সম্পূর্ণ দশম অধ্যায়টি বাহ্য অগ্নিহোত্রযাগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মাত্র। এই যাগকে 'আধ্যাত্মিক আন্তর অগ্নিহোত্র' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'আধ্যাত্মিকম্ আন্তরম্ অগ্নিহোত্র-মিত্যাচক্ষতে।' আহবনীয়, গার্হপত্য অগ্নিকুণ্ড দুটি মনুষ্যশরীরাশ্রিত প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং অগ্নিহোত্রের দুগ্ধ, সমিৎ, আহুতি সম্বন্ধে বলিতেছেন—, 'শ্রদ্ধাই দুগ্ধ, বাক্যই সমিৎ, সত্যই আহুতি এবং প্রজ্ঞাই আত্মা'। এই প্রবচনে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে

আরণ্যকের লক্ষণ

আরণ্যকে দ্রব্যযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ও উপাসনায় রূপান্তরিত

ক্রিয়াবহুল বাহ্যযজ্ঞ আরণ্যকে লুপ্ত হইয়া জ্ঞানযজ্ঞে আন্তরযাগে রূপান্তরিত হইয়াছে ; উপাসনা ও জ্ঞানের প্রাধান্য দুন্দুভিত হইয়াছে। এই অধ্যাত্মবিদ্যা প্রকৃত অধিকারী ব্যতীত অন্যকে দান করা হইত না। শান্ত দান্ত মুমুক্ষু বৈরাগ্যশীল ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্ আচার্য এই বিদ্যা দান করিতেন। পুরাকালে এতাদৃশ আচার্যগণ বা তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিগণ লোকালয় হইতে দূরে বিজন বিপিনে বাস করিতেন এবং সেই অরণ্যেই সঙ্গোপনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে এই আধ্যাত্মবিদ্যা দান করিতেন। তজ্জন্য এই বিদ্যা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে আরণ্যক বলা হয়। দুই একজন 'অরণ্য' শব্দটির 'ব্রহ্ম' অর্থ করিয়াছেন। অরণ্য অর্থাৎ যাহা নিবিড়, গভীর ; ব্রহ্মতত্ত্বও অত্যন্ত নিবিড় ও দুরবহগাহ্য। সেই অরণ্য অর্থাৎ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রে আছে তাহা আরণ্যক। পূর্বের ব্যাখ্যাটি সর্ববাদিসম্মত। কেহ কেহ আরণ্যককে উপাসনাকাণ্ড ও উপনিষদ্‌কে জ্ঞানকাণ্ড বলিয়াছেন।

উপনিষদ্ঃ আরণ্যকে যে অধ্যাত্মবিদ্যার সূচনা, উপনিষদে তাহার পরাকাষ্ঠা। উপ—নি+সদ্+ক্বিপ্=উপনিষদ্। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য কঠোপনিষদের ভাষ্য ভূমিকায় 'উপনিষদ্' শব্দটি নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সদ্' ধাতুর অর্থ জীর্ণ করা, বিনাশ করা ও গমন। 'নি' অর্থ নিশ্চিত-রূপে, নিঃশেষে। যে বিদ্যা মানুষের জন্ম মৃত্যুর কারণ বা অবিদ্যাকে নিঃশেষে জীর্ণ করে বা বিনষ্ট করে সেই বিদ্যার নাম উপনিষদ্। 'উপ' শব্দের অর্থ নিকটে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে নাশ করিয়া যে বিদ্যা, যে পরমজ্ঞান মুমুক্ষু জীবকে পরব্রহ্মের নিকটে লইয়া যায়, পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনরূপ সেই পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাকে উপনিষদ্ বলে।

উপনিষদ্ শব্দের অর্থ

উপনিষদ্ শব্দের মুখ্য অর্থ হইল এই ব্রহ্মপ্রাপক পরাবিদ্যা এবং যে গ্রন্থে সেই পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা নিহিত আছে সেই গ্রন্থকেও উপনিষদ্ নামে অভিহিত করা হয় ; অর্থাৎ উপনিষদ্ শব্দের মুখ্য অর্থ হইল ব্রহ্মবিদ্যা যাহা নিঃশ্রেয়সপ্রাপক এবং গৌণ অর্থ হইল সেই বিদ্যার আকর গ্রন্থরাজি। গ্রন্থের বেলায় গৌণ অর্থ বলার কারণ কেবল গ্রন্থপাঠে মোক্ষলাভ, ব্রহ্মপ্রাপ্তি অসম্ভব ; তজ্জন্য পরাবিদ্যা, চরমজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান একান্ত আবশ্যক এবং সেই জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নহে। বেদের চরমজ্ঞান, মর্ম বা রহস্য উপনিষদে রূপায়িত। উপনিষদের একটি নাম রহস্য। বেদের রহস্য ইহাতে নিহিত তজ্জন্য এই নাম হইয়াছে। আর একটি ব্যাখ্যা হইল,—'রহসি' অর্থাৎ নিভৃতে, সঙ্গোপনে যে বিদ্যা দান করা হইত তাহা

মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ

রহস্য। আরণ্যকের 'অরণ্য' শব্দেও এই অর্থের ইঙ্গিত রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মতত্ত্ব, সৃষ্টির রহস্য, পরলোকতত্ত্ব, কার্য্যকারণবাদ, জীবব্রহ্মঐক্য প্রভৃতি যে সকল গভীরতত্ত্বের আলোচনা উপনিষদে দৃষ্ট হয় এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এতজ্জন্যই উপনিষদের গভীর তত্ত্ব, পরমরস-আস্বাদনে জার্মানদেশীয় জগদ্বিশ্রুত দার্শনিক শোপেনহাউয়ার্ (Schopenhauer) অন্তিমকালে দুঃসহব্যাধিকবলিত অবস্থায় তন্ময়চিত্তে উপনিষদ্ পাঠ করিয়া গভীর আনন্দ ও শান্তিলাভ করিতেন, তৎকালে সেই দেহধ্বংসী ব্যাধির সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন। তজ্জন্যই উপনিষদ্ সম্বন্ধে তিনি অমর উক্তি করিয়া গিয়াছেন, 'Upanisad has been the solace of my life ; it will be the solace of my death.' 'উপনিষদ্ আমার জীবনে শান্তিদান করিয়াছে, অন্তিমে এই উপনিষদ্ই আমার পরমশান্তিস্বরূপ হইবে।' উপনিষদ্ তাঁহার প্রাণে কি অমিয় সিঞ্চন করিয়াছিল, কি অলোকসামান্য শক্তি ও প্রেরণা দিয়াছিল এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। বেদের অন্ত বা পরাকাষ্ঠা বেদান্ত বলিতে উপনিষদ্‌রাজি প্রতিবোধ্য।

কতকগুলি উপনিষদ্ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত, যেমন কেনোপনিষদ্ সামবেদের জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। কতকগুলি উপনিষদ্ আরণ্যকের অন্তর্গত। ঐতরেয়োপনিষদ্ ঐতরেয় আরণ্যকের, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত। কৌষীতকি আরণ্যক আবার কৌষীতকি ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। তদ্রূপ বৃহদারণ্যক শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বৃহদারণ্যকের অন্তর্ভুক্ত। সামবেদের পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ বা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের প্রথম অংশটিকে আরণ্যক বলা হয় এবং ছান্দোগ্যোপনিষদ্ সেই আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত; আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদ্‌রাজিকে আরণ্যকোপনিষদ্, ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত-গুলিকে ব্রাহ্মণোপনিষদ্ এবং বেদের মন্ত্রভাগের অন্তর্গত উপনিষদ্‌কে মন্ত্রোপনিষদ্ বলা হয়। মন্ত্রোপনিষদ্ মাত্র একটি, ঈশোপনিষদ্; তাহা শুক্লযজুর্বেদের মন্ত্রভাগের অন্তর্ভুক্ত।

মন্ত্রোপনিষদ্, ব্রাহ্মণোপনিষদ্, আরণ্যকোপনিষদ্

চারি বেদের প্রত্যেকটির ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব প্রতি বেদেরই ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ আছে। প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে বেদ বলিতে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের সমষ্টি বুঝিতে হইবে, যেমন ঋগ্‌বেদ বলিতে তদন্তর্গত মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌রাজি বুঝিতে হইবে।

ঋগ্বেদ ঃ—ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ দুইটি—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক দুইটি—ঐতরেয় আরণ্যক ও কৌষীতকি আরণ্যক। এই বেদের উপনিষদ্ও দুইটি—ঐতরেয়োপনিষদ্ এবং কৌষীতকি উপনিষদ্। কৌষীতকির আর একটি নাম শাংখ্যায়ন। বর্ত্তমানে ঋগ্বেদের এই দুইটি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। পুরাকালে আরও কয়েকটি ব্রাহ্মণ ছিল, বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থ হইতে জানা যায়। সায়ণাচার্য তদীয় বেদভাষ্যে ঋগ্বেদের পৈঙ্গী ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় সায়ণাচার্যের জীবদ্দশাতেও (খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে) ঐ নামে ঋগ্বেদের একটি ব্রাহ্মণ ছিল। বেদের বহু ব্রাহ্মণ ও বহু শাখা যে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ইহা প্রাচ্য কি পাশ্চাত্ত্য উভয় ভূখণ্ডের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ঋগবেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগ্রন্থরাজির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে অগ্নিহোত্র, সোমযাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম এবং রাজার অভিষেক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ঋগ্বেদীয় 'হোতা' নামক পুরোহিতের কর্ত্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহা আট পঞ্জিকায় বা খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি পঞ্জিকায় পাঁচটি করিয়া অধ্যায় আছে এবং সমগ্র গ্রন্থে সর্বসমেত চাল্লিশটি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায় আবার কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত; এইরূপ মোট ২৮৫টি খণ্ড আছে। প্রথম ষোলটি অধ্যায় অগ্নিষ্টোম বা জ্যোতিষ্টোম নামক সোমযাগের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। সপ্তদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠখণ্ড হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত একবর্ষকালব্যাপী গবাময়ন নামক সত্র বা দীর্ঘযজ্ঞে হোতার কর্ত্তব্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী পাঁচটি অধ্যায়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ হইতে চতুর্বিংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশাহ নামক সোমযাগে হোতার কার্য্যাবলী এবং পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র এবং তদ্গত বিবিধ প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। অন্তিম আটটি অধ্যায়ে (৩২ হইতে ৪০) ইন্দ্রের অভিষেক ও ক্ষত্রিয়ের অভিষেকের বিশদ্ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বৈদিক যুগে ভারতে কি ভাবে নৃপতিগণের রাজ্যাভিষেক হইত তাহার সুন্দর চিত্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তুলিয়া ধরিয়াছেন। দক্ষিণাপ্রশস্তি ও পুরোহিতপ্রশংসাও কীর্ত্তিত হইয়াছে কারণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতই রাজাকে অভিষিক্ত করিতেন এবং ধর্ম ও রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজাকে মন্ত্রণাদান করিতেন। এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা ঋষি মহিদাস। তাঁহার জননীর নাম ইতরা ছিল; তজ্জন্য ইতরাপুত্রের নাম ঐতরেয়। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের ত্রিশটি অধ্যায়। ঋষি কৌষীতক এই ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা

বলিয়া কৌষীতকি নাম হইয়াছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে অগ্নিযাগ ও দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির বর্ণনা এবং পরবর্ত্তী চাব্বিশটি অধ্যায় (৭ হইতে ৩০) সোমযাগের বর্ণনায় পূর্ণ। এই ব্রাহ্মণে নৈমিষারণ্যের বিখ্যাত যজ্ঞের কথা এবং উত্তর ভারতে বেদবিদ্যার পরাকাষ্ঠার এবং ঋক্, যজু, সাম তিনবেদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আমরা পাই। বৈদিকযুগের শুনঃশেপের বিখ্যাত বহুশ্রুত উপাখ্যান ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই প্রথম দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় আরণ্যক পাঁচটি ভাগে বা পাঁচটি আরণ্যকে বিভক্ত, ইহার তৃতীয় আরণ্যকের চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম বহ্বৃচ ব্রাহ্মণোপনিষদ্ অথবা ঐতরেয়োপনিষদ্। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের শেষাংশ কৌষীতকি আরণ্যক। এই আরণ্যক পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। কৌষীতকি-উপনিষদ্ কৌষীতকি আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত। এই আরণ্যকের তৃতীয় অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত অংশ কৌষীতকি উপনিষদ্।

সামবেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্

<u>সামবেদ</u> :—সামবেদের অনেকগুলি ব্রাহ্মণের নাম সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। পূর্বমীমাংসাদর্শনের প্রথিতযশা আচার্য কুমারিল ভট্ট তাঁহার 'তন্ত্রবার্ত্তিক' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। সামবিধান ব্রাহ্মণের ভাষ্য ভূমিকায় সায়ণাচার্য সেই আটটি ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছেন ; (১) তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ অথবা পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ; (২) ষড়্বিংশ-ব্রাহ্মণ ; (৩) ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ ; (৪) জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ অথবা তলবকার ব্রাহ্মণ ; (৫) সামবিধান ব্রাহ্মণ ; (৬) দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ ; (৭) আর্ষেয় ব্রাহ্মণ ; (৮) বংশ ব্রাহ্মণ। ইহার মধ্যে শেষ চারিটি অর্থাৎ সামবিধান, দেবতাধ্যায়, আর্ষেয় ও বংশ সামবেদের বিষয়সূচীমাত্র ; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সামবেদের চারিটি ব্রাহ্মণ,—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ষড়্বিংশব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ ও তলবকার ব্রাহ্মণ। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত ; তাহার প্রথম পঁচিশটি অধ্যায়ের নাম পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বা তাণ্ড্যব্রাহ্মণ এবং তৎপরবর্ত্তী পাঁচটি অধ্যায়ের নাম ষড়্বিংশব্রাহ্মণ অর্থাৎ ষড়্বিংশ হইতে ত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ। অবশিষ্ট দশটি অধ্যায়ের নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। তলবকার ব্রাহ্মণের অপর নাম জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ।

তাণ্ড্যব্রাহ্মণে ব্রাত্যদিগের জন্য মুখ্য ও গৌণ প্রায়শ্চিত্তবিধি দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির যে সকল ব্যক্তি উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারিত না তাহাদিগকে ব্রাত্য বলা হইত। ষড়্বিংশ-ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত ব্রাহ্মণ ; ইহাতে বিবিধ অমঙ্গল, অশুভ

দুরিতের উল্লেখ এবং তাহাদের রিষ্টিশান্তিবিধান দৃষ্ট হয়। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের কথা, পরলোকের রূপক বর্ণনা এবং সামবিধানে সংস্কারগত বিবিধ উদ্দেশ্যে মন্ত্রের প্রয়োগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবতাধ্যায়, আর্ষেয় এবং বংশব্রাহ্মণে সামবেদের সূক্তসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতামণ্ডলীর নাম এবং সামবেদীয় আচার্যগণের বংশবৃক্ষ (genealogical table) বা বংশতালিকা পাওয়া যায়। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে অসংখ্য যাগের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। একদিনে সম্পাদ্য যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া দশসহস্র বৎসর ব্যাপী যাগের বর্ণনা এই ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। অন্য কোন ব্রাহ্মণে এত প্রকার যাগের বর্ণনা দৃষ্ট হয় না।

সামবেদের উপনিষদ্ দুইটি,—ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ও কেনোপনিষদ্। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শেষ আটটি অধ্যায়ের নাম ছান্দোগ্যোপনিষদ্। কেনোপনিষদ্ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্গত। এই দুইটি উপনিষদ্ বিখ্যাত ও উপনিষদ্‌রাজির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ আকারে সুবৃহৎ, আটটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে ষষ্ঠ হইতে শেষ পর্যন্ত বেদান্তদর্শনের কার্য-কারণবাদ, আত্মতত্ত্ব, জীবব্রহ্মঐক্য, ব্রহ্মস্বরূপ বিচার প্রভৃতি তদন্তর্গত। আরুণি তৎপুত্র শ্বেতকেতুকে বিবিধ সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্তদানে জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে প্রপঞ্চের ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রভৃতি বেদান্তের গভীর তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। বেদের 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য এই ছান্দোগ্যোপনিষদেই প্রথম শ্রুত হয়। নয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষিপ্রবর পিতা আরুণি তৎপুত্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন এবং প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের শেষে 'তত্ত্বমসি' উপদেশ করিয়াছেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

কেনোপনিষদে 'কেন' অর্থাৎ কাহার দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত, হইতেছে এই চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্রাদি পরিচালিত হইতেছে এই জিজ্ঞাসার উত্তরসূত্রে বিশ্বের উৎস ও আধার ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। বর্তমানে পাশ্চাত্ত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অন্যতম ফ্রান্স্ দেশের লুই রেণু (Louis Renou) তাঁহার 'The influence of Indian thought on French literature' (ফরাসী সাহিত্যে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব) নামক পুস্তিকায় ফরাসীর অমর সাহিত্যিক ভিক্তর হুগোর (Victor Hugo) উপর কেনোপনিষদ্ কি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা দেখাইয়াছেন। সামবেদের তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের একটি খণ্ড আরণ্যক নামে অভিহিত। ইহাকে ছান্দোগ্য

কেনোপনিষদ্

আরণ্যক বলা হয়। সামবেদের সংহিতা ও আরণ্যক সত্যব্রত-সামশ্রমী প্রণয়নপূর্বক ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহার সংস্করণই সামবেদের প্রামাণিক সংস্করণরূপে বিদ্বৎসমাজে আদৃত। সম্প্রতি তিরুপতি-সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সামবেদের ব্রাহ্মণগুলি প্রকাশ করিয়াছে।

যজুর্বেদ :—যজুর্বেদ কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ নামে দুই শাখায় বিভক্ত। শুক্লযজুর্বেদকে বাজসনেয় সংহিতাও বলা হয় এবং কৃষ্ণযজুর অপর নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। দুইটি শাখার ব্রাহ্মণাদি পৃথক্ পৃথক্ দেখান হইতেছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের কঠ ও মৈত্রায়নী শাখার ব্রাহ্মণ এই বেদের সংহিতাখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। প্রখ্যাত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এই বেদের গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণ; উহা তৈত্তিরীয় সংহিতারই বিস্তৃতিমাত্র। অন্য তিনটি বেদ ও শুক্লযজুঃ হইতে কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি বিশেষ পার্থক্য বা বৈলক্ষণ্য এই অন্যান্য বেদে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ পৃথক পৃথক রহিয়াছে এবং তাহাদের পৃথক লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু কৃষ্ণযজুঃ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে; সংহিতার মধ্যে ব্রাহ্মণ ভাগ ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সংহিতা ভাগ ও সংহিতালক্ষণ মিশ্রিত হইয়া আছে। কেহ কেহ মনে করেন সংহিতা ও ব্রাহ্মণের এই মিশ্রণের জন্যই এই বেদের 'কৃষ্ণযজুঃ' নাম হইয়াছে কারণ সংস্কৃতে 'কৃষ্ণ' শব্দের কাল রং ব্যতীত 'মিশ্রিত' অর্থও কোষে পাওয়া যায়। এই বেদের আরণ্যক হইল তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং উপনিষদ পাঁচটি,—মহানারায়ণ, মৈত্রায়ণ, তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর; তৈত্তিরীয় আরণ্যক দশখণ্ডে বা প্রপাঠকে সমাপ্ত এবং তাহার সপ্তম, অষ্টম এবং নবম খণ্ডের সমষ্টি তৈত্তিরীয় উপনিষদ্। এই উপনিষদে প্রাচীন ভারতে আরণ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকগণের সমাবর্তনোৎসবে যে অতুলনীয় দীক্ষান্তভাষণ প্রদত্ত হইত তাহা লিপিবদ্ধ আছে। বালক ভৃগুর পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত দেহীর পঞ্চকোশ এবং আত্মার আনন্দস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি স্বরূপ-লক্ষণের আনন্দ লক্ষণটি এই উপনিষদে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

কঠোপনিষদে দুইটি অধ্যায় আছে এবং প্রতিটি অধ্যায় আবার তিন তিনটি বল্লীতে বা খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে মৃত্যুরাজ যমের নিকট তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বালক নচিকেতার পরলোকতত্ত্ব, আত্মার স্বরূপ ও ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং তদুত্তরে যমরাজকর্তৃক আত্মতত্ত্ব

কঠোপনিষদ্

বিশ্লেষণ মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। পার্থিব কোন প্রলোভনই ঐ অসামান্য বালককে আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিবিদিষা হইতে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হয় নাই; তাহার সংযম ও বৈরাগ্য যতিরও আদর্শ। পরলোকতত্ত্বের আলোচনা এই উপনিষদে থাকায় ও মৃত্যুরাজ যম উপদেষ্টা বলিয়া শ্রাদ্ধে কঠোপনিষদ পাঠ করার বিধি আছে। শ্বেতাশ্বতোরোপনিষদে আমরা বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শনের একটি অভিনব সমন্বয় দেখিতে পাই।

শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়ি সংহিতা

এই সংহিতার একটিই ব্রাহ্মণ, নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। গুরুত্বে এই ব্রাহ্মণটি ব্রাহ্মণগ্রন্থরাজির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে; গুরুত্বেও গভীর, কলেবরেও বিশাল। ইহার একশত অধ্যায় থাকায় শতপথ নাম হইয়াছে। মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব নামে এই ব্রাহ্মণের দুইটি শাখা আছে। তন্মধ্যে মাধ্যন্দিন শাখায় একশত অধ্যায় এবং কাণ্ব শাখায় একশত চারিটি অধ্যায় দৃষ্ট হয়। শাখা কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। এই ব্রাহ্মণটি চৌদ্দ (১৪) কাণ্ডে বিভক্ত। প্রতিকাণ্ডে কয়েকটি করিয়া অধ্যায় আছে এবং প্রতিটি অধ্যায় আবার কতিপয় প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রত্যেকটি প্রপাঠক আবার কতিপয় 'ব্রাহ্মণ' নামক অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি ব্রাহ্মণ আবার কতিপয় কণ্ডিকা নামক খণ্ডে বিভক্ত। মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে সর্বসমেত ১৪টি কাণ্ড, ১০০টি অধ্যায়, ৬৮টি প্রপাঠক, ৪৩৮টি ব্রাহ্মণ এবং ৭৬২৪টি কণ্ডিকা আছে। প্রবচন উদ্ধৃতি কালে সাধারণতঃ প্রপাঠকের উল্লেখ করা হয় না, অন্য চারিটি বিভাগের উল্লেখ করা হয়। যথা শতপথ ব্রাহ্মণ ১০-৪-২-২২ বলিতে বুঝিতে হইবে দশম কাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের দ্বাবিংশততম কণ্ডিকা। চৌদ্দটি কাণ্ডের মধ্যে প্রথম নয়টি কাণ্ড বাজসনেয় সংহিতা বা শুক্ল যজুর্বেদের প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা মাত্র।

শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্

প্রথম কাণ্ডে ইষ্টি নামক যাগের প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস নামক প্রসিদ্ধ ইষ্টি, ও দ্বিতীয় কাণ্ডে অগ্নিহোত্র নামক দৈনন্দিন হোম, পিণ্ডপিতৃ-যজ্ঞ, নবান্ন নামক ইষ্টি এবং চাতুর্মাস্যের বর্ণনা আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ কাণ্ডে প্রসিদ্ধ সোমযাগের দীক্ষা, প্রায়ণীয় ইষ্টি, সোমক্রয়, আতিথ্য ইষ্টি, উপসৎ ইষ্টি, যজ্ঞবেদী নির্মাণ, সোমরসনিষ্কাশন, পশু ও পুরোডাশ আহুতি, পত্নীসংযাজ, অবভৃথ প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গের আলোচনা আছে। রাজার রাজ্যাভিষেক সংশ্লিষ্ট রাজসূয় ও বাজপেয়

শতপথ ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব

নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ যাগের বিবরণ পঞ্চম কাণ্ডের বিষয়বস্তু। অথর্ববেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ এই তিনটি বৈদিক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের নৃপতিদের রাজ্যাভিষেক বা সিংহাসনারোহন-প্রথার বিবরণ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। এতজ্জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ-দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালে রাজার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা, মন্ত্রিপরিষদ্, রাজ্যের বিভিন্ন বর্ণের ও সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের গুরুত্ব, মহিষীদের স্থান, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ক্ষমতা, রাজা ও মন্ত্রিগণের সম্বন্ধ, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, নৃপতিনির্বাচনে ও রাজ্যাভিষেকে প্রজাদের হাত, রাজা মহারাজ সম্রাট সার্বভৌম প্রভৃতি নৃপতিদের ক্রমঃ-উর্দ্ধস্তর এবং স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, আধিপত্য, একরাজ্য প্রভৃতি বিবিধ প্রকার রাজ্য ও তাহাদের ভৌগোলিক বিবরণ ইত্যাদি বৈদিক ভারতের মূল্যবান রাজনৈতিক তথ্য শতপথ ব্রাহ্মণের পঞ্চম কাণ্ডে নিহিত আছে। ষষ্ঠ হইতে দশম এই পাঁচটি কাণ্ডে আমরা পাই অগ্নিরহস্য, বিচিত্র ও বিশাল যজ্ঞবেদী নির্মাণ এবং সেই বেদীর আধ্যাত্মিক ও রূপক ব্যাখ্যা। এই অগ্নিবিদ্যা বা অগ্নিরহস্য শাণ্ডিল্য ঋষি কর্তৃক প্রকাশিত, তজ্জন্য ইহাকে শাণ্ডিল্যবিদ্যাও বলা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের মুখ্য প্রবক্তা বৈদিক যুগের ঋষিকুল-শিরোমণি যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং। কিন্তু এই অগ্নিরহস্য নামক পাঁচটি কাণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের নাম পাওয়া যায় না, শাণ্ডিল্যের নাম দৃষ্ট হয়। একাদশ কাণ্ডে পশুবন্ধ যাগ ও পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিবরণ আছে। দ্বাদশ কাণ্ডে দ্বাদশাহ নামক সত্র, সংবৎসর সত্র এবং সৌত্রামণী নামক প্রায়শ্চিত্ত যাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও পিতৃমেধ নামক চারিটি যাগের বিবৃতি পাই ত্রয়োদশ কাণ্ডে। এতন্মধ্যে অশ্বমেধ অতি প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ; ইহাকে যজ্ঞের রাজাও বলা হইয়াছে। যে রাজা বা সম্রাট্ সার্বভৌম নৃপতি হইতে ইচ্ছা করিতেন অশ্বমেধ তাঁহাকে করিতেই হইত। এই কাণ্ডে বিভিন্ন বর্ণভেদে ও স্ত্রীপুরুষ-ভেদে শবসংকার প্রথা ও শ্মশানে মৃত্তিকা স্তূপ নির্মাণের উল্লেখও পাওয়া যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ কাণ্ডটির নাম বৃহদারণ্যক এবং এই বৃহদারণ্যকই শুক্লযজুর্বেদের একমাত্র আরণ্যক। এই বৃহদারণ্যকের শেষ ছয়টি অধ্যায় লইয়া প্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ রচিত। এই উপনিষদ্‌টি ছান্দোগ্যের ন্যায় কলেবরে বিশাল এবং গুরুত্বে গম্ভীর। রাজর্ষি জনক বিদ্যোৎসাহী এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার রাজসভায় বিদ্বান্ ঋষি ও বিদুষী নারী

ঋষিগণের সর্বদা সমাগম হইত, এবং বহু বিচার বিতর্ক হইত। এই বিতর্কে যাহারা জয়ী হইত জনক অকৃপণহস্তে তাহাদিগকে গোহিরণ্যাদিদানে পুরস্কৃত করিতেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থে এই জাতীয় দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়ক বিতর্ককে 'ব্রহ্মোদ্য' বলা হইত। শতপথ ব্রাহ্মণে, বৃহদারণ্যকে ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে অর্থাৎ শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে বহু ব্রহ্মোদ্য বা বিতর্ক লিপিবদ্ধ আছে। অশ্বমেধ প্রভৃতি কয়েকটি যজ্ঞে বিতর্ক বাধ্যতামূলক ছিল। ঋষিপ্রবর ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অন্যান্য ঋষিদের রাজা জনকের সভায় বিবিধ বিচার বিতর্ক এবং বিশেষ করিয়া বৈদিক ভারতের ব্রহ্মবাদিনী পরমবিদুষী গার্গীর সহিত বিচার বৃহদারণ্যকোপনিষদে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

এই উপনিষদেই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর বৈরাগ্যশীলা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পত্নী মৈত্রেয়ীর কথোপকথন এবং যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক মৈত্রেয়ীকে পরমজ্ঞানদান কীর্তিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দুই পত্নী কাত্যায়ণী ও মৈত্রেয়ীকে পার্থিব সম্পত্তি দান করিয়া যখন সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেন, ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ভাবিলেন 'সংসার অসার ও তুচ্ছ ভাবিয়া পতি প্রব্রজ্যা, সন্ন্যাস লইতেছেন ; এই তুচ্ছ সংসার অর্থাৎ অসার নশ্বর পদার্থ আমাদের দিতেছেন ; যদি এই অসার বস্তু আমাকে অমৃতত্ব দান করিতে না পারে, তাহা হইল সেই তুচ্ছ পদার্থ কিজন্য গ্রহণ করিব।' নশ্বর ঈশ্বরের সন্ধান দিতে পারে না। তিনি পতিকে বলিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'। অর্থাৎ যাহা আমাকে অমৃতত্ব দিতে পারিবে না তাহা লইয়া আমি কি করিব? মৈত্রেয়ীর এই উক্তিতে ভারতাত্মার চিরন্তনী বাণী ঘোষিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের বহু দার্শনিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ঐরূপ সুপ্রাচীনকালে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি রমণীর এতাদৃশ জ্ঞান ও বৈরাগ্য দর্শনে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। অলোকসামান্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ যে যাজ্ঞবল্ক্য সকল ঋষিকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তিনি রমণী গার্গীকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। উভয়েই সমতুল্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। এই সকল বিতর্ক ও ব্রহ্মোপদেশ ব্যতীত সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের যুগপৎ জগৎকেন্দ্র-অন্তর্যামিত্ব ও জগৎ-অতিক্রান্ত বা বিশ্বাতিগস্বরূপ, ব্রহ্মবিৎ-পুরুষের শ্রৌতস্মার্ত চিহ্নাদির পরিহার ইত্যাদি বিষয়ও এই উপনিষদে আলোচিত হইয়াছে।

এই বেদের আরেকটি উপনিষদ্ হইল ঈশোপনিষদ্। ইহাতে মাত্র

অষ্টাদশটি (১৮) শ্লোক আছে। শুক্ল যজুর্বেদের অন্তিম অধ্যায় অর্থাৎ চত্বারিংশৎ অধ্যায়ের নামই ঈশোপনিষদ্। 'ঈশা বাস্যম্' শব্দদ্বয় এই উপনিষদের প্রথম দুটি শব্দ বলিয়া ইহাকে ঈশা-বাস্যোপনিষদ্ও বলা হয়। সংহিতা বা মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই উপনিষদ্কে মন্ত্রোপনিষদ্ বলা হয়।

ঈশোপনিষদ্

অথর্ববেদ—অথর্ববেদের একটিই ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় গোপথ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ তিনটি মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ও প্রশ্ন। এই বেদের কোনও আরণ্যক আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

গোপথ ব্রাহ্মণের ভাষা ও বিষয়বস্তু অপর তিন বেদের ব্রাহ্মণের ভাষা হইতে পৃথক এবং মনে হয় পরবর্তী। এই ব্রাহ্মণে ছাত্রজীবন ও ব্রহ্মচর্যের কথা বিস্তৃত ও বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্রহ্মচর্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং ছাত্রজীবনের বিধি, নিষেধ, অধ্যয়ন, পাঠক্রম, ভিক্ষাচর্যা, সমিদাহরণ, গুরুসেবা, ছাত্রের আচরণ, ইতর জীবজন্তুর ব্যবহার হইতেও ছাত্রেরা কিভাবে উপদেশ সংগ্রহ করিতে পারে ইত্যাদি বিবিধ বিষয় কীর্তিত হইয়াছে।

অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্

যাগযজ্ঞের কথাও এই ব্রাহ্মণে আছে। ব্লুমফিল্ড্ (Bloomfield) ও ভিন্টারনিৎস (Winternitz) গোপথ ব্রাহ্মণ বৈদিকোত্তর যুগের পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। তাঁদের মতে প্রথমে অথর্ববেদের কোন ব্রাহ্মণই ছিল না ; ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ হইতে পারে না এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালে গোপথ ব্রাহ্মণ রচিত হয়। ভাষা ও বিষয়বস্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অর্বাচীন ও মনুসংহিতাদি যুগের বলিয়া মনে হয়। আবার বেরিডেল কীথ (Keith) ও কালান্দ (Caland) মনে করেন গোপথ ব্রাহ্মণ প্রাচীন ও শতপথ ব্রাহ্মণের সমসাময়িক।

গোপথ ব্রাহ্মণ

প্রশ্নোপনিষদে ছয়টি প্রশ্ন বা অধ্যায় আছে ; প্রত্যেক প্রশ্নে এক একটি প্রশ্নের সমাধান আছে। ঋষিগণ ভগবান্ পিপ্পলাদের নিকট গিয়া বিবিধ বিষয় জিজ্ঞাসা (প্রশ্ন) করেন। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির মূল কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন এবং তাহার উত্তরদান প্রসঙ্গে পিপ্পলাদ ব্রহ্মতত্ত্ব ও পিতৃযান, দেবযান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রয়াণমার্গ ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় প্রশ্নে দেবতাগণের কথা, প্রাণের কথা জিজ্ঞাসা করেন ও আচার্য উত্তর দেন। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাণের উৎস এবং শরীরে প্রাণ সঞ্চারের কারণ সম্বন্ধে ব্রহ্মিষ্ঠ কৌসল্য ঋষির প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর

প্রশ্নোপনিষদের বিষয়বস্তু

লিপিবদ্ধ আছে। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে জীবের স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, সুষুপ্তি অবস্থার লক্ষণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির পার্থক্য এবং নিদ্রাবস্থায় পঞ্চবায়ুর ক্রিয়া প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চম প্রশ্নে শিবিপুত্র সত্যকামের জিজ্ঞাসার উত্তরে পিপ্পলাদ ওঁকার সাধনার তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। যিনি প্রকৃত রূপে ওঁকার সাধন করিতে পারেন তিনি অজর অমর অভয় পরমব্রহ্মকে লাভ করেন, আর যিনি পারেন না তিনি অপর-ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। ষষ্ঠ প্রশ্নে ভরদ্বাজ পুত্র সুকেশার জিজ্ঞাসার উত্তরে আচার্য ষোড়শকলাযুক্ত পুরুষের বিবরণ দিয়াছেন। সমগ্র প্রশ্নোপনিষদ্ গদ্যে রচিত, কেবল দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃতিসূত্রে স্থান পাইয়াছে।

মুণ্ডকোপনিষদ্ তিনটি মুণ্ডকে বিভক্ত। অধ্যায়ের নাম মুণ্ডক হইয়াছে। প্রতিটি মুণ্ডক আবার দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। সর্বসমেত তিনটি মুণ্ডক ও ছয়টি খণ্ড। প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে পরা ও অপরাবিদ্যার বর্ণনা আছে। ঋগ্-বেদাদি শাস্ত্রকে অপরাবিদ্যা এবং যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি হয় তাহাকে পরা-বিদ্যা বলা হইয়াছে। পরাবিদ্যাযোগে মোক্ষ লাভ হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে অগ্নিহোত্রচতুর্মাস্যাদি যজ্ঞের কথা এবং যজ্ঞের নিন্দা শ্রুত হয়। যাগস্বরূপ নৌকা জীবকে ভবসাগর তরণ করাইতে অসমর্থ। যজমানগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু কবলিত হন। ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র ভবাম্বুধিতরণী এবং মোক্ষ প্রাপক। সেই পরাবিদ্যা লাভের জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতে স্থাবর জঙ্গম, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রপঞ্চ জগতের প্রতি পদার্থ কিরূপে সেই পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহা বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রণব ওঁকার রূপে ব্রহ্মের ধ্যান ও ব্রহ্মোপাসনার কথা এবং সেই পরাৎপর পরমপুরুষের দর্শনে কর্মবন্ধন ছিন্ন হওয়ার কথা ঋষি বলিতেছেন। 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' (২-১-৮) তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে একই দেহে জীবাত্মা পরমাত্মা একই আত্মার রূপভেদে একই বৃক্ষে আশ্রিত পক্ষিদ্বয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ পুণ্যপাপ বর্জনে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। দ্বিতীয় খণ্ডে কামনারহিত পুরুষের ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধিলাভ, সকাম বিষয়-তৃষ্ণাযুক্তপুরুষের সাধন-বিফলতা, কেবল শাস্ত্রপাঠ বা মেধা দ্বারা আত্মাকে যে উপলব্ধি করা যায় না, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন আর ভিন্ন থাকেন না ইত্যাদি ইত্যাদি পরমার্থতত্ত্বের উপদেশ শ্রুত হয়।

মুণ্ডকোনিষদের বিষয়বস্তু

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ মাত্র দ্বাদশটি প্রবচনে সমাপ্ত। ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় পরব্রহ্মের প্রতীক ওঁকারের ব্যাখ্যান এবং জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, অন্তঃপ্রজ্ঞ-বহিঃপ্রজ্ঞ-প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি অবস্থার অতীত অগ্রাহ্য, সর্বলক্ষণবিরহিত, সর্বোপাধিশূন্য শান্ত শিব অদ্বৈত নিরঞ্জন পরব্রহ্মের প্রতিপাদন। ওঁকারের তিনমাত্রা 'অ' কার, 'উ'কার ও 'ম' কার যথাক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বোধক কিন্তু সেই অদ্বিতীয় শুদ্ধ ব্রহ্ম এই তিন মাত্রার অতীত। সেই পরব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন তিনি দ্বৈতসত্তাবিলয়ে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যান। পূজনীয় গৌড়পাদ এই মাণ্ডূক্যোপনিষদের বিস্তৃত কারিকা লিখিয়াছেন ; বেদান্ত দর্শনের গ্রন্থের মধ্যে সেই কারিকা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিংবদন্তী অনুসারে গৌড়পাদের শিষ্য ছিলেন শ্রীমৎ গোবিন্দ এবং পার্থিব দৃষ্টিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য এই শ্রীমৎ গোবিন্দকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

মাণ্ডূক্যোপনিষদ

উপরে প্রতি বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মনে রাখিবার সুবিধার জন্য নিম্নে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল ;—

ঋগ্‌বেদ
- ব্রাহ্মণ— ঐতরেয়, কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন
- আরণ্যক—ঐতরেয়, কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন
- উপনিষদ্—ঐতরেয়, কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন

(সাংখ্যায়ন বা শাংখ্যায়ন উভয় বানানই শুদ্ধ।)

সামবেদ
- ব্রাহ্মণ—তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ, ষড়বিংশ, ছান্দোগ্য জৈমিনীয় বা তলবকার, সামবিধান, আর্ষেয় ; বংশ ও দেবতাধ্যায়
- আরণ্যক—ছান্দোগ্য
- উপনিষদ্—ছান্দোগ্য, কেন

কৃষ্ণযজুর্বেদ
- ব্রাহ্মণ— তৈত্তিরীয়
- আরণ্যক—তৈত্তিরীয়
- উপনিষদ্—কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, মৈত্রায়ণ, তৈত্তিরীয়

শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়ি-সংহিতা
- ব্রাহ্মণ—শতপথ
- আরণ্যক—বৃহদারণ্যক
- উপনিষদ্—বৃহদারণ্যক, ঈশ

অথর্ববেদ { ব্রাহ্মণ—গোপথ
আরণ্যক—নাই
উপনিষদ্—প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য।

প্রতি বেদের সঙ্গে উল্লিখিত এই সকল উপনিষদ্ ব্যতীত আরও বহু উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। সর্বসমেত (১০৮) একশত আটটি উপনিষদ্ আছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে সবগুলি শ্রৌত উপনিষদ্ নহে, পরবর্তী কালে বৈদিকোত্তর যুগে রচিত। বর্ত্তমানে শ্রৌত ও অ-শ্রৌত উভয়বিধ উপনিষদ্ লইয়া একটি একটি বেদের বহুসংখ্যক উপনিষদ্ দৃষ্ট হয়। নিম্নে যথাসম্ভব তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

শ্রৌত ও অশ্রৌত উপনিষদ্

ঋগ্‌বেদীয় উপনিষদ্ ;—

ঐতরেয়, কৌষীতকি, বহ্বৃচ, নির্বাণ, নাদবিন্দু, আত্মপ্রবোধ, অক্ষমালিকা, মুদ্‌গল, সৌভাগ্য, ত্রিপুর।

সামবেদীয় উপনিষদ্ ;—

ছান্দোগ্য, কেন, আরুণি, মৈত্রেয়ী, মৈত্রায়ণী, বজ্রসূচী, যোগচূড়ামণি, বাসুদেব, সন্ন্যাস, মহা, অব্যক্ত, কুণ্ডিক, সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ, জাবাল, জাবালি।

কৃষ্ণযজুঃর্বেদীয় উপনিষদ্ ;—

তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, কঠরুদ্র, ব্রহ্ম, কৈবল্য, গর্ভ, নারায়ণ, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, কালাগ্নিরুদ্র, ক্ষুরিক, সর্বসার, শুকরহস্য, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগতত্ত্ব, দক্ষিণামূর্ত্তি, স্কন্দ, শারীরিক, যোগশিক্ষা, একাক্ষর, অক্ষি; অবধূত, হৃদয়, বরাহ, পঞ্চব্রহ্ম, যোগকুণ্ডলিনী, প্রাণাগ্নিহোত্র, কলিসন্তরণ এবং সরস্বতীরহস্য।

শুক্লযজুর্বেদীয় উপনিষদ্ ;—

বৃহদারণ্যক, ঈশ, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবালা, মন্ত্রিকা, নিরালম্ব, ত্রিশিখী, তারক, পৈঙ্গল, অধ্যাত্ম, ভিক্ষু, তারসার, সাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, তুরীয়াতীত, ব্রাহ্মণমণ্ডল এবং মুক্তিক।

অথর্ববেদীয় উপনিষদ্ ;—

প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অথর্বশিরঃ, অথর্বশিক্ষা, বৃহজ্জাবাল, রামতাপনী, নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী, ত্রিপুরতাপনী, জবলা, নারদ, শরভ, সীতা,

রামরহস্য, দেবী, কৃষ্ণ, গণপতি, অন্নপূর্ণা, পাশুপত, সূর্য্যাত্মা, গরুড়, শাণ্ডিল্য, মহানারায়ণ, পরিব্রাজক, ভস্ম, মহাবাক্য, ভাবনা, পরমহংস, দত্তাত্রেয় এবং হয়গ্রীব।

—পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য চারিবেদের এই কয়টি উপনিষদের উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন,—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর।

উপরের আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে 'বেদ' বলিতে মাত্র একটি গ্রন্থ বুঝায় না, প্রতি বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ লইয়া একটী বিশাল গ্রন্থাগার বুঝায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত জার্ম্মান বিদ্বদ্বর ভিন্টারনিৎস্ (Winternitz) তাঁহার '*History of Indian Literature*' Vol I (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'It (the Veda) does not mean one single literary work, as for instance the word 'Koran' ; nor a complete collection of a certain number of books, compiled at some particular time as the word, 'Bible, or as the word 'Tipitaka', the Bible of the Buddhists, but a whole great literature which arose in the course of many centuries, and through centuries has been handed down from generation to generation by verbal transmission,'

(শ্রীযুক্তা কেট্কার কৃত ইংরাজী অনুবাদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫১, ৫৩)। ভিন্টারনিৎস্ বলিতেছেন, "বেদ বলিতে একটি মাত্র পুস্তক বুঝায় না যেমন 'কোরাণ' বলিতে বুঝায় ; অথবা বাইবেল বলিতে বা বৌদ্ধদের বাইবেল স্বরূপ 'ত্রিপিটক' বলিতে যেমন কোনও এক সময়ে কয়েকটি খণ্ড একত্রে সন্নিবেশ পূর্বক একটি ধর্মগ্রন্থ রচনা বুঝায়, বেদ বলিতে তদ্রূপ গ্রন্থ রচনা বুঝায় না। বেদ একটি বিশাল অখণ্ড সাহিত্য যাহা যুগ যুগ ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যুগ যুগ ধরিয়া গুরুশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব চারিটি বেদের সংহিতা অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই পরিচ্ছেদের বিষয়।

ঋক্‌সংহিতা : যে সকল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বেদের ক্রমিক উৎপত্তি বিশ্বাস করেন, অপৌরুষেয়ত্ব ধারণা করিতে পারেন না তাঁহারা চারি বেদের মধ্যে ঋক্-সংহিতাকে প্রাচীনতম বলিয়াছেন। শুধু ভারতীয় চিন্তার প্রাচীনতম নিদর্শন নহে, ইন্দো য়ুরোপীয় নামক আর্যগোষ্ঠীগত সমস্ত জাতির ও ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। মনীষী ম্যাক্‌ডোনেল (Macdonell) তাঁহার *'A Vedic Reader for Students'* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ঋগ্‌বেদের কালবিচার প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "The Rigveda is undoubtedly the oldest literary monument of the Indo European languages." অর্থাৎ ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষানিচয়ের মধ্যে সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বা গৌরবস্তম্ভ হইতেছে ঋগ্‌বেদ।

ঋক্; সাম, যজুঃ ও অথর্ব সংহিতা-চতুষ্টয়ের মধ্যে ঋক্‌সংহিতা প্রাচীনতম কারণ ঋক্‌সংহিতার বহু মন্ত্র অন্যান্য সংহিতায় দৃষ্ট হয়। ঋক্‌সংহিতার সকল মন্ত্রই সামবেদের সংহিতায় দৃষ্ট হয়, কেবল ৭৫টি মন্ত্র অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় ঋক্‌সংহিতার বহু মন্ত্র পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদেও কতকগুলি ঋক্‌মন্ত্র দৃষ্ট হয়। অথর্ববেদের শৌনিক সংহিতায় ঋক্‌সংহিতার ১২০০ (এক হাজার দুই শত) মন্ত্র আছে। শৌনককৃত চরণব্যূহ গ্রন্থ মতে যজুর্বেদে ঋগ্‌বেদের ১৯০০ (এক হাজার নয় শত) মন্ত্র আছে।

ঋক্‌সংহিতার দুই প্রকার বিভাগ দৃষ্ট হয় ;—

( ) মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত ও ঋক্ ; (২) অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও মন্ত্র। প্রথম বিভাগটি অনুষ্ঠানের উপযোগী, দ্বিতীয়টি অধ্যয়নের পক্ষে উপযোগী।

(১) মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত ও ঋক্। ঋক্‌বেদের মন্ত্রের স্তবককে ঋক্ (Verse) বলে। কতিপয় ঋক্ লইয়া একটি সূক্ত (Hymn) গঠিত হয়। সু উক্ত=সূক্ত অর্থাৎ শোভনবাক্য অর্থাৎ স্তুতি, প্রশংসা ; সাধারণতঃ এক এক দেবতার উদ্দেশ্যে এক একটি স্তুতি ; কখনও কখনও এক সূক্তে কয়েকজন দেবতার স্তুতিও দৃষ্ট হয়। কয়েকটি সূক্ত লইয়া একটি অনুবাক এবং কয়েকটি অনুবাকের সমষ্টি হইল এক একটি মণ্ডল। সমগ্র ঋক্‌সংহিতায় দশটি (১০) মণ্ডল, পঁচাশীটি (৮৫) অনুবাক, এক হাজার সতরটি (১০১৭) সূক্ত এবং

দশ হাজার ছয় শত (১০,৬০০) ঋক্ আছে। এগারটি বালখিল্য ঋষিগণ দৃষ্ট বালখিল্য সূক্ত লইয়া ১০,৬০০টি ঋক্‌সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারের বিভাগ অনুযায়ী ঋক্‌সংহিতায় আটটি (৮) অষ্টক, চৌষট্টি (৬৪) অধ্যায় এবং দুই হাজার ছয়টি (২০০৬) বর্গ আছে। কয়েকটি বর্গ লইয়া একটি অধ্যায় এবং কয়েকটি অধ্যায় লইয়া এক একটি অষ্টক গঠিত। আটটি অধ্যায় লইয়া এক একটি অষ্টক, এইজন্যই 'অষ্টক' নামকরণ হইয়াছে। প্রথমোক্ত বিভাগে প্রতি মণ্ডলে অনুবাক সংখ্যা সমান নহে। দ্বিতীয় মণ্ডলে অনুবাক সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম, মাত্র চারিটি অনুবাক এবং প্রথম মণ্ডলে সর্বাপেক্ষা অধিক, চব্বিশটি অনুবাক। প্রথম ও দশম মণ্ডলে সূক্তের সংখ্যা সর্বাধিক ; উভয় মণ্ডলে (এক শত একানব্বই) ১৯১টি করিয়া সূক্ত আছে। কয়েকটি ঋক্ লইয়া এক একটি সূক্ত গঠিত,—পূর্বে বলা হইয়াছে ; কিন্তু এই ঋক্ সংখ্যা নিয়মিত নহে। একটি সূক্তের সর্বনিম্ন ঋক্‌সংখ্যা মাত্র একটি ঋক্ এবং সর্বাধিক ঋক্‌সংখ্যা আটান্ন (৫৮) দৃষ্ট হয়। সমগ্র ঋক্‌সংহিতায় চার লক্ষ বত্রিশ হাজার (৪, ৩২, ০০০) অক্ষর আছে।

ঋগ্‌বেদের শাকল ও বাস্কল দুটি শাখা ভেদে সূক্ত সংখ্যার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শাকল শাখামতে ১০১৭টি সূক্ত এবং বাস্কল শাখা মতে ১০২৮টি সূক্ত এই সংহিতায় আছে : অর্থাৎ প্রথম শাখা হইতে দ্বিতীয়টিতে এগারটি সূক্ত অধিক আছে। তাহার কারণ এই ;—ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলে ৪৯ তম হইতে ৫৯ তম সূক্ত অবধি একাদশটি সূক্তের নাম বালখিল্য সূক্ত। বালখিল্য নামক ঋষিগণ এই সূক্ত দর্শন করিয়াছিলেন। এই একাদশটি সূক্ত বাদ দিয়া সূক্তসংখ্যা ধরিয়াছে শাকলশাখা কিন্তু বাস্কলশাখা এই একাদশটি সূক্তও সূক্তসংখ্যা গণনায় ধরিয়াছে। বালখিল্য সূক্তগুলি সংহিতার অন্তর্গত, বৈদিকগণ উহার আবৃত্তিও করেন কিন্তু যেহেতু উহার পদপাঠ দৃষ্ট হয় না এবং সংহিতার অক্ষর গণনায় গৃহীত হয় নাই তজ্জন্য কেহ কেহ উহাকে সূক্তসংখ্যা মধ্যে গণনা করেন না।

দশটি মণ্ডলে সংহিতাকে বিভক্ত করার মধ্যে একটি নীতি অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহাদের মতে দ্বিতীয় হইতে অষ্টম মণ্ডল পর্য্যন্ত সাতটি মণ্ডলে যথাক্রমে সাতটি ঋষিকুলে শ্রুতিবিধৃত মন্ত্ররাজি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যথা—ঋষি গৃৎসমদ (দ্বিতীয় মণ্ডল), ঋষি বিশ্বামিত্র (তৃতীয়), বামদেব (চতুর্থ), অত্রি (পঞ্চম), ভরদ্বাজ (ষষ্ঠ), বশিষ্ঠ (সপ্তম) এবং কণ্ব (অষ্টম)। এইজন্য এই মণ্ডলগুলিকে 'Family Books' আখ্যা দেওয়া

হইয়াছে। বশিষ্ঠ এবং বসিষ্ঠ উভয় বানানই শুদ্ধ। নবম মণ্ডলে একমাত্র দেবতা সোমের প্রশস্তিসূচক বিবিধ ঋষিদৃষ্ট সূক্ত আছে। প্রথম এবং দশম মণ্ডলের সূক্তগুলি বিবিধ বিষয় লইয়া রচিত। প্রথম মণ্ডলে প্রথম সূক্ত অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে গায়ত্রীছন্দে রচিত। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মধুচ্ছন্দা। দশম-মণ্ডলে বিখ্যাত পুরুষসূক্ত (৯০ তম সূক্ত) বিদ্যমান। সেই পুরুষসূক্তেই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণের নাম শ্রুত হয় ;—

'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥' (১০-৯০-১২)

প্রাশ্চাত্য বা প্রাচ্য যে সকল পণ্ডিত বেদের ক্রমিক বিকাশে বিশ্বাসী তাঁহারা মনে করেন শেষ মণ্ডলে এই চারিবর্ণের নাম পাওয়া যায় বলিয়া ঋক্‌সংহিতা যুগের প্রথম দিকে চারিবর্ণের অস্তিত্ব ছিল না ; ম্যাক্‌ডোনেল (Macdonell), ম্যাক্‌স্‌মূলার (MaxMüller) প্রভৃতি অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য বিদ্বানদের ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে কারণ একত্রে চারিবর্ণের নাম পূর্ব পূর্ব মণ্ডলে না থাকিতে পারে কিন্তু পৃথক পৃথকরূপে পাওয়া যায়, যথা চতুর্থ মণ্ডলে বৃহস্পতি সূক্তের অষ্টম ঋকের (৪-৫০-৮) শেষ পঙ্‌ক্তিতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়.—

'তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবানমন্তে
যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্বএতি।'

অর্থাৎ যে রাজার অগ্রে অগ্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিত গমন করেন, প্রজাগণ (বিশঃ) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই নৃপতিকে প্রণাম করে।

ঋগ্‌বেদের প্রথম হইতে নবম পর্যন্ত নয়টি মণ্ডলে গঙ্গানদীর নাম পাওয়া যায় না। অবশ্য ষষ্ঠ মণ্ডলে ৬-৪৫-৩১ মন্ত্রে "গাঙ্গ্য" শব্দ পাওয়া যায় কিন্তু সকল টীকাকার ঐ শব্দের ব্যাখ্যায় একমত নহেন। দশম মণ্ডলেই প্রথম গঙ্গার উল্লেখ দৃষ্ট হয় ;—

'ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতী শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।' (১০-৭৫-৫)

সমগ্র ঋক্‌সংহিতায় এই একবারই মাত্র গঙ্গার নাম আমরা পাই। ইহা হইতে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন প্রথম হইতে নবম মণ্ডল আর্যাবর্তের উত্তরভাগে সরস্বতী-নদী-শোভিত যে জনপদ বেদে সুবাস্তু জনপদ নামে কীর্তিত হইয়াছে সেই সুবাস্তু জনপদে প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন দশম-মণ্ডল প্রকাশিত হয় তখন আর্যগণ উত্তর ভারত হইতে গঙ্গা উপত্যকায় (Gangetic plain) নামিয়া আসিয়াছেন।

বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত ঋক্‌বেদের মন্ত্রগুলি অপূর্ব কাব্যের রূপ ধারণ করিয়াছে। উষা দেবী, অপাং নপাৎ নামক বিদ্যুৎ দেবতা, সূর্য, পর্জন্য প্রভৃতির উদ্দেশে রচিত মন্ত্রগুলি কল্পনার ইন্দ্রজালে অপরূপ, কাব্যধর্মে অতুলনীয় ও রসোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। উষা দেবীকে লক্ষ্য করিয়া একটি মন্ত্রে ঋষি স্তুতি করিতেছেন,—

কাব্যহিসাবে ঋগবেদের অতুলনীয়ত্ব

'ব্যূব্রজস্য তমসো দ্বারো
চ্ছন্তীর-ব্রঞ্ছুচয়ঃ পাবকাঃ।' (৪-৫১-২)

'স্বর্ণালোকে মহীয়সী উষাদেবী প্রত্যুষে উজ্জ্বল ও পবিত্র হস্তে অন্ধকারার সিংহদ্বার খুলিয়া দেন ও স্বর্ণালোকে জগৎ উদ্ভাসিত করেন।' পর্জন্যদেব বা মেঘকে লক্ষ্য করিয়া ঋষি গাহিতেছেন,—

'রথীব কেশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্ন্‌
আবির্দূতান্‌ কৃণুতে বর্ষ্যা অহ।
দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে
যৎ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ॥" (৫-৮৩-৩)

'সারথি যেরূপ অশ্বকে চাবুক মারে, পর্জন্যও সেইরূপ শত শত চাবুকের ন্যায় তাঁর বৃষ্টিদূতদের পৃথিবীতে পাঠান, অনুরূপ শব্দ হয়। যখন পর্জন্যদেব নভোমণ্ডলকে বর্ষণমুখর করেন তখন মেঘের ডম্বরুনাদে যেন শত শত সিংহের গম্ভীর গর্জন শ্রুত হয়।' এই মন্ত্রটিতে উপমা অলঙ্কারের অপরূপ মাধুরী রূপায়িত। সূর্যের প্রত্যেকটি সূক্তই সুন্দর। মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের নাম বিষ্ণু। প্রথম মণ্ডলের একটি সূক্তে এক মন্ত্রে সিংহের সহিত মধ্যাহ্নগগনে বিরাজিত সূর্যকে তুলনা করা হইতেছে; 'পর্বতশিখরে ভীষণ সিংহ যেরূপ গর্বিতভাবে গ্রীবাহেলনে চতুর্দিক অবলোকন করে, বিষ্ণু (মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড) তদ্রূপ নভোমণ্ডলের উত্তুঙ্গস্থান হইতে সমগ্র জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছেন (১-১৫৪-২) সপ্তম মণ্ডলে মণ্ডূকদের উদ্দেশে একটি সূক্ত আছে। তাহার প্রথম মন্ত্রটি এই,

'সংবৎসরং শশয়ানা
ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ
বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং
প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ॥' (৭-১০৩-১)

ব্রতচারী ব্রাহ্মণ বালকগণ যেরূপ (দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিয়া) ব্রত পালন করেন, মণ্ডূকগণ তদ্রূপ দীর্ঘকাল (কায়কৃচ্ছ্র অবলম্বন করিয়া) শয়ন

করিয়া থাকে। আচার্য আসিয়া প্রথম বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে যেমন ব্রাহ্মণ বালকগণ বেদধ্বনি করিতে থাকে, তদ্রূপ (আচার্যতুল্য) পর্জন্য আসিয়া গম্ভীরধ্বনি করিলে মণ্ডূকগণ শব্দ করিতে আরম্ভ করে।' কি অপূর্ব কবিত্ব; অপরূপ কাব্য; কল্পনা ও উপমার পরাকাষ্ঠা। যদি খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার (3000 B. C.) ন্যূনকল্পে ঋগ্বেদ প্রকাশের কাল ধরা হয়, তাহা হইলেও সেই সুদূর অতীতে যখন পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ য়ুরোপ আমেরিকাদি ভূখণ্ড অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, যখন সভ্যতার আলোক পাশ্চাত্ত্যজগতে প্রবেশ করে নাই সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের সিন্ধু উপত্যকায়, সুবাস্তু জনপদে বেদমন্ত্রে এইরূপ একাধারে ধর্ম, দর্শন ও অনুপম কাব্যের সমাবেশ কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সকল দেশের ও সকল কালের পণ্ডিত ও মনীষীগণকে মুগ্ধ ও বিস্ময়ে হতবাক করিবে। ঋগ্বেদে এতাদৃশ অপরূপ কাব্যরস দর্শনে ও আস্বাদনে মহামতি (Winternitz) ভিন্টারনিৎস্ তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন, "Some pearls of lyric poetry, which appeal to us as much through their fine comprehension of the beauties of nature, as through their flowery language are to be found among the songs to Surya, Parjanya, Maruts and above all to Usas." (৯১ পৃষ্ঠা) '(ঋগ্বেদের) সূর্য, পর্জন্য, মরুৎ বিশেষ করিয়া উষঃ দেবতার সূক্তে কতকগুলি গীতিকাব্যের মুক্তা ছড়াইয়া রহিয়াছে, যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব উপলব্ধি ও কাব্যালঙ্কারসমৃদ্ধ ভাষা আমাদের চিত্তে স্পন্দন জাগায়।' ঋগ্বেদে দেবীরূপে প্রায় তিনশত বার উষার উল্লেখ আছে। উষাকে আকাশপুত্রী সত্যভাষিণী, দীপ্তিমতী, আলোক-রূপ বস্ত্রপরিহিতা নিত্যযৌবনসম্পন্না, শুভ্রবসনা, স্বর্ণোজ্জ্বলা, নৃত্যপরা, প্রভৃতি বিশেষণে ঋষিগণ ভূষিত করিয়াছেন।'.

সামবেদ সংহিতা :—

সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। সর্বসমেত সামবেদ সংহিতায় ১৮১০ (এক হাজার আটশত দশটি) মন্ত্র আছে; তন্মধ্যে মাত্র ৭৫টি মন্ত্র ব্যতীত সমস্তই ঋগ্বেদের মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি এবং এই সকল মন্ত্রের অধিকাংশ ঋক্ সংহিতার অষ্টম ও নবম মণ্ডলে সন্নিহিত। ঋক্ মন্ত্রসকল সামবেদে পুনরুক্ত হইলেও প্রধান পার্থক্য এই, মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদে গানরহিত এবং সামবেদে মন্ত্রগুলি সামগান-যুক্ত অর্থাৎ গানসহিত। মন্ত্রের পদগুলি

ঋক্ ও সামের সম্বন্ধ, পার্থক্য

উভয় সংহিতায় একরূপ হইলেও ঋগ্‌বেদে গানের রাহিত্য ও সামবেদে গানের সাহিত্য উহাদের পৃথক করিয়াছে।

ঋগ্‌বেদের সুসম্বন্ধ পাদবদ্ধ ছন্দোগুলিতে সুর সংযোগ করিলেই তাহা সামে পরিণত হয়। এই জন্যই সামবেদ ভাষ্য ভূমিকায় সায়ণাচার্য ঋক্‌কে "সামের কারণ ও আশ্রয়" বলিয়াছেন। 'গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে'; 'যে সকল সাম গান করা হয় তাহাদের আশ্রয় স্থল অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া সামগান করা হয় সেই ঋক্ সকল সামবেদে সঙ্কলিত হইয়াছে।' অতএব সায়ণের ভাষায় 'গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি,' গীতিরূপ-মন্ত্রগুলিই গানযুক্ত ঋক্‌সকলই 'সাম' আখ্যা পাইয়াছে। ঋক্ মন্ত্রের উপর সাতটি স্বর প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন ছন্দে ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্র সহকারে সামগান করা হইত।

গানই সামসূক্ত গুলির প্রাণস্বরূপ। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রের দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করা হয়, আর সামবেদের মন্ত্রের দ্বারা দেবতার স্তুতিগান করা হয়। গীত বা গানের সহিত স্তুতি উচ্চারণ করিলে তবেই তাহাকে স্তোত্র বলা হইত। 'প্রগীতমন্ত্রসাধ্যা স্তুতিঃ স্তোত্রম্'। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলি সামবেদে পুনঃশ্রুত হইলেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। এই পরিবর্ত্তনগুলি দেখিয়া দুই একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বোধহয় ঋগ্‌বেদ হইতে আরও পুরাতন কোনও বৈদিক সংহিতা ছিল। তাহা এখন লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই মত যুক্তিসহ নহে। প্রখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত Theodor Aufrecht (টেওডোর আউফ্রেশ্‌ট) তাঁর প্রণীত ঋগ্‌বেদের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এই মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন যুগ যুগ ধরিয়া ঋক্‌মন্ত্র সকল কর্ণে শ্রুত ও স্মৃতিতে বিধৃত হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া ঈষৎ পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর খুবই স্বাভাবিক।

সামবেদের সহস্র শাখা ছিল এই কিংবদন্তী ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থসমর্থিত। বেদের শাখা বিচার কালে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে এই বেদের মাত্র তিনটি শাখা পাওয়া যায়; রাণায়নীয়, কৌথুমী ও জৈমিনীয়; তন্মধ্যে কৌথুমী শাখা প্রসিদ্ধ। এই শাখামতে

সামবেদের দুইটি বিভাগ—আর্চিক ও উত্তরার্চিক

সামবেদ সংহিতা দুটি খণ্ডে বিভক্ত—আর্চিক ও উত্তরার্চিক। ঋক্ ও গানের সংগ্রহের নাম আর্চিক। ইহাকে ছন্দঃ বা পূর্বার্চিকও বলা হয়। এক একটি আর্চিক ছয়টি প্রপাঠকে বিভক্ত এবং প্রতি প্রপাঠক 'দশতি' নামক খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক

প্রপাঠক দশভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক দশতিতে দশটি করিয়া মন্ত্র আছে, এই জন্যই 'দশতি' নাম ; কেবল ষষ্ঠ দশতিতে একটি কম অর্থাৎ নয়টি মন্ত্র আছে। 'দশতি' আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত ; ছন্দঃ, আরণ্যক ও উত্তরা। সামসংহিতার প্রথম অর্থাৎ আর্চিক নামক খণ্ডে ৫৮৫টি ঋক্ বা স্তবক আছে। সেগুলি সামগানযুক্ত এবং বিভিন্ন সুরে যজ্ঞে গীত হয়। পাদবদ্ধ মন্ত্রটি ঋক্ কিন্তু তার পাঠভঙ্গী বা আবৃত্তিশৈলী হইল সামগান। এইজন্য ঋক্‌কে সামের যোনি বলা হয়। 'ঋক সাম্নাং যোনিঃ'।

এই সংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ উত্তরার্চিক নামক খণ্ডে চারিশত সাম আছে এবং প্রতিটি সামে সাধারণতঃ তিনটি করিয়া ঋক্ আছে—এবং প্রত্যেকটি ঋকে ঋগ্‌বেদের তিনটি করিয়া পদ আছে। কতকগুলি ত্রিঋচে বা ঋক্‌ত্রয় সমষ্টিতে দুটি করিয়াও পদ দৃষ্ট হয় ; কয়েকটিতে আবার তিনটিরও বেশী পদ আছে এবং অতি অল্প কয়েকটিতে বারটি পর্য্যন্ত পদের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। উত্তরার্চিকের সামমন্ত্রগুলি প্রধান প্রধান যজ্ঞে গান করা হয়। আর্চিক খণ্ডের মন্ত্রগুলি অংশতঃ ছন্দঃ অনুযায়ী এবং অংশতঃ অগ্নি, ইন্দ্র, সোম দেবতানুযায়ী সাজান কিন্তু উত্তরার্চিকে প্রধান প্রধান যাগের পারম্পর্য অনুযায়ী মন্ত্রগুলি সাজান হইয়াছে,—যথা দশরাত্র, সংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র, প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষুদ্র। আর্চিক ও উত্তরার্চিক উভয়খণ্ডে মূল মন্ত্রগুলি লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু এই সংহিতার প্রাণ-স্বরূপ যে গান তাহা সুপ্রাচীন কাল হইতে মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় প্রকার সঙ্গীত মাধ্যমে সামগান করা হইত, অনুমান করা হয়। হস্ত ও অঙ্গুলী নানা প্রকারে সঞ্চালন করিয়া পুরোহিতগণ বিভিন্ন সুরের ইঙ্গিত দান করেন।

সামগানের চারিটি গ্রন্থ

আর্চিকের সহকারী সামগানের চারিটি গ্রন্থ পাওয়া যায়,—গ্রামগেয় গান, অরণ্যগেয় গান, উহগান ও উহ্য গান। প্রথম দুইটি অন্বর্থ-সংজ্ঞক। গ্রামে যে সকল সাম গান করা হইত তাহার নাম গ্রামগেয় গান এবং যে সকল গান গ্রামে নিষিদ্ধ, অরণ্যে নিভৃতে গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হইত সেগুলির নাম অরণ্যগেয় গান। যজ্ঞে সামগানের যে ক্রম অনুসরণ করিতে হয় সেই ক্রমের (order) নির্দেশ পরবর্ত্তী দুইটিতে 'উহ' ও 'উহ্য' নামক গ্রন্থে আছে ; তন্মধ্যে উহে গ্রামগেয় গানের ক্রম এবং উহ্যে অরণ্যগেয় গানের নির্দেশ আছে। গ্রামগেয় গানকে প্রকৃতিগান, যোনিগান এবং বেদসামও বলা হয়। উহ্য গানের আর একটি নাম রহস্য গান। গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ ও উহ্য এই চারিটি গ্রন্থে যথাক্রমে সতর, ছয়, তেইশ ও ছয়টি করিয়া প্রপাঠক আছে।

ইহার মধ্যে প্রথম তেরটি প্রপাঠকের সকল মন্ত্র অগ্নিদেবতা বিষয়ক, অন্তিম এগারটি প্রপাঠকের মন্ত্ররাজি সোমদেবতানিষ্ঠ এবং মধ্যবর্ত্তী প্রপাঠকগুলির মুখ্য দেবতা ইন্দ্র।

সামবেদই আর্যসঙ্গীতের উৎস। 'সাম' শব্দে সর্বদাই গান বুঝায়। ঋক্‌মন্ত্রে সাতটি স্বর লীলায়িত করিয়া সামগান করা হইত। সামবেদের কালের প্রথম পর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের সাতটি স্বরের মাত্র তিনটি স্বর পাওয়া যায়। কেহ কেহ সেই তিনটি স্বরকে ষড়জ্, ঋষভ ও নিষাদ বলিতে চাহেন, কেহ কেহ ষড়জ্, গান্ধার ও পঞ্চম বলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক সোমনাথ তাঁহার 'রাগবিরোধ' নামক গ্রন্থে সামবেদীয় কালের প্রথমাংশে এই তিনটি স্বরের অস্তিত্ব সমর্থন ও প্রমাণ করিয়াছেন। সামবেদের যুগের অন্তিম পর্বে যে সাতটি স্বরের উদ্ভব হইয়াছিল সে বিষয়ে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ প্রায় সকলেই একমত। রামামাত্য-রচিত 'স্বরমেলকলানিধি' নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থের ভূমিকায় রামস্বামী আয়ার বলিয়াছেন,—

The scale of the Marga music ordinarily ranged from one to four notes, but during the later Saman period, rose to seven notes;'

'মার্গ সঙ্গীতের স্বরের গ্রাম সাধারণতঃ (সামবেদের প্রথম যুগে) একটি হইতে চারটি স্বরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল কিন্তু সামবেদের শেষাংশে তাহা সপ্তস্বরের রূপ ধারণ করে।' এখন সপ্তস্বরকে

সপ্তস্বরের উৎস সামগান

ষড়জ্, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ বা সংক্ষেপে প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষর লইয়া সা (ষা), রি (ঋ), গা, মা, পা, ধা, নি বলা হয়। সামবেদের যুগে এই সপ্তস্বরের নাম ছিল,—ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য। নারদ নামে একটি বৈদিক শিক্ষার (Phonetics) গ্রন্থকার এবং বেদ-ভাষ্যকার সায়ণ সামবেদের সপ্তস্বরকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সাতটি স্বর যখন ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে প্রয়োগ করা হইল তখন তাহাদের ষড়জ হইতে নিষাদ পর্যন্ত সাতটি স্বরের অধুনা প্রচলিত নামকরণ হইল। শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতসুধাকর' ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের অতি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাহার টীকাকার কল্লিনাথ (মল্লিনাথ নহে) এই তথ্য সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি, 'সামানি হি ক্রুষ্ট-প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্দ্রাতিস্বার্যাখ্যাঃ সপ্ত-স্বরাঃ। ইহ তু (মার্গসঙ্গীতে) ত এব যথাযোগং ষড়্‌জাদিব্যপদেশভাজ

ইতি।' 'ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য এই সাতটি সামের স্বর। মার্গ সঙ্গীতে এই সাতটি স্বরই যথাক্রমে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ নাম পাইয়াছে।' মার্গ সঙ্গীত বৈদিক কি না ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ আছে। উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে মার্গসঙ্গীত বৈদিক এবং সামগানের সাতটি স্বর হইতেই মার্গসঙ্গীতের সাতটি স্বর আসিয়াছে। সঙ্গীতসুধাকর রচয়িতা ঋষি শার্ঙ্গদেব এবং ঐ গ্রন্থের টীকাকার কল্লিনাথও এই মত সমর্থন করেন। বর্তমান যুগে ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের ঐতিহাসিক তথ্য বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রামস্বামী আয়ার প্রভৃতিও মার্গসঙ্গীতের বৈদিকত্ব এবং সামগানকে মার্গসঙ্গীতের উৎস বলিয়া স্ফুটকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। রামামাত্যের 'স্বরমেলকলানিধি' নামক সঙ্গীতশাস্ত্রের ভূমিকায় রামস্বামী আয়ার সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন,—

'I venture to call Marga Vedic music',

'আমি মার্গসঙ্গীতকে বৈদিক সঙ্গীত বলিতে চাই।'

সামগানের বিবিধ রীতি প্রচলিত ছিল। সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে বলিয়াছেন 'সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ'। এই সহস্রপথ বা সহস্রশাখা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্বমীমাংসাসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী বলেন, 'সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ' অর্থাৎ সামবেদে সহস্র (অর্থাৎ অসংখ্য) গানের প্রকার। ভারতীয় সঙ্গীতে সামবেদের অবদান সর্ববাদিসম্মত এবং গুরুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। সামগানের কেবল যে যজ্ঞেই প্রয়োগ তাহা নহে, যজ্ঞ ছাড়াও সামগান করা হইত।

ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে সামগান পাঁচভাগে বিভক্ত যথা— হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার এবং নিধান। সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ অনেকে বলেন হিঙ্কার, প্রস্তাব ও উদ্‌গীথ অধুনা প্রচলিত গানের স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের সমতুল্য। নিধান তানের (coda) সূচক। নিম্নলিখিত ঋক্ মন্ত্র সামগানে পরিণত হইলে পাঁচটি বিভাগ কিরূপ হইবে তাহা দেখান হইতেছে।

ঋক্‌সংহিতার একটি মন্ত্র,—

'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানোহব্যদাতয়ে। নিহোতা সংসি বর্হিষি' (৬-১৬-১০)

এই ঋক্ মন্ত্রটি সামবেদ সংহিতার প্রথম মন্ত্র। এই ঋক্‌টি সামগানে রূপায়িত হইলে পাঁচটি বিভাগ এইরূপ হইবে,—

'ওঁ অগ্ন ই' (প্রস্তাব)

'ওঁ আয়াহি বীতয়ে গৃণানোহব্যদাতয়ে' (উদ্গীথ)

'নি হোতা সৎসি বর্হিষি ওঁ (ওম্)' (প্রতিহার)। প্রতিহারটি আবার দুই-ভাগে বিভক্ত, যথা,—

'নিহোতা সৎসিব' (উপদ্রব)

'র্হিষি ওম্ (ওঁ)' (নিধান)

যজুর্বেদ সংহিতা :—

ঋক্ ও সাম ভিন্ন অবশিষ্ট বেদমন্ত্র যজুঃ নামে অভিহিত হইয়াছে। ঋষি জৈমিনি পূর্বমীমাংসাসূত্রে, এই জন্য যজুঃমন্ত্রের লক্ষণ করিয়াছেন, 'শেষে যজুঃশব্দ', ঋক্ ও সাম ভিন্ন যাহা শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট রহিল তাহার নাম যজুঃ। ইহা প্রথম অধ্যায়ে চারি বেদের লক্ষণ আলোচনা কালে আমরা বলিয়া আসিয়াছি। ঋক্ ও সামমন্ত্র সকল ছন্দোবদ্ধ ; তন্মধ্যে ঋক্ মন্ত্ররাজি পদ্যময় এবং সাম মন্ত্রসমূহ পদ্যময় ও গানময়। ঋক্ ও সাম সংহিতায় গদ্য দৃষ্ট হয় না। যজুঃসংহিতায় পদ্যময় ও গদ্যময় উভয় প্রকারের মন্ত্র আমরা পাই। গদ্যের প্রথম আবির্ভাব যজুর্বেদে। সামবেদসংহিতায় মাত্র ৭৫টি মন্ত্রব্যতীত সমস্ত মন্ত্রই ঋক্‌সংহিতার মন্ত্র। কিন্তু যজুঃসংহিতায় কিছু ঋক্‌মন্ত্র থাকিলেও অধিকাংশ মন্ত্রই যজুর্বেদের নিজস্ব মন্ত্র। যজ্ঞে ঋক্‌মন্ত্রে দেবতার আহ্বান করা হয় এবং সামমন্ত্রে দেবতার স্তুতিগান করা হয় ; যজুঃমন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞের সকল কর্ম এবং আহূত ও প্রশংসিত দেবদেবীর উদ্দেশে আহুতি প্রদানাদি করা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকাংশ নিয়ম পদ্ধতি এই বেদে উপনিবদ্ধ। প্রায় সকল যজ্ঞের যাবতীয় প্রক্রিয়া যজুর্বেদে পাওয়া যায়। শ্রৌতযাগের অনুষ্ঠানজন্য যজুর্বেদের জ্ঞান অনিবার্য। বায়ুপুরাণ মতে যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যজুঃসংহিতার নাম যজুঃ হইয়াছে।

যজুঃমন্ত্রের লক্ষণ

যজ্ঞে যজুর্বেদের প্রাধান্য

'যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্বেদে, তেন যজ্ঞমযুঞ্জত।

যাজনাদ্ধি যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ।'

'ঋক্ ও সাম ব্যতীত যাহা যজুর্বেদে অবশিষ্ট রহিল তাহা দ্বারা যজ্ঞের যোজনা হইল। যাজন শব্দ অর্থাৎ যজ্ঞের যজ্ ধাতু হইতেই যজুঃ শব্দ নিষ্পন্ন

হইয়াছে। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।' যজুর্বেদী পুরোহিতের নামও এই জন্য অধ্বর্যু। অধ্বর মানে যজ্ঞ। 'অধ্বরং যুনক্তি ইতি (অধ্বরযুঃ) অধ্বর্যুঃ'। অর্থাৎ যিনি যজ্ঞকে রূপায়িত করেন তিনি অধ্বর্যু। পুরোহিতের বিষয় আলোচনাকালে পরে আমরা ইহা আলোচনা করিব।

যজুর্বেদের দুইটি বিভাগ, কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয়-সংহিতা এবং শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতা। কৃষ্ণযজুর্বেদ শুক্লযজুর্বেদের পূর্ববর্তী। এই কৃষ্ণ শুক্ল বিভাগ দুইটি সম্বন্ধে একটি বিচিত্র উপাখ্যান বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণে কীর্তিত হইয়াছে। প্রথমে সেই আখ্যায়িকা আমরা লিপিবদ্ধ করিব ও তারপর কৃষ্ণ শুক্ল নামের অন্যান্য ব্যাখ্যা উত্থাপন করিব। আখ্যায়িকাটি এইরূপ: বেদ সংহিতার সঙ্কলনকর্তা মহর্ষি বেদব্যাস সমগ্র বেদবিদ্যার বহুল প্রচারের ও রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে তাঁহার প্রধান শিষ্যবৃন্দ পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু ঋষিকে যথাক্রমে ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে বৈশম্পায়ন যজুর্বেদ আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণকে যজুর্বেদবিদ্যা দান করেন। পুরাকালে মেরুপর্বতের শিখরে ঋষিগণের (বর্তমান কুম্ভমেলার ন্যায়) সম্মেলন হইত। ইহা বাধ্যতামূলক ছিল। তাঁহারা একত্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় অধীতবিদ্যার আলোচনা ও বিচার করিতেন। এই মেরু সম্মেলন সম্বন্ধে নিয়ম ছিল,

যজুর্বেদের কৃষ্ণ, শুক্ল ভেদে দুইটি বিভাগ

তৎ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা

'ঋষির্যশ্চ মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি
তস্য বৈ সপ্তরাত্রং তদ্‌ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি' ॥

অর্থাৎ এই মহামেরু শৃঙ্গে ঋষিসম্মেলনে যে ঋষি যোগদান না করিবেন সপ্তাহমধ্যে তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন। একবার ঋষি বৈশম্পায়ন কোনও কারণবশতঃ এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারিলেন না, কিন্তু নিয়ম লঙ্ঘন করায় অবশ্যম্ভাবী ব্রহ্মহত্যা পাতক রোধ করার জন্য তিনি তদীয় শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতে কেহ সক্ষম কিনা জিজ্ঞাসা করেন; প্রতিনিধি হইয়া কেহ তপস্যা করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ নিবারিত হইবে। শিষ্যবর্গ গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া তপস্যায় ব্রতী হয়েন। তন্মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য নামক শিষ্যবর গুরুকে বলেন,—'ভগবন্‌! আপনার এই সকল শিষ্য হীনবিদ্য ও ক্ষীণবীর্য; ইহাদের এমন বিদ্যাবত্তা বা তপঃপ্রভাব নাই যে তাহাদ্বারা আপনার ব্রহ্মহত্যা পাতক নিবারিত হইতে পারে। আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমিই একাকী কঠোর তপস্যাদ্বারা আপনার এই

ভাবী পাঠক বোধ করিতে সক্ষম।' যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ গর্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ও অহঙ্কার দর্শনে গুরু বৈশম্পায়ন জ্বলিয়া উঠিলেন ও যাজ্ঞবল্ক্যকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন—'তোমার ন্যায় গর্বিত ও সতীর্থ-অবজ্ঞাকারী শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই; তুমি এখনই এখান হইতে দূর হও এবং আমার প্রদত্ত সমস্ত বিদ্যা প্রত্যর্পণ কর।' গুরুভক্ত যাজ্ঞবল্ক্যও গুরুর আদেশানুযায়ী তাঁর নিকট অধীত বেদবিদ্যা উদ্‌গীরণ করিয়া ফেলিলেন। অন্যান্য শিষ্যদের গুরু সেই উদ্‌গীর্ণ বিদ্যা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিলেন। মনুষ্য শরীরে উদ্‌গীর্ণ বা বান্ত (বমি) গ্রহণ অনুচিত ও অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধারণ করতঃ যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্‌গীর্ণ বেদবিদ্যা গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের উপাখ্যান

এই শিষ্যগণ কালক্রমে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই গৃহীত বেদবিদ্যার প্রচার করিতে লাগিলেন। উদ্‌গীর্ণ বস্তু সাত্ত্বিক নহে, দূষিত তজ্জন্য এই যজুর্বেদের এই সংহিতাকে কৃষ্ণ বলা হয় এবং তিত্তিরি পাখীর আকারে ঋষিগণ উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তৈত্তিরীয় শাখা বা তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলা হইয়া থাকে। ওদিকে ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ও বেদবিদ্যাহীন হইয়া মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ধর্ম ও ব্রহ্মবিদ্যার আকর ও প্রমাণ বেদ। বেদবিদ্যাব্যতীত ব্রাহ্মণজন্ম নিরর্থক ও পশুজন্ম সদৃশ ঘৃণ্যই। এখন আমি কি উপায়ে কাহার নিকট পুনরায় বেদবিদ্যা লাভ করিব?' এইরূপ বিষাদক্লিষ্ট ও চিন্তানিমগ্ন অবস্থায় সহসা তাঁহার স্মরণপথে এই তত্ত্ব উদিত হইল,—

"ঋগ্‌ভিঃ পূর্বাহ্ণে দিবি দেব ঈয়তে যজুর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ
সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি দেবঃ ॥"

অর্থাৎ এই স্বয়ংজ্যোতি স্বতঃপ্রকাশমান জগৎপ্রসবিতা সূর্যদেব পূর্বাহ্ণে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রসমূহদ্বারা বিভূষিত হইয়া নভোমণ্ডলে উদিত হয়েন; মধ্যাহ্নে যজুর্বেদে অধিষ্ঠান করেন এবং সায়ংকালে সামবেদ দ্বারা পূজিত হন। এই সবিতাদেব কখনও ত্রিবেদশূন্য অবস্থায় থাকেন না; এক এক সন্ধ্যায় এক এক বেদযুক্ত হইয়া প্রকাশ পান। যাজ্ঞবল্ক্য সিদ্ধান্ত করিলেন, 'আমিও এই সূর্যদেবের নিকটেই বেদবিদ্যা শিক্ষা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি—

শুক্ল যজুর্বেদের উপাখ্যান

'নমঃ সবিত্রে দ্বারায় মুক্তেরমিততেজসে।
ঋগ্‌যজুঃ-সামরূপায় ত্রয়ীধামাত্মনে নমঃ।'

ইত্যাদি শ্লোকে আদিত্যদেবের স্তব করিতে করিতে আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্যদেবও তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া বাজীরূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। সূর্য হইতে প্রকাশিত সেই বেদভাগ শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়ি-সংহিতা নামে অভিহিত হইল। "বাজ" অর্থে সূর্যরশ্মি অথবা অন্ন, "সনি" অর্থ ধনসম্পদ্; সূর্যের শুভ্র কিরণ হইতে শ্রেষ্ঠ ধনসম্পদ্‌রূপ যে বেদ প্রকাশ পাইয়াছিল সেই বেদের নাম বাজসনেয়ি সংহিতা বা শুক্ল যজুর্বেদ। অথবা অন্নধন যাঁহার আছে তিনি বাজসনি। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রভূত অন্নধন থাকায় তাঁহার 'বাজসনি' নাম হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহার লব্ধ বা দৃষ্ট যজুর্বেদের নাম 'বাজসনেয়িসংহিতা'। অনুক্রমণীকার কাত্যায়ন ও শুক্লযজুর্বেদের ভাষ্যকার মহীধর এই আখ্যায়িকা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুঃ সংহিতার এই ইতিবৃত্তকে অনেকে উপাখ্যান বলিয়াই মনে করেন। তাঁহারা এই দুই প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ শুক্ল ও কৃষ্ণ নামকরণের নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দেশ করেন। সায়ণাচার্য দুই স্থানে দুই প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য ভূমিকায় তিনি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন,—বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যাদি সকল শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দেন, তন্মধ্যে যাস্ক নামক ঋষি সেই বেদসমূহ তিত্তিরি নামক ঋষিকে শিক্ষা দেন; তিত্তিরি আবার উখ নামক ঋষিকে শিক্ষা দেন, উখ শিক্ষা দেন আত্রেয় ঋষিকে। সেই তিত্তিরি ঋষির পঠিত বলিয়াই তৈত্তিরীয় সংহিতা নাম হইয়াছে। আত্রেয় ঋষি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে আত্রেয়ী শাখাও বলা হইয়া থাকে। উক্ত উখ নামক ঋষি সমগ্র কৃষ্ণ-যজুর্বেদের যে পদ বিভাগ করেন, তাহা এখনও পাওয়া যায়। পাণিনির মতেও তিত্তিরি নামক ঋষির নাম হইতেই তৈত্তিরীয় সংজ্ঞা আসিয়াছে। আত্রেয় শাখার অনুক্রমণিকাতেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ ও শুক্লযজুঃ নামকরণের অন্যান্য ব্যাখ্যা

অন্যত্র আবার সায়ণ অন্যরূপে শুক্ল, কৃষ্ণের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কৃষ্ণ যজুর্বেদে যজুর্বেদীয় পুরোহিত অধ্বর্যু এবং ঋগ্‌বেদীয় পুরোহিত হোতার কর্তব্য একত্রে কথিত হইয়াছে; এইজন্য অনেক সময়ে বুঝিতে অসুবিধা হয়। কোন্‌টি ঋগ্‌বেদীয় পুরোহিতের করণীয়, কোনটি বা যজুর্বেদীয় পুরোহিতের, স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায়—দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে হয়। বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে বলিয়াই ইহাকে 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। শুক্ল যজুর্বেদে কেবল অধ্বর্যুর কর্তব্যের উল্লেখ আছে সুতরাং বুঝিতে

অসুবিধা হয় না। এই বোধসৌকর্য ও নিজের শুদ্ধত্ব বজায় রাখার জন্যই শুক্ল সংজ্ঞা পাইয়াছে।

এই দুইটি ছাড়া তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে এবং সাধারণতঃ এই ব্যাখ্যাই বিদ্বৎসমাজে আদৃত। ঋক্, সাম ও অথর্ববেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের বিভাগ সুস্পষ্ট এবং পরস্পর মিশ্রণ ঘটে নাই কিন্তু কৃষ্ণ যজুর্বেদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা আমরা বলিয়াছি। কৃষ্ণযজুঃ সংহিতার ও তন্নিষ্ঠ তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র সংহিতা ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ রক্ষিত হয় নাই। সংহিতার অনেক অংশ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সংহিতার অনেক অংশ দৃষ্ট হয়। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের সাঙ্কর্য ঘটিয়াছে। এই সাঙ্কর্য বা মিশ্রণ জন্যই 'কৃষ্ণ' নাম হইয়াছে। 'কৃষ্ণ' শব্দটির সংস্কৃতে একটি অর্থ মিশ্রণ। ব্রাহ্মণ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটিয়াছে সংহিতায় এবং সংহিতালক্ষণের বা মন্ত্রলক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটিয়াছে ব্রাহ্মণে। অমিশ্রিত যাহা শুদ্ধ, তাহা শুক্ল; আর যাহা মিশ্রিত তাহা শুদ্ধ নহে, শুক্ল নহে, তাহা কৃষ্ণ।

সায়ণাচার্য কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়সংহিতার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ভট্ট কৌশিক ভাস্করমিশ্র প্রণীত জ্ঞানযজ্ঞ নামক এই সংহিতার আরও একখানি ভাষ্য পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদের কাণ্বশাখার উপর সায়ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বৈদিকাচার্য উবট ও মহীধর নামে দুইজন বিশ্রুতপণ্ডিতও শুক্ল-যজুর্বেদের পৃথক পৃথক দুইটি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

যজুর্বেদের ভাষ্যকার সকল

সায়ণভাষ্য ও ভট্টভাস্করভাষ্যসহ কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার সম্পূর্ণ সংহিতা গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাহা হইতে নির্ণয় হয় যে সমগ্র তৈত্তিরীয় সংহিতায় সাতটি (৭) কাণ্ড, চুয়াল্লিশটি (৪৪) প্রপাঠক বা প্রশ্ন, ছয়শত চুয়াল্লিশটি (৬৪৪) অনুবাক এবং দুই হাজার একশত চুরাশীটি (২১৮৪) কণ্ডিকা বা মন্ত্র সন্নিবদ্ধ আছে। সাধারণতঃ পঞ্চাশটি শব্দে (words) এক-একটি কণ্ডিকা রচিত। চরণব্যূহ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে সমগ্র কৃষ্ণযজুর্বেদে সাতটি কাণ্ড, চুয়াল্লিশটি প্রশ্ন এবং ছয়শত একান্নটি (৬৫১) অনুবাক আছে;—

'কাণ্ডাস্তু সপ্ত বিজ্ঞেয়াঃ প্রশ্নাশ্চাধিক্যকাশ্চতুঃ।
চত্বারিংশত্তু বিজ্ঞেয়া অনুবাকাঃ শতানি ষট্ ॥
একপঞ্চাশদধিকাঃ সংখ্যাঃ পঞ্চাশত্তুচ্যতে।'

সমগ্র যজুর্বেদের মন্ত্রসংখ্যা, মন্ত্রের পদ-সংখ্যা এবং পদের অক্ষর-সংখ্যা এবং এই বেদের গদ্যাত্মক বাক্য-সংখ্যা পর্যন্ত চরণব্যূহ গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

'দ্বিসহস্রঞ্চৈকশতমন্ত্রা নবতি চাধিকা।
লক্ষৈকং তু দ্বিনবতিসহস্রাণি প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
পদানি নবতিশ্চৈব তথৈবাক্ষরমুচ্যতে ॥
লক্ষদ্বয়ং ত্রিপঞ্চাশৎ সহস্রাণি শতাষ্টকম্।
অষ্টষষ্ট্যাধিকং চৈব যজুর্বেদে প্রমাণকম্ ॥'

যজুর্বেদের মন্ত্র, পদ, অক্ষর ও গদ্য বাক্যের সংখ্যা

যজুর্বেদে সর্বসমেত এক হাজার নয়শত (১৯০০) ঋগ্‌বেদের মন্ত্র ও অবশিষ্ট যর্জুমন্ত্র সন্নিবদ্ধ আছে। সেই মন্ত্র সমূহের পদের সংখ্যা এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার নব্বই (১৯২০৯০), এবং অক্ষরের সংখ্যা দুইলক্ষ তিপান্ন হাজার আটশত আটষট্টি (২৫৩৮৬৮)। বাক্যের সংখ্যা উনিশ হাজার চারিশত অষ্টআশী (১৯৪৮৮)। এই পরিগণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে যজুর্বেদেও কোন মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতা সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি কাণ্ড কয়েকটি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রপাঠকের আর একটি নাম প্রশ্ন। প্রত্যেকটি প্রপাঠক বা প্রশ্ন আবার কতিপয় অনুবাকে এবং প্রতি অনুবাক কতকগুলি করিয়া মন্ত্রে বিভক্ত। এই সংহিতার প্রথম হইতেই দর্শপূর্ণমাস নামক

কৃষ্ণ যজুঃ সংহিতার বিভাগ ও বিষয়

ইষ্টির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দর্শপূর্ণমাস অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা। সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গমকে দর্শ বলে ; 'দর্শঃ সূর্যেন্দুসঙ্গমঃ', তাহার অর্থ অমাবস্যা। অমাবস্যা বা আমাবস্যা উভয় শব্দই শুদ্ধ। পৌর্ণমাসীর অর্থ পূর্ণিমা। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতিথিতে যে ইষ্টি (এক প্রকার যাগ) করিতে হয় তাহার নাম দর্শ-পূর্ণমাস। ইষ্টিজাতীয় যাগের প্রধান বা প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস। এই ইষ্টি প্রধানতঃ তিন প্রকার মন্ত্রদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় ;—(১) আধ্বর্যব মন্ত্র, (২) যাজমান মন্ত্র এবং (৩) হৌত্রমন্ত্র। আধ্বর্যব মন্ত্র অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকের (পুরোহিতের) পাঠ্য, যাজমান মন্ত্র যজমানের পাঠ্য এবং হৌত্রমন্ত্র অর্থাৎ হোতানামক ঋত্বিকের পাঠ্য মন্ত্র হোমকালে পাঠ্য। কৃষ্ণ যজুঃ সংহিতার প্রারম্ভে 'ইষে ত্বা' মন্ত্র পুরঃসর প্রপাঠকে পঠিত মন্ত্রসমূহ আধ্বর্যব মন্ত্র নামে অভিহিত। 'স্বন্তা সিঞ্চামি' ইত্যাদি প্রপাঠকে পঠিত মন্ত্ররাজি যাজমান মন্ত্র এবং 'সত্যং প্রপদ্যে' ইত্যাদি প্রপাঠকের মন্ত্র সকল হোমকালে পঠিত

হয় বলিয়া হৌত্রমন্ত্র নামে অভিহিত। তন্মধ্যে আধ্বর্যব মন্ত্রসমূহ তেরটি অনুবাকে উপনিবদ্ধ। এই সংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয় সকল 'কাণ্ডানুক্রমণিকা' নামক প্রাচীন গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দিষ্ট দেবতাগণের নামানুসারে সেই গ্রন্থে কাণ্ডগুলির বিভাগ দৃষ্ট হয়। পৃথক পৃথক কর্মের চুয়াল্লিশ প্রকার ভাগ বা কাণ্ডের নাম উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রজাপতি-দেবের নয় কাণ্ড, সোমদেবের নয় কাণ্ড, অগ্নির সাতকাণ্ড, বিশ্বদেব গণের ষোলকাণ্ড, এবং 'শংনোমিত্রঃ শংবরুণঃ' ইত্যাদি সাংহিতী উপনিষদ্ নামক ঋষিকাণ্ড, 'অন্তস্য পারে' ইত্যাদি যাজ্ঞিকী উপনিষদ্‌নামক যাজ্ঞিক কাণ্ড, এবং 'ওঁ সহনাববতু সহনৌভুনক্তু' ইত্যাদি বারুণী উপনিষদ্ নামক যাজ্ঞিক কাণ্ড ; সর্বসমেত এই চুয়াল্লিশ (৪৪) কাণ্ড আছে।

শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতা চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় কতিপয় অনুবাকে এবং প্রতি অনুবাক কতকগুলি কণ্ডিকায় বিভক্ত। সর্বসমেত এই সংহিতায় চল্লিশটি অধ্যায়, তিনশত তিনটি (৩০৩) অনুবাক এবং এক হাজার নয়শত পনরটি (১৯১৫) কণ্ডিকা আছে। এই সংহিতার চল্লিশটি অধ্যায়ের মুখ্যবিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। প্রথম অধ্যায়ে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের কথা এবং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের বিষয় উক্ত হইয়াছে ; তদানীন্তন এই পিণ্ডপিতৃযজ্ঞই ইদানীন্তন পিতৃশ্রাদ্ধাদিরূপে পরিণত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্নিহোত্রযজ্ঞ অর্থাৎ অগ্ন্যাধান ও অগ্নিউপাসনা এবং প্রাতে ও সায়ংকালে অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্র হোমের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। চাতুর্মাস্যাদি যাগের বিবরণ এবং মন্ত্র-নিচয়ও তৃতীয় অধ্যায়ে নিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণের নিত্য অনুষ্ঠেয় এই অগ্নিহোত্র হোমের বিবরণ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ সাবিত্রী বা গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ আছে। (ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের বাষট্টিতম সূক্তের দশম মন্ত্রটি এই প্রসিদ্ধ সাবিত্রী মন্ত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র) গায়ত্রীছন্দে রচিত বলিয়া দ্বিজাতির ত্রিসন্ধ্যায় নিত্য-পাঠ্য সাবিত্রীমন্ত্রের একটি নাম গায়ত্রীমন্ত্র। চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত সোমযাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম বা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিধান সন্নিবিষ্ট। নবম অধ্যায়ে রাজসূয়যজ্ঞ, দশম অধ্যায়ে সৌত্রামনী যাগ এবং একাদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় অবধি অগ্নিচয়নের বিধিবিধান বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। বৈদিক যুগে প্রতি দ্বিজাতির গৃহে সংরক্ষিত অনির্বাণ গার্হপত্য অগ্নি হইতে অগ্নির উল্মুক জ্বালাইয়া লইয়া যজ্ঞস্থলে লইয়া গিয়া যজ্ঞের আহবনীয়, মার্জালীয়, দাক্ষিণ প্রভৃতি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে

শুক্ল যজুঃ সংহিতার বিভাগ ও বিষয়

হইত। গার্হপত্য অগ্নি হইতে এই অগ্নি আনয়নের নাম অগ্নিচয়ন। ঊনবিংশ অধ্যায় হইতে পঞ্চবিংশতম অধ্যায় পর্যন্ত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিধান, প্রয়োজন, বিধিব্যবস্থাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ষড়বিংশ অধ্যায় হইতে ঊনচল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত চৌদ্দটি অধ্যায়ে পূর্বোক্ত যজ্ঞাদির অবশিষ্ট বিশেষ বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়; তদ্‌ব্যতীত পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও পিতৃমেধ যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণও আছে। এই সংহিতার শেষ অর্থাৎ চত্বারিংশৎ (চল্লিশ) অধ্যায়টি হইল প্রসিদ্ধ ঈশোপনিষদ্। মন্ত্রের অঙ্গীভূত বলিয়া এই উপনিষদ্‌টিই একমাত্র মন্ত্রোপনিষদ্।

বৈদিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে শুক্লযজুর্বেদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার গুরুত্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল দেশের বিদ্বৎ-মণ্ডলী স্বীকার করিয়াছেন। তদানীন্তন চতুর্বর্ণ, প্রতিলোম ও অনুলোম বর্ণ, জাতিভেদ, অন্ত্যজ ও অনার্য জাতির নাম, জীবিকানির্বাহার্থ বিবিধ বৃত্তি ও কুটীর শিল্প, আদিবাসিগণের ধর্ম, শৈবধর্মের মূল, রুদ্র-শিব-তত্ত্ব প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় সন্দেশ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সংহিতায় পাওয়া যায়। বাজসনেয় সংহিতার ত্রিংশ অধ্যায়ে পুরুষমেধ যজ্ঞের রূপক বা কাল্পনিক (Symbolic offering) আহুতি প্রসঙ্গে কমপক্ষে আটান্ন (৫৮) প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা জীবিকার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং তন্মধ্যে সাতটি বৃত্তি কেবল স্ত্রীজাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ন্যূনকল্পে দুই হাজার খ্রীষ্ট পূর্বকালে (2000 B. C.) ভারতবর্ষে এইরূপ উন্নত সমাজ, জীবনযাত্রাব্যবস্থা ও এতগুলি বৃত্তি ও কুটীরশিল্প ছিল, ইহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতে হয়। এক শুক্লযজুর্বেদ ছাড়া অন্য কোনও বেদে এতগুলি বৃত্তি বা শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই তথ্য গভীর বিস্ময় ও কৌতুহলোদ্দীপক এবং গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমরা বৃত্তিগুলির তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি। বন্ধনীমধ্যে মূল সংস্কৃত শব্দগুলি প্রদত্ত হইল।

ঐতিহাসিক তথ্যে শুক্ল যজুঃ সংহিতার গুরুত্ব

চারণ (সূত), রাজসভায় পুরাকীর্ত্তিগায়ক (মগধ), অভিনেতা (শৈলূষ), মন্ত্রণাদাতা (সভাকর), রথনির্মাতা (রথকার), ছুতোর মিস্ত্রী (তক্ষা), কুমোর (কুলাল), কামার (কর্মার), মণিকার (মনিকার), নাপিত (বপ), তীর নির্মাতা (ইষুকার), ধনুঃনির্মাতা (ধনুষ্কর), ধনুকের গুণ বা জ্যা নির্মাতা (জ্যাকর), রজ্জু নির্মাতা (রজ্জু সর্জ). শিকারী (মৃগয়ু), কুকুর পালক (শ্বনিন্), পাখীধরা ব্যাধ (পুঞ্জিষ্ঠ), বৈদ্য (ভিষজ), জ্যোতিষী (নক্ষত্রদর্শ), হস্তিপালক (হস্তিপ), অশ্বপালক (অশ্বপ), গোপাল (গোপাল), মেষপালক

(অবিপাল), ছাগপালক (অজপাল), কৃষক বা কর্ষক (কীনাশ), সুরানির্মাতা (সুরাকার), গৃহরক্ষক (গৃহপ), রথের সারথি (ক্ষত্তা), সহকারী রথচালক (অনুক্ষত্তা), কাষ্ঠসংগ্রহকারী (দার্বাহার), প্রতিমানির্মাতা (পেশিতা), গোয়েন্দা (পিশুন), দ্বারপাল, সহকারী দ্বারপাল, অশ্বারোহী (অশ্বসাদ), কর আদায়কারী (ভাগহর), চামার (চর্মার), অজিন বা চর্মবস্ত্রনির্মাতা (অজিনসন্ধ), ধীবর (ধীবর), শুষ্ক মৎস্য বিক্রেতা (পৌঙ্কল), স্বর্ণকার (হিরণ্যকার), বণিক্ (বণিজ), বনরক্ষক (বনপ), বীণাবাদক (বীণাবাদ), বংশীবাদক (তূণবধ্ম), শঙ্খবাদক (শঙ্খধ্ম), Acrobat (বংশনর্ত্তিন্) গ্রামের মোড়ল (গ্রামনী), কোষ্ঠী-বিচারক (গণক), সরকারী ঘোষক (অভিক্রোশক)। এইগুলি পুরুষদের বৃত্তিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকের কতিপয় বৃত্তির উল্লেখ আছে এই সঙ্গে যথা,—টুকরী প্রস্তুতকারিণী (বিদলকরী), কাঁটার বিবিধ দ্রব্য নির্মাত্রী (কণ্টকীকরী), বস্ত্রের অলঙ্করণ বা কাপড়ের উপর ফুলতোলা প্রভৃতি Embroidery কাজ যাঁহারা করিতেন (পেশস্করী), ধুপী (বাস পল্পূলী), বস্ত্ররঞ্জনকারিনী (রজয়িত্রী), কাজল ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতকারিণী (অঞ্জনকরী), তরোয়ালের খাপ নির্মাত্রী (কোষকরী)।

রুদ্র-শিব-ধর্ম বা শৈবধর্মের উৎপত্তি ও প্রসারের ইতিহাসে শুক্লযজুর্বেদের অবদান ও গুরুত্ব বেদবিদ্যার সেবক সকল পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এই সংহিতার ষোড়শ অধ্যায়টি রুদ্রাধ্যায় নামে অভিহিত। শুক্লযজুর্বেদী ব্রাহ্মণগণ ইহা নিত্য পাঠ করেন। নেপালে এই রুদ্রাধ্যায়ের এত প্রভাব ও প্রসার যে যোশী বা উপাধ্যায় বংশের প্রায় সকল নেপালী বালক যাহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে জীবিকা অর্জনের জন্য আগমন করে তাহাদের বাজসনেয় সংহিতার রুদ্রাধ্যায় কণ্ঠস্থ থাকে; ইহা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছি। রুদ্র অর্থাৎ ভীষণ, ভয়ংকর। অন্তিমকালে যিনি সকলকে রোদন করান তিনি রুদ্র; আবার জন্মক্ষণে যিনি নিজেও বিকট রোদন করেন ও সারা বিশ্বকে সেই কর্ণভেদী শব্দে প্রকম্পিত করেন তিনি রুদ্র। ঋগ্‌বেদের রুদ্র রুদ্ররূপেই অর্থাৎ ভীষণরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেবতার বাহ্য প্রতীক এক একটি প্রাকৃতিক বস্তু বা উপসর্গ। এই বিষয়ে আমরা দেবতাতত্ত্ব অনুশীলনকালে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। রুদ্রদেবতার বাহ্য রূপ বা প্রতীক হইতেছে বজ্র। ঝড়, বিদ্যুৎ, মেঘ, বজ্র প্রভৃতি কয়েকটি উপসর্গ এক এক দেবতার বাহ্য রূপ বা প্রতীক। এক একজন

দেবতা দৃশ্য প্রপঞ্চের এক একটি পদার্থের বা উপসর্গের অধিষ্ঠাত্রী।

রুদ্র শিব ধর্ম

ঝড়ের অধিষ্ঠাত্রী বা অভিমানী দেবতা মরুৎ, বিদ্যুতের অপাংনপাৎ, মেঘের পর্জ্জন্য এবং বজ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র। বজ্র যখনই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চলিত ভাষায় যখনই বাজ পড়ে তাহার ভীষণ নির্ঘোষে ভূলোক দ্যুলোক বিশ্বচরাচর প্রকম্পিত ও ত্রস্ত হয়। এই তত্ত্ব রূপকের ভাষায় বলা হয় রুদ্র জন্মিয়াই কর্ণভেদী বিকট চিৎকার করেন। বজ্রের সঙ্গে ভীষণত্বের, সংহারের ও শব্দের সম্বন্ধ চিরন্তন; তজ্জন্য তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র ভীষণ, সংহারক ও গর্জ্জনশীল। ঋগ্‌বেদের রুদ্র সূক্তগুলিতে সর্বদাই এই ভীষণ সংহার মূর্ত্তি প্রকটিত; কল্যাণ বা শিবরূপ তাহাতে আমরা পাই না কিন্তু শুক্লযজুঃ সংহিতার বিশ্রুত রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্র কেবল ভীষণ নহেন, কেবল সংহারক নহেন, তিনি যুগপৎ শিব, শংকর, শম্ভু। তজ্জন্য ঋষি তাঁহাকে যেমন উগ্র, ভীম, ঘোর, বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তেমনই আবার ঐ একই অধ্যায়ে তাঁহাকে শংকর, শম্ভব, ময়োভব, শিব, শিবতরও বলিয়াছেন। রুদ্রাধ্যায়ের একটি মন্ত্রে রুদ্রকে 'নমঃ উগ্রায় চ ভীমায় চ' (১৬-৪০) সম্বোধনে প্রণাম করিয়াছেন। উগ্র, ভীম—উভয় শব্দই ভীষণত্ববোধক। কিন্তু ঠিক পরবর্তী মন্ত্রেই (১৬-৪১) সমস্ত মঙ্গলবাচক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া রুদ্রকে প্রণতি জানাইতেছেন,

'নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥'

শম্ভব, ময়োভব শংকর, ময়স্কর, শিব—প্রতিটি শব্দের একই অর্থ, মঙ্গল, কল্যাণ, কল্যাণজনিত সুখ। শুধু শিব নয়, 'শিবতর'ও বলিয়াছেন অর্থাৎ অধিকতর মঙ্গলদায়ক কল্যাণজনক। যিনি উগ্র, ভীম, ঘোর তিনিই আবার শংকর, শম্ভু, ময়োভব। যিনি রুদ্র তিনিই শিব। দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত লক্ষণের যুগপৎ সমাবেশ ও সমন্বয় হইয়াছে শুক্ল যজুর্বেদের রুদ্র শিবে। রুদ্র কেবল দ্বিজাতির বা আর্যগণের দেবতা নহেন, তিনি অনার্য জাতির, অন্ত্যজ জাতিরও দেবতা। এই সূত্রে অনেকগুলি অনার্যজাতি ও অন্ত্যজ নীচ বর্ণের উল্লেখ রুদ্রাধ্যায়ে আমরা পাই; ঐতিহাসিক তথ্যের দিক হইতে এই অধ্যায়টি এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ। রুদ্র সকলকে রক্ষা করেন, কেবল উচ্চবর্ণকে নহে তিনি কাঠের মিস্ত্রী (তক্ষা)

রথনির্মাতা (রথকার), কুমোর (কুলাল), কামার (কর্মার), নিষাদ, পক্ষিমাংস বিক্রয়ী পুঞ্জসাদি জাতি (পুঞ্জিষ্ঠ), যাযাবর বেদে জাতি যাহারা সর্বদা কুক্কুর লইয়া ভ্রমণ করে (শ্বনি), ব্যাধ (মৃগয়ু), কুকুর পালক (শ্বপতি), প্রভৃতিরও দেবতা ও পালক (১৬-২৭, ২৮) এমন কি তিনি গো, অশ্ব, কুকুরেরও পতি অর্থাৎ পালক। আবার, রুদ্র কেবল সাধু সজ্জনদের পালক নহেন, তিনি অসাধু, চোর, দস্যু প্রভৃতিরও পালক। এই অসাধুগোষ্ঠীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে সকল অপরাধের উল্লেখ আমরা রুদ্রাধ্যায়ে পাই, বৈদিক যুগের নানা প্রকারের অপরাধের ও অপরাধীর যে উল্লেখ আমরা রুদ্রাধ্যায়ে পাই তাহা অপরাধতত্ত্বের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিবে। এই প্রসঙ্গে চোর, গাঁটকাটা, সিঁদেল চোর, সশস্ত্র চোর, সশস্ত্র দস্যু, নিশাচর দস্যু, মনুষ্যঘাতক দস্যু, উষ্ণীষধারী দস্যু (পাগড়ী পরা ডাকাত), যে সকল দস্যু পর্বতে বাস করে (পার্বত্য জাতির দস্যু), ধনুর্বাণধারী দস্যু বা তীরন্দাজ ডাকাত, শস্যাদি অপহরণকারী প্রভৃতির নাম আমরা পাই (১৬-২১, ২১)। অতএব দেখা যাইতেছে রুদ্রের মধ্যে বহু বিপরীতের একাধারে সমাবেশ হইয়াছে। তিনি যুগপৎ উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণ, আর্য ও অনার্য, সাধু ও অসাধু সকলেরই উপাস্য ও পালক ; একাধারে তিনি উগ্র ও ও শান্ত, ভীম ও শম্ভু, ভয়ংকর ও শংকর, রুদ্র ও শিব, সংহারক ও পালক। এই সংহিতায় রুদ্র সগুণ দেবতার লক্ষণ অতিক্রম করিয়া প্রায় নির্গুণ পরমেশ্বরে রূপায়িত হইয়াছেন যেখানে সকল বিরোধের অবসান, সকল দ্বন্দ্বের ঐক্যে সমাবেশ, সকল বৈপরীত্যের সমন্বয় (the great synthesis of all theses and antitheses)।

রুদ্রাধ্যায়ে এতগুলি অনার্যজাতি, দস্যু, পার্বত্যজাতি, অন্ত্যজ জাতির উপাস্য ও পালক রূপে রুদ্রের উল্লেখ থাকায় অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন প্রথমে রুদ্র অনার্য আদিবাসিগণের উপাস্য দেবতা ছিলেন ; পরবর্তিকালে আর্যগণ তাহাদের নিকট হইতে এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া নতুনরূপ দিয়াছেন।

কাব্য হিসাবেও শুক্ল যজুঃসংহিতা অপূর্ব। রুদ্রাধ্যায় হইতেই বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই অধ্যায়ে রুদ্রের পশুপতি, শম্ভু, শিব, শংকর, কৃত্তিবাস, গিরিশ, শিতিকণ্ঠ, নীলগ্রীব, কপর্দী প্রভৃতি নাম উক্ত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের রুদ্র কেবল বজ্রের দেবতা কিন্তু যজুর্বেদে 'কেবল বজ্র নয়' সূর্যের সহিতও রুদ্রের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সূর্যেরই একটি রূপ রুদ্র এবং সূর্যের উদয় বা অস্তকালীন ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুযায়ী রুদ্রের এক একটি

নাম হইয়াছে। উদয় ও অস্তের সময় সূর্যের সহস্র সহস্র রশ্মি বা কিরণ সুস্পষ্ট প্রতীত হয়; ঋষি কল্পনা করিতেছেন, সূর্যের বিম্বটি মস্তকসদৃশ এবং তার চতুর্দিকে প্রসারিত কিরণমালা দীর্ঘ জটাসদৃশ। জটার একটি প্রতিশব্দ কপর্দ; যাঁর জটা আছে তিনি কপর্দী। এই জন্য সূর্যের সহিত একাত্ম রুদ্রের একটি নাম কপর্দী। এই সুন্দর কবিকল্পনা রুদ্রাধ্যায়ের ষষ্ঠ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। তৎপরবর্ত্তী অর্থাৎ সপ্তম মন্ত্রটিতে অপূর্ব কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। রুদ্রের নীলকণ্ঠ নামটি অস্তগামী সূর্যের রূপ হইতে আসিয়াছে। আদিত্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করেন তখন গগনমণ্ডল রঙ্গের মহোৎসবে মাতিয়া উঠে। স্বর্ণবর্ণ সূর্যবিম্বের চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত গাঢ় সিন্দূরবর্ণে পশ্চিম গগন রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয়, কেবল সূর্যবিম্বের মধ্যস্থলে নীল বর্ণের রেখা দৃষ্ট হয়। মধ্যস্থল কণ্ঠদেশ সদৃশ; তথায় নীল রং থাকে বলিয়া তদবস্থায় সূর্যের এক নাম নীলকণ্ঠ বা নীলগ্রীব। সূর্যের সহিত অভিন্ন রুদ্রের নামও তজ্জন্য নীলকণ্ঠ। সপ্তম মন্ত্রে ঋষি গাহিতেছেন,—

'অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ।

উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্নুদহার্যঃ, স দৃষ্টো মৃড়য়তি নঃ॥'

'ঐ যে নীলকণ্ঠ রক্তিমবর্ণ সূর্যরূপী রুদ্রদেব গগনপটে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, তাঁহার অপরূপ রূপে আকৃষ্ট হইয়া গোধূলি লগ্নে মাঠ হইতে গরুর পাল লইয়া গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন কালে মুগ্ধ হইয়া গোপালেরা তাঁহাকে দর্শন করে। গ্রামের ললনাবৃন্দ সায়ং কালে সরোবরে জল লইতে আসিয়া মুগ্ধ হইয়া রুদ্রের এই অতুলনীয় রূপ দেখিতে থাকে।' এই সকল মন্ত্র কাব্যরসে সমৃদ্ধ, কবিকল্পনায় মহীয়ান, ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়। সুদূর

শুক্ল যজুঃ-সংহিতার কাব্যত্ব

অতীতে যে কল্পনাশক্তিবলে সূর্য্যের কিরণমালা হইতে রুদ্রের কপর্দী নাম এবং অস্তাচলগামী ভানুর দিগন্ত-প্রসারী রক্তিমচ্ছটামধ্যে সূর্যবিম্বের ক্ষীণ নীলবর্ণ হইতে রুদ্রের নীলকণ্ঠ নামকরণ সম্ভব হইয়াছিল সেই অপূর্ব অপরূপ কল্পনার শতমুখে প্রশংসা কাব্যরসিক সকল সুধীই করিতে বাধ্য।

যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়শাখার অর্থাৎ কৃষ্ণযজুর্বেদের পঠন, পাঠন, প্রচলন দাক্ষিণাত্যে দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কৃষ্ণযজুর্বেদী। শুক্ল যজুর্বেদের পঠন, পাঠন ও প্রচলন আর্যাবর্ত্তেই অধিক। ইহার কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামে দুইটি শাখা প্রথম বিদেহে প্রচারিত হয় এবং বিদেহ হইতে ক্রমশঃ উহা উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ শুক্লযজুর্বেদের কাণ্বশাখা গোষ্ঠীর।

অথর্ব বেদ

প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা 'ত্রয়ী' বা তিন বেদের প্রসঙ্গে অথর্ববেদের মন্ত্রত্ব ও বেদত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই বেদের প্রাচীন নাম 'অথর্বাঙ্গিরস'। অথর্ব ও আঙ্গিরস দুটি শব্দের যোগে অথর্বাঙ্গিরস নামটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুটি শব্দে অথর্ববেদের দুটি বিভাগ বুঝায়। অথর্ব বলিতে (ভেষজানি) ভেষজ্যবিদ্যা এবং শান্তি পৌষ্টিক প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়া বুঝায় এবং 'আঙ্গিরস' শব্দে শত্রুবধাদিকারক মারণ ও উচাটনমূলক অমঙ্গল অভিচার-ক্রিয়াবোধ্য। অথর্ববেদের মঙ্গল এবং অমঙ্গলজনক দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ অংশ গোপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। অথর্বসংহিতার ভৃগ্বাঙ্গিরস (ভৃগু+আঙ্গিরস) এবং ব্রহ্মবেদ নামেও দুটি নাম আছে। রথ (Roth), হুইটনী (Whitney) প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল হইতে অনেক অংশ এই বেদে গৃহীত হইয়াছে। রথ বলেন এক তৃতীয়াংশ কিন্তু হুইটনীর মতে দশভাগের ছয় ভাগ গৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর ভিন্টারনিৎসের মতে এই সংহিতার দশভাগের সাত ভাগ ঋক্‌মন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে 'ত্রয়ীবিদ্যার' আলোচনা কালে 'অথর্ব' শব্দটির ঐতিহ্য প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে বেদের 'অথর্বন্' নামক পুরোহিতই জরথুশ্‌ত্র ধর্মের বেদকল্প 'জন্দ্ আবস্তা' গ্রন্থের 'অথ্রবন্' পুরোহিত। পুরোহিতকে জন্দ্‌ভাষায় 'পরাধাত' বলে। অর্থ একই। অথর্ব শব্দটি সর্বপ্রথম অগ্নির পুরোহিত (fire priest) বুঝাইত। আবস্তায় অথ্রবন্ বলিতে অগ্নিসংরক্ষক পুরোহিত বুঝায়। প্রাচীন পারসিকগণের ন্যায় পুরাকালে ভারতীয় আর্যগণ অনির্বাণ অগ্নি রক্ষা করিতেন। প্রতি দ্বিজের গৃহে তজ্জন্য একটি পবিত্র কক্ষ নির্দিষ্ট থাকিত। পরবর্তী কালে এই কক্ষকে 'অগ্নিশরণ' বলা হইত। এই অনির্বাণ অগ্নিই পরে 'গার্হপত্য অগ্নি'তে রূপায়িত হয়। সুপ্রাচীনকালে এই অগ্নিপুরোহিত ভারতীয় অথর্বনকে ও জরথুশ্‌ত্রীয় অথ্রবনকে ইন্দ্রজালবিদ্যাপারদর্শী (magic-priest) বলিয়া লোকে মনে করিত এবং রিষ্টি শান্তি, ব্যাধিনিরাময়, অনাবৃষ্টি নিবারণ, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্মে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিত। এইরূপে এই শব্দ দুটি মঙ্গলপ্রসূ ইন্দ্রজাল বিদ্যা বোধক (holy spell, benignant magic) হইয়া পড়ে এবং তাহার বিপরীত শত্রুবধ, মারণ, উচাটনাদি অমঙ্গলপ্রসূ অভিচারাদি

ক্রিয়াকলাপকে আঙ্গিরস শব্দে অভিহিত করা হইত (Black magic)। এই শুভজনক অথর্বন্ এবং অশুভজনক আঙ্গিরস উভয় বিদ্যাই যে বেদে আছে সংক্ষেপে তাহাকে অথর্ববেদ বলা হইত। এই পরস্পরবিরুদ্ধ শুভাশুভ বিদ্যাজন্য অথর্ববেদে উভয়প্রকার মন্ত্র দৃষ্ট হয়। এই বেদে যেমন মাঙ্গলিক ও রিষ্টিশান্তিসূচক মন্ত্র আছে তেমনই আবার অমঙ্গলজনক অভিশাপ ও অভিচার মন্ত্রও আছে।

এই সংহিতা কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত, প্রতিটি কাণ্ড কয়েকটি প্রপাঠকে, প্রতি প্রপাঠক কয়েকটি করিয়া অনুবাকে, প্রতি অনুবাক কতিপয় সূক্তে বা পর্য্যায়ে এবং প্রতি পর্য্যায় কতিপয় মন্ত্রে বিভক্ত। সর্বসমেত কুড়িটি কণ্ডিকা, আটত্রিশটি প্রপাঠক, নব্বইটি অনুবাক, সাতশত একত্রিশটি (৭৩১) সূক্ত বা পর্যায় এবং প্রায় ছয় হাজার মন্ত্র অথর্ববেদে আছে। পদ্য এবং গদ্য উভয়রূপ মন্ত্রই দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে পদ্যেরই আধিক্য এবং ছয়ভাগের একভাগ গদ্যে নিবদ্ধ। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ কাণ্ড গদ্যে রচিত। পদ্যাত্মক মন্ত্রে ঋক্ মন্ত্রের লক্ষণ এবং গদ্যে নিবদ্ধ মন্ত্রে যজুঃ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অথর্বসংহিতার বিভাগ

বিষ্ণুপুরাণমতে (৩।৬) ব্যাসদেবের শিষ্য সুমন্তুর নিকট কবন্ধ অথর্ববেদ শিক্ষা করেন। কবন্ধ তাঁর দুই শিষ্য দেবদর্শ ও পথ্যকে বিদ্যাদান করেন। দেবদর্শের চারিজন শিষ্য ছিল,—মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্কায়নি ও পিপ্পলাদ। পথ্যের প্রধান শিষ্য ছিল তিনজন—জাজলি, কুমুদ ও শৌনক। দেবদর্শ এবং পথ্য তদীয় শিষ্যবর্গকে অথর্ববেদ শিক্ষা দেন। শৌনকেরও আবার বভ্রু এবং সৈন্ধবায়ন নামে দুই শিষ্য ছিল; বভ্রুর শিষ্যের নাম মুঞ্জদেশ এবং সৈন্ধবায়নের শিষ্যের নাম সৈন্ধবগণ। বভ্রু ও সৈন্ধবায়ন তদীয় স্বীয় স্বীয় শিষ্যকে এই বিদ্যা দান করেন। এই পুরাণের মতে অথর্ববেদের পাঁচটি খণ্ড, যথা,—নক্ষত্রকল্প, বৈতানককল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প, এবং শান্তিকল্প। নক্ষত্রকল্পে নক্ষত্রাদি পূজাবিধি, বেদকল্পে বৈতালিক ব্রহ্মত্বাদি-বিবরণ, শান্তিকল্পে অষ্টাদশ মহাশান্তিবিধি, আঙ্গিরসকল্পে অভিচারাদিবিধি লিপিবদ্ধ আছে।

এই সংহিতার শৌনকশাখা সুরক্ষিত এবং তাহার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পিপ্পলাদ শাখার মাত্র একটি পাণ্ডুলিপি দৃষ্ট হয়, তাহাও অসম্পূর্ণ। রথ (Roth) ও হুইটনী (Whitney) শৌণকশাখা প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার বুলার (Buhler) কাশ্মীরে পিপ্পলাদ শাখার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। আমেরিকায় স্বনামধন্য বেদবিদ্যায় পারদর্শী

পণ্ডিত ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) এবং গারবে (Garbe) পিপ্পলাদ শাখা "The Kashmirian Atharva Veda" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপির অবিকল প্রতিলিপি (facsimile) দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ পিপ্পলাদ শাখার সংহিতাটিতে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। পিপ্পলাদ শাখা কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল এবং তথায় এই শাখার ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে ইহাই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সুধীবৃন্দের ধারণা ছিল; কাশ্মীরে এখনো এই শাখাবলম্বী ব্রাহ্মণগোষ্ঠী আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বেদের গবেষণানিরত পণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য অকস্মাৎ উড়িস্যার একটি গ্রামে এই শাখার ব্রাহ্মণ আবিষ্কার করেন এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিত অথর্বমন্ত্র ধ্বনিধারক যন্ত্রের (Tape recording machine) সাহায্যে ধ্বনিবদ্ধ করেন।

অথর্ববেদের নয়টি শাখার মধ্যে অধুনা শৌনক ও পিপ্পলাদ দুইটি শাখা মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

অথর্ব সংহিতার বিভাগে একটি বিশেষ নীতি অনুসৃত হইয়াছে। কুড়িটি কাণ্ডের মধ্যে প্রথম আঠারটি কাণ্ডে এই নীতি বা ধারা সুস্পষ্ট। প্রথম সাতটি কাণ্ডে অসংখ্য স্বল্পপরিসর সূক্ত নিবদ্ধ আছে। সাধারণতঃ প্রথম কাণ্ডের সূক্তে চারিটি করিয়া মন্ত্র বা স্তবক আছে, দ্বিতীয় কাণ্ডের সূক্তরাজিতে প্রতি সূক্তে পাঁচটি করিয়া মন্ত্র আছে, তৃতীয় কাণ্ডে প্রতি সূক্তে ছয়টি করিয়া এবং চতুর্থ কাণ্ডে-সাতটি করিয়া মন্ত্র (ঋক্, verse) আছে। পঞ্চম কাণ্ডে সূক্তপ্রতি সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক মন্ত্র আটটি এবং সর্বাধিক সংখ্যা আঠারটি (১৮) পাওয়া যায়। ষষ্ঠ কাণ্ডে একশত বিয়াল্লিশটি সূক্ত আছে এবং অধিকাংশ সূক্তে তিনটি করিয়া মন্ত্র আছে। সপ্তম কাণ্ডে এক শত আঠারটি সূক্তের অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি বা দুইটি করিয়া মন্ত্র দৃষ্ট হয়। অষ্টম হইতে চতুর্দশ কাণ্ড পর্যন্ত এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ কাণ্ডের সূক্তগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ। তন্মধ্যে অষ্টম কাণ্ডের প্রথম সূক্তটি সর্বাপেক্ষা কমসংখ্যক মন্ত্রে (একুশটি মন্ত্রে) রচিত এবং অষ্টাদশ কাণ্ডের শেষ সূক্তটি সর্বাপেক্ষা অধিক, উননব্বইটি (৮৯), মন্ত্রে নিবদ্ধ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ কাণ্ড গদ্যে রচিত এবং ভাষা ও রীতি ব্রাহ্মণগ্রন্থের ভাষার সমতুল্য।

অথর্ববেদের ভাষা ও ছন্দ বহুলাংশে ঋগ্বেদের ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী। অনেক ক্ষেত্রে কেবল শ্রবণে মন্ত্র বিশেষ ঋগ্বেদের অথবা অথর্ববেদের ধরা কঠিন। বিষয়বস্তু বিচার করিলে অথর্ববেদে বহু নূতন

বিষয়ের সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়— যাহা ঋক্, সাম বা যজুর্বেদে দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদে দেবদেবীর সূক্ত, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঊষা, বজ্র, ঝঞ্ঝাবাত্যা প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতার স্তুতিতে প্রাকৃত জনগণের প্রাণের উক্তি শ্রুত হয়; সাধারণ জনগণের মনেও তাহা স্পন্দন জাগায়। অথর্ববেদে অধিকাংশ শুভ বা অশুভনিষ্ঠ মন্ত্রের ভাষা প্রাকৃতজনের ভাষা বা চিন্তাধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পাঠ করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে এই সকল অথর্বন বা আঙ্গিরসাত্মক মন্ত্র পুরোহিতগণের দৃষ্ট বা রচিত। রিষ্টিশান্তি, মঙ্গলপ্রসবাদি কর্ম এক জাতীয় পুরোহিতের এবং মারন, উচাটন, অভিচারাদি অশুভজনক কর্মও একজাতীয় পুরোহিতের; এইসকল মন্ত্রের প্রাধান্য এই সংহিতায় থাকায় পুরোহিত কুলের প্রাধান্য স্বতঃসিদ্ধ। এইজন্য অনেকে ঋক্ সংহিতাকে জনগণের সংহিতা বা মন্ত্র (popular poetry) এবং অথর্বসংহিতাকে পুরোহিত-গণের সংহিতা বা মন্ত্র (priesty poetry) বলিয়াছেন। এই মন্তব্য আংশিক-রূপে সত্য কারণ ঐ জাতীয় মন্ত্রের অথর্ববেদে বাহুল্য থাকিলেও জনগণাদৃত অন্যান্য মন্ত্র আছে। ঋগ্বেদের অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সূক্ত অথর্ববেদেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঋগ্বেদে এই সকল দেবতার প্রপঞ্চনিষ্ঠ নৈসর্গিক প্রকৃতি (natural phenomena) অথর্ববেদে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তথায় প্রতি দেবতার প্রধান লক্ষণ হইল অসুরনাশিনী। ঋগ্বেদের অন্তিম অর্থাৎ দশম মণ্ডলে একবার মাত্র গঙ্গানদীর নাম পাওয়া যায়; নবম মণ্ডল পর্যন্ত গঙ্গানদীর কোনও উল্লেখ নাই কারণ আর্যগণ তখনও সিন্ধু উপত্যকার নিকটেই রহিয়াছেন। কিন্তু অথর্ববেদ অনুশীলনে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে আর্যগণ তখন গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় আগমন করিয়াছেন; তজ্জন্যই এই উপত্যকার একটি প্রধান নিদর্শন ভীষণ ব্যাঘ্রের (Royal Bengal Tiger) উল্লেখ কয়েকবার আমরা পাই।

উল্লিখিত কারণসমূহ বিচার করিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঋগ্বেদ প্রকাশের অনেক পরে অথর্ববেদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতীয় ভৈষজ্য ও চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাসে অথর্ববেদের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে সাধারণভাবে চিকিৎসক, চিকিৎসা ও ব্যাধির উল্লেখ আছে। কিন্তু অথর্ববেদের ন্যায় এত ব্যাপক ও বিশেষ আলোচনা তথায় পাওয়া যায় না। অথর্বসংহিতায় নানা ব্যাধির ও তৎপ্রতিষেধক বিবিধ লতা, গুল্ম, বৃক্ষের নাম দৃষ্ট হয়। বহু ব্যাধিকে অসুররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন রিষ্টিশান্তিমন্ত্রে রোগনিবারক ভৈষজ্য লতাগুল্মের

স্তুতিও শ্রুত হয়। অগ্নি এবং জলকে দেবতারূপে ও ব্যাধিনাশক পদার্থরূপে অথর্ববেদে স্তুতি করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক চিকিৎসারও (Nature cure) উৎস অথর্ববেদ। জ্বরকে অসুররূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং সেই অসুরের নামকরণ হইয়াছে 'তক্‌মন্।' এই তক্মন্ বা জ্বরাসুরের বিনাশসূচক বহু মন্ত্র এই সংহিতায় আছে। এই তক্‌মন্‌কে লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিতেছেন,—

অয়ং যো বিশ্বান্ হরিতান্ কৃণোষ্যুচ্ছোচয়ন্নগ্নিরিবাভিদুন্বন্।
অধাহি তকমন্নরসো হি ভূয়া অধা ন্যঙ্ঙধরাঙ্ বা পরেহি ॥
অথর্বসংহিতা (৫-২২-২)

হে অসুর, তুমি (যে সকল মানুষকে আক্রমণ কর সেই) মানুষদের জ্বলন্ত অগ্নির উত্তাপের ন্যায় তাপিত কর এবং তাহাদের শরীর (রক্তশূন্য করিয়া) পীতবর্ণে পরিণত কর। হে জ্বর, তুমি দুর্বল ও অক্ষম হও এবং এরাজ্য হইতে দূর হও, হয় পাতালে প্রবেশ কর নচেৎ বিনষ্ট হও।

এই জাতীয় মন্ত্র পাঠ করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, ব্যাধি দূরীকরণ জন্য শান্তিপাঠাদি এবং ওঝার ঝাড়, ফুঁক প্রভৃতি যাদুবিদ্যার মূল অথর্ববেদ।

কেবল জ্বর বা অন্যান্য ব্যাধি নিবারণ ব্যতীত অস্ত্রবিদ্যা (Surgery) এবং অস্থিবিদ্যা (Osteology) বৈদিক যুগে কিরূপ উন্নত ছিল তাহারও প্রমাণ এই সংহিতায় রহিয়াছে। লতাগুল্মাদি দ্বারা ভগ্ন অস্থি যুক্ত করা হইত। ইহাকে অস্থিসন্ধান বিদ্যা বলা যাইতে পারে। অস্থিসন্ধিকারক ভেষজ উদ্ভিদ বিদ্যাকে সম্বোধন করিয়া একটি সূক্তে (৪-১২) ঋষি বলিতেছেন,

তোমার (আহত ব্যক্তির) মজ্জার সঙ্গে মজ্জা যুক্ত হউক ;
অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ যুক্ত হউক ;

মাংসের এবং অস্থির যে অংশ (আঘাতে) পতিত হইয়াছে তাহা পুনরায় পূর্ববৎ হউক ॥ (৩)

মজ্জা মজ্জায় মিলিত হউক, ছিন্ন ত্বক ত্বকের সহিত একাত্ম হউক ;
তোমার শরীরে রক্ত এবং অস্থি সবল হউক, মাংস মাংসের সঙ্গে যুক্ত হউক ॥ (৪)

হে ভৈষজ্য গুল্ম, তুমি কেশের সঙ্গে কেশ এবং ত্বকের সঙ্গে ত্বক সংযুক্ত কর ; অস্থি এবং শোণিত সবল হউক ; ভগ্ন অংশ তুমি যুক্ত কর ॥ (৫)

অথর্ববেদে বশীকরণ মন্ত্রও অনেক আছে। কোনও প্রণয়ী পুরুষ তার প্রতি বিমুখ স্ত্রীলোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে হইলে সেই স্ত্রীলোকের একটি মৃণ্ময় মূর্তি গড়িয়া শণের 'জ্যা'-যুক্ত ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া সেই মূর্তির

হৃদয়ে বার বার বিদ্ধ করিবে ও নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। এই কার্যের অর্থ হইল, অনিচ্ছুক রমণীর হৃদয় কামবাণে বিদ্ধ করিয়া তাহার চিত্তে কামোদ্রেক করিয়া পুরুষের প্রতি আসক্ত করা। বশীকরণ মন্ত্রটির মধ্যেই এই রূপক ব্যাখ্যা দেওয়া আছে,—

উত্তুদস্ত্বোৎ তুদতু মা ধৃথাঃ শয়নে স্বে।

ইষুঃ কামস্য যা ভীমা তয়া বিধ্যামি ত্বা হৃদি ॥' অথর্বসংহিতা (৩-২৫-১)

'চিত্তের বিকার জনক কাম তোমাকে উত্তেজিত করুক ; তুমি শয্যায় আর আমাকে প্রতিরোধ করিও না। কামের প্রচণ্ড বাণে আমি তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছি।' পববর্তী মন্ত্রে বলিতেছেন।

'আধীপর্ণাং কামশল্যামিষুং সংকল্পকুল্মলাম্।

তাং সুসন্নতাং কৃত্বা কামো বিধ্যতু ত্বা হৃদি ॥' (৩-২৫-২)

'এই বাণ বাসনা বায়ুতে বেগবান, কামের দ্বারা অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, অকম্পিত উগ্রবাসনা বাণের অপরভাগ ; এইরূপ ধ্রুবলক্ষ্যভেদী কামবাণ তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিবে।'

অনিচ্ছুক পুরুষের প্রতি প্রণয়িনী রমণীর প্রযোজ্য অনুরূপ বশীকরণ মন্ত্র এই সংহিতার ৪-১৩০ হইতে ৪-১৩৮ নয়টি মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। প্রতি মন্ত্রের শেষে এই কথাগুলি আছে,—

'হে দেবতাবৃন্দ, (ঐ পুরুষের হৃদয়ে) বাসনা প্রেরণ করুন ; আমার প্রতি কামাবেগে তার চিত্ত সন্তপ্ত হউক।'

এই সকল শুভাশুভজনক মন্ত্র ব্যতীত সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টিকর্ত্তার তত্ত্ব এবং অন্যান্য অধ্যাত্মতত্ত্বও অথর্ব সংহিতায় নিবদ্ধ আছে। বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতিকারকরূপে প্রজাপতির বর্ণনা ; নির্গুণ পরমেশ্বরের তত্ত্ব প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। অবশ্য ঋগ্বেদে যে সকল দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আমরা পাই তা হইতে উচ্চাঙ্গের কোনও তত্ত্ব অথর্ব সংহিতায় দৃষ্ট হয় না ; বরং ঋগ্বেদে যাহা সুস্পষ্ট ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে অথর্ববেদে অনেক সময় তাহা রহস্যময় ভাষার কুহেলিকায় দুর্বোধ্য ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অথর্ববেদের প্রসিদ্ধ কালসূক্তে (১৯-৫৩) কাল সম্বন্ধে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বিঘোষিত। কালই সৃষ্টির প্রথম সূচনা, কাল ব্যতীত কোন পদার্থের অবস্থান অসম্ভব, দ্যুলোক, ভূলোক, কালকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং কালের গতিতে অগ্রসর হইতেছে। কাল সূক্তে ঋষি বলিতেছেন,

সপ্ত চক্রান্ বহতি কাল এষ সপ্তাস্য নাভীরমৃতং ন্বক্ষঃ।'

স ইমা বিশ্বা ভুবনান্যঞ্জৎ কালঃ স ঈয়তে প্রথমো নু দেবঃ ॥' (১৯-৫৩-১)

'কালের সাতটি চক্র ; সাতচক্রের সাতটি নাভি ; অমৃতত্ব কাল রথচক্রের বিধারক মধ্যদণ্ড। কাল সমস্ত সৃষ্টিকে বহন করিতেছে ; প্রথম দেবতা কাল দ্রুত গমন করিতেছেন।'

পঞ্চম মন্ত্রে বলিতেছেন,—

'কালোঽমূং দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত।

কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে ॥' (১৯-৫৩-৫)

এই দ্যুলোক ও এই ভূলোক কাল হইতেই সঞ্জাত। ভূত এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত পদার্থ কালের চোদনায় প্রকাশ পায়।'

অমৃতত্ব অর্থাৎ মহাকাল কালের উৎস।

অথর্বসংহিতার সুপ্রসিদ্ধ স্কম্ভসূক্তে (১০-৭ এবং ১০-৮) এবং উচ্ছিষ্ট সূক্তে (১১-৯) গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিহিত আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেদের শাখা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বেদের কয়েকটি শাখার নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। বেদের শাখা বলিতে কি বুঝায় এই পরিচ্ছেদে আমরা তাহা আলোচনা করিব। সুপ্রাচীনকাল হইতে যুগ যুগধরিয়া গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় মুখে মুখে বেদবিদ্যা বিধৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজবোধ্য যে যুগ যুগ ধরিয়া গুরু-শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত এই বিশাল শাস্ত্রের আবৃত্তি ভঙ্গীতে, পাঠরীতিতে, উচ্চারণে ও বিনিয়োগের দেশ ও কালভেদে পার্থক্য ও স্বতন্ত্রতা দেখা দিবে।

বেদের শাখা

এইরূপে দেশ ভেদে ও কালভেদে প্রতি বেদের আবৃত্তি, উচ্চারণ, গান প্রভৃতির রীতিতে বহু পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এই পৃথক্ পৃথক্ শৈলী, ভিন্ন ভিন্ন রীতি বা স্বতন্ত্রতা বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তির বীজ স্বরূপ। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত প্রবচন ;—(১-৪-২৩)

'শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্।' গুরু শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য বা প্রশিষ্য আবার প্রশিষ্যের শিষ্য, এইভাবে ধারাবাহিকক্রমে চলিয়া আসিবার সময় চতুর্বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়।

পুরাণে বেদের বহু শাখার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া বিষ্ণুপুরাণে (৩-৪-১৬ হইতে ৩-৪-২৫), ভাগবত পুরাণে (১-৪-২৩ হইতে ১-১২-৮) এবং কূর্মপুরাণে (১-৫১) বেদের শাখার তালিকা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একুশ শাখা, যজুর্বেদের একশত শাখা, সাম বেদের এক সহস্রশাখা এবং অথর্ববেদের নয়টি শাখার উল্লেখ আছে। একটি পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিলেই চলিবে। কূর্মপুরাণের বেদশাখা সম্বন্ধে উক্ত, –

'একবিংশতিভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা
শাখানাং তু শতেনাথ যজুর্বেদমথাকরোৎ ॥
সামবেদং সহস্রেণ শাখানাং চ বিভেদতঃ।
অর্থবাণমথ বেদং বিভেদ নবকেন তু ॥' (৪০ অধ্যায়)

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর 'পস্পশ' নামক মহাভাষ্যের ভূমিকা বা অবতরণিকা অংশে বলিয়াছেন,--

'একবিংশতিধা বহ্বৃচম্ ; একশতমধ্বর্যুশাখাঃ,
সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ।' অর্থাৎ ঋগ্বেদের একুশটি শাখা, যজুর্বেদের একশত শাখা, সামবেদের সহস্রশাখা আছে। নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গের বৃত্তি রচনা করিয়াছেন দুর্গাচার্য্য। তিনিও তাঁর নিরুক্ত বৃত্তিতে বেদচতুষ্টয়ের উপরিলিখিত শাখা সংখ্যা সমর্থন করিয়াছেন,—

'একবিংশতিধা বাহ্বৃচম্। একশতধা আধ্বর্যবম্।
সহস্রধা সামবেদম্। নবধা আথর্বণম্।'

ঋগ্বেদের শাখা :

ঋগ্বেদের শাখার সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ভর্তৃহরি তাঁহার 'বাক্যপদীয়' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে পনরটি শাখার এবং পতঞ্জলি মহাভাষ্যে একুশটি শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণ এবং আনন্দ সংহিতার বচন উদ্ধার করিয়া অনুভাষ্যে (১ ১ ১) চব্বিশটি ঋক্শাখা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় প্রতিশাখ্যে, পাণিনির সূত্র অবলম্বনে রচিত কাশিকাবৃত্তি গ্রন্থে এবং কল্পসূত্রে ত্রিশ অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক ঋক্শাখার নাম দৃষ্ট হয়। যথা,— (১) শাকল, (২) মুদ্গল, (৩) গালব, (৪) শালীয়, (৫) বাৎস্য, (৬) শৈশিরি, (৭) বাস্কল, (৮) বৌধ্য, (৯) অগ্নিমাঠর, (১০) পারাশর, (১১) জাতুকর্ণ্য, (১২) আশ্বলায়ন, (১৩) শাংখ্যায়ন, (১৪) কৌষীতকি, (১৫) মহা কৌষীতকি, (১৬) শাম্বব্য, (১৭) মাণ্ডূকেয়, (১৮) বহ্বৃচ, (১৯) পৈঙ্গ্য, (২০) উদ্দালক, (২১) গোতম, (২২) শতবলাক্ষ, (২৩) হৌত্তিক, (২৪) ভারদ্বাজ, (২৫) ঐতরেয়,

(২৬) বসিষ্ঠ, (২৭) সুলভ, (২৮) শৌনক, (২৯) আশ্বরথ্য, (২০) কাশ্যপ, (১) কার্মন্দ, (৩২) কার্শাশ্ব, (৩৩) ক্রৌড় ও (৩৪) কাঙ্কত।

অধুনা ঋগ্‌বেদের এই সকল শাখার অধিকাংশই পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মাত্র কয়েকটি শাখা পাওয়া যায়। শৌনকঋষি কৃত 'চরণব্যূহ' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে বেদের শাখার সংখ্যা লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে ঋগ্‌বেদের মাত্র পাঁচটি শাখার নাম দৃষ্ট হয়; যথা শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন ও মাণ্ডূক। শাখার সৃষ্টিকর্ত্তা ঋষির নাম হইতেই শাখার নামকরণ হইয়াছে; যেমন শাকল ঋষি যে শাখার প্রবর্ত্তক, তাহার নাম শাকল শাখা। শাকল নামক ঋষিই প্রথম ঋক্‌সংহিতা অধ্যয়ন করেন; তদনন্তর বাস্কল, আশ্বলায়নাদি অপর চারিজন অধ্যয়ন করেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যয়ন-শৈলী হইতেই এক একটি শাখার উৎপত্তি হয়। ঋক্-প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে এই বার্ত্তা নিবদ্ধ আছে। 'প্রতিশাখা' শব্দ হইতেই 'প্রাতিশাখ্য' শব্দ আসিয়াছে। শৌনককৃত ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে ঋগ্‌বেদের 'শাখার' উৎপত্তি এইভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে;—

'ঋচাং সমূহঃ ঋগ্‌বেদস্তমভ্যস্য প্রযত্নতঃ।
পঠিতঃ শাকলেনাদৌ চতুর্থিস্তদনন্তরম্‌ ॥
শাংখ্যাশ্বলায়নৌ চৈব মাণ্ডূকো বাস্কলস্তথা।
বহবৃচাং ঋষয়ঃ সর্বে পঞ্চৈতে একবেদিনঃ ॥

ঋক্‌সমূহের সমষ্টি ঋগ্‌বেদ। সর্বপ্রথম শাকলমুনি এই বেদ প্রযত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেন; তৎপর শাংখ্যায়ন, আশ্বালায়ন, মণ্ডুক ও বাস্কল নামে অপর চারিজন মুনি উহা অধ্যয়ণ করেন। এই পাঁচজনই একই বেদের অর্থাৎ ঋগ্‌বেদীয় ঋষি।'

সামবেদের শাখা:

বিষ্ণুপুরাণে (৩।৮) সামবেদের শাখা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্যাসদেবের নিকট সামবেদ শিক্ষা করিয়া তদীয় শিষ্য জৈমিনি, সুমন্ত, সুকর্মা তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে অধ্যাপনা করেন। জৈমিনির পৌত্র সুকর্মার তিনজন শিষ্য ছিল, কৌশল্য, হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জ। এই হিরণ্যনাভের উদীচ্যসামগা নামে পনরজন শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে কৃতি নামক মুনির চব্বিশজন অন্তেবাসী সামবেদের অনেক শাখা প্রচার করিয়াছিলেন। পৌষ্পিঞ্জের লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি এবং লাঙ্গলি নামে তিনজন শিষ্য ছিলেন। এইরূপে সামবেদের বহু শাখার উৎপত্তি হয়।

বিষ্ণুপুরাণেও সামবেদের সহস্রশাখার কথা বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে সামবেদের সহস্রশাখার উল্লেখ আছে। এবং 'দিব্যাবদান' গ্রন্থে ১০৮০ (এক সহস্র আশী) শাখার উল্লেখ আছে। পাঠভেদ হইতেও গানের সুরের প্রকারভেদ বেশী হয় ও অতিসহজে হয় ইহা সকলেরই সুবিদিত। সামবেদের প্রাণ হইতেছে গান। এইজন্যই সামবেদের ক্ষেত্রে এত অধিক সংখ্যক শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল মনে হয়।

চরণব্যূহ গ্রন্থে সামবেদের সাতটি মুখ্য শাখার উল্লেখ আছে, যথা,—রাণায়নীয়, শাত্যমুগ্র, কলাপ, মহাকলাপ, শার্দুল, লাঙ্গলায়ণ এবং কৌথুম। কৌথুম শাখার আবার পাঁচটি প্রশাখা আছে,—আসুরায়ণ, বাতায়ন, প্রাঞ্জলিদ্বৈতভৃৎ, প্রাচীনাযোগ্য এবং নৈগেয়।

উপরে উল্লিখিত আমাদের বিবিধ শাখার মধ্যে বর্ত্তমানে মাত্র তিনটি শাখা পাওয়া যায়,—কৌথুম, জৈমিনীয় ও রাণায়নীয়। তন্মধ্যে কৌথুমশাখা বঙ্গদেশে ও গুজরাটে, জৈমিনীয় শাখা কর্ণাটদেশে এবং রাণায়নীয় শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত। গুজরাটের শ্রীমালী এবং নাগর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌথুমশাখার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী বলেন সামবেদের তেরটি (১৩) শাখার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু মাত্র উপরিলিখিত তিনটি শাখা অধুনা দৃষ্ট হয়। 'প্রপঞ্চহৃদয়' গ্রন্থের মতে সামবেদের সহস্রশাখার মধ্যে মাত্র বারটি শাখার অস্তিত্ব আছে। সামবেদের কৌথুমশাখার উপর সায়ণাচার্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সামবেদের জৈমিনীয় শাখা মুদ্রিত হইয়াছে। (W. Caland) কালাণ্ড ইহা প্রণয়ন পূর্বক ছাপাইয়াছেন। কর্ণাটদেশে ইহার সমধিক প্রচার দৃষ্ট হয়।

যজুর্বেদের শাখা :—

স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, সূতসংহিতা ইত্যাদির মতে যজুর্বেদের ১০৭ (একশত সাত), মুক্তিকোপনিষদ অনুযায়ী ১০৬ (একশত ছয়) এবং পাতঞ্জল মহাভাষ্য অনুসারে ১০০ (এক শত) শাখা ছিল। এই সংখ্যা-বৈষম্য হইতে বুঝা যায় শাখাগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে। এবং বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের জীবদ্দশায় যতগুলি শাখা পাইয়াছেন সেই কয়টির উল্লেখ করিয়াছেন। চরণব্যূহ গ্রন্থে শৌনক যজুর্বেদের ছিয়াশীটি শাখা ছিল বলিয়াছেন কিন্তু সবগুলির নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি মাত্র কৃষ্ণযজুর্বেদের সাতাশটি (২৭) এবং শুক্লযজুর্বেদের ষোলটি (১৬) শাখার নাম

করিয়াছেন অর্থাৎ সর্বসমেত মাত্র তেতাল্লিশটি (৪৩) শাখার নাম চরণব্যূহে আমরা পাই।

কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখা :—

চরণব্যূহ এবং বিষ্ণুপুরাণ উভয় গ্রন্থেই কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখার সংখ্যা সাতাশ। বিষ্ণুপুরাণে (৩।৫) কৃষ্ণযজুঃশাখার সংখ্যা ২৭ এবং শুক্লযজুঃশাখার সংখ্যা ১৫ উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণযজুঃশাখা মধ্যে এই নামগুলি আমরা পাই; চরক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কপিষ্ঠলকঠ, আহ্বর্ক, আহ্বরক, চারায়নীয়, বার্ত্তান্তরেয়, (বরতান্তরীয়) শ্বেতাশ্বতর, ঔপমন্যব,

কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখা

পাতাণ্ডনীয়, ঐন্দিনেয় ও মৈত্রায়নী এই কয়টি শাখা চরকশাখার অন্তর্গত। মানব, বারাহ, দুন্দুভ, ছাগলেয়, শ্যাম, শ্যামায়নীয় এবং হারিদ্রবীয় এই শাখাগুলি মৈত্রায়নীয়ের অন্তর্গত। তৈত্তিরীয় শাখা হইতে ঔক্ষ্য বা ঔখীয় এবং খাণ্ডিকেয় শাখাদ্বয় আসিয়াছে। খাণ্ডিকীয় বা খাণ্ডিকেয় শাখা হইতে কালেয়, শাট্যায়নী, হৈরণ্যকেশী, ভারদ্বাজী এবং আপস্তম্বী শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। এই সঙ্গে বৌধায়নী এবং সত্যাষাঢী নামে অরও দুটি শাখার কথা চরণব্যূহের একটি সংস্করণে পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত হরিদ্রবীয় শাখার পুরাণে কীর্ত্তিত পাঁচটি প্রশাখা হইল হারিদ্রব, আসুর, গার্গ্য, শার্করাক্ষ এবং অগ্রিসবীয়। এই হরিদ্রবীয় শাখার পাঁচটি প্রশাখা বাদ দিলে কৃষ্ণযজুঃশাখার সংখ্যা ২৭ হয় এবং প্রশাখা পাঁচটি ধরিলে ৩২ হয়। এতগুলি শাখার মধ্যে বর্ত্তমানে মাত্র চারিটি শাখা ধরাতলে দৃষ্ট হয়,—আত্রেয়, কাঠক, আপস্তম্বীয়, এবং হারিদ্রবীয়।

কঠ এবং তাহার প্রশাখা কপিষ্ঠল একসময়ে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল। কপিষ্ঠল এখন দৃষ্ট হয় না কিন্তু কঠশাখা এখনও কাশ্মীরে বর্তমান। অনেকে কঠশাখাকে যজুর্বেদের প্রাচীনতম শাখা বলিয়া মনে করেন। কলাপ বা মৈত্রায়নী শাখা বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে প্রসার লাভ করিয়াছিল; একসময়ে ইহা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল। এখ দুই শাখার ব্রাহ্মণগণ 'চরকাধ্বয্যু' সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন।

আপস্তম্বী এবং হিরণ্যকেশী প্রশাখাসহ তৈত্তিরীয় শাখার প্রভাব ও প্রচলন দাক্ষিণাত্যে দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁর সময়ে (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়

শতাব্দীতে) কৃষ্ণযজুর্বেদের চরণশাখা সুপ্রচলিত ছিল ; গ্রামে গ্রামে তাহার অধ্যয়ন হইত।

কোনও কোনও গ্রন্থকারের মতে কৃষ্ণযজুর্বেদের আলম্বিন, পালঙ্গিন, কামলাম্বিন, আর্চাভিন, আরুণিন, তাণ্ডিন, তুম্বরু, বারায়নীয়, পৌম্পিঞ্জি, কৌণ্ডিন্য, হারীত প্রভৃতি নামে আরও কয়েকটি শাখা ছিল।

শুক্লযজুর্বেদের শাখা :—

চরণব্যূহে শুক্লযজুর্বেদের ষোলটি শাখার উল্লেখ আছে,—জাবালি, বৌধেয়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, সাথেয়, তাপনীয়, কালাপী, পৌণ্ড্রবৎস, আবটিকী, পরমাবটিক, পারাশরীয়, বৈনেয়, ঔধেয়, গালব, বৈজব এবং কাত্যায়নী। এই ষোলটি শাখার মধ্যে মাত্র কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখা দুইটি প্রথম বিদেহে প্রচারিত হয় এবং তথা হইতে ক্রমশঃ উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে প্রসার লাভ করে। এই শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেহ ও মগধের বহুবার উল্লেখ আছে এবং বিদেহরাজ জনকের সভায় শতপথ ব্রাহ্মণের প্রবক্তা যতিশ্রেষ্ঠ বিদ্বৎশিরোমণি যাজ্ঞবল্ক্যের ও অন্যান্য ঋষির বিতর্কের উল্লেখ আমরা পাই। কিভাবে বৈদিকযুগে আর্যগণ সিন্ধু উপত্যকা বা সুবাস্তু জনপদ হইতে গঙ্গা-যমুনা-রাজিত উপত্যকায় নামিয়া আসিয়াছিলেন, রাজার অগ্রে অগ্রে কিরূপে তার পুরোহিত গোতম পবিত্র অগ্নি লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে পাই। সুতরাং বিদেহ অঞ্চলে এই বেদের শাখার প্রথম প্রচার খুবই স্বাভাবিক।

শুক্লযজুর্বেদের শাখা।

বাংলাদেশে যজুর্বেদী ব্রাহ্মণের অধিকাংশ শুক্লযজুর্বেদী এবং কাণ্বশাখাবলম্বী। সায়ণাচার্য শুক্লযজুর্বেদের কাণ্বশাখার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। মাধ্যন্দিন নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন এই শাখাবিহিত শ্রৌতকর্ম দিনের মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই এই শাখার নাম মাধ্যন্দিন হইয়াছে। অপর একদলের মতে যাজ্ঞবল্ক্যের মাধ্যন্দিন নামক শিষ্য এই শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই এই নাম হইয়াছে।

যজুর্বেদের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দপুরাণকীর্তিত একশত সাত শাখা, পতঞ্জলি কথিত একশত শাখা বা চরণব্যূহধৃত ছিয়াশী শাখার মধ্যে অধুনা মাত্র পাঁচটি শাখা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে তিনটি শাখা কৃষ্ণযজুর্বেদের যথা—তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়নী ও কঠ এবং শুক্লযজুর্বেদের দুটি শাখা, মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব। কোন্ কোন্ দেশে

শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা বিস্তার লাভ করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে চরণব্যূহে উক্ত আছে—

'অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ কণিনোগুর্জ্জরস্তথা,
বাজসনেয়ী শাখা চ মাধ্যন্দিনী প্রতিষ্ঠিতা ॥'

অর্থাৎ মাধ্যন্দিনী বাজসনেয়ী শাখা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কান্যকুব্জ ও গুর্জ্জর দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণ যজুর্বেদ দক্ষিণ দেশে প্রচলিত ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নর্ম্মদা নদীকে ভারতের মধ্যরেখা ধরিয়াই এই উত্তর ও দক্ষিণ দেশ বিবেচিত হইয়াছে।

অথর্ববেদের শাখা সম্বন্ধে তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। তথায় আমরা দেখাইয়াছি যে অথর্ববেদের নয়টি শাখার মধ্যে মাত্র দুইটি শাখা অধুনা দৃষ্ট হয়, শৌনক শাখা ও পিপ্পলাদ শাখা। আহির্বুধ্ন্য সংহিতায় (১২, ২০) অথর্ববেদের পাঁচ শাখার উল্লেখ আছে। অধিকাংশ গ্রন্থে নয় শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। অধুনা ভারতে ইতস্ততঃ নামমাত্ররূপে প্রচলিত অথর্ববেদের প্রায় বিংশতি শাখার নাম শ্রুত হয়, যথা,—পিপ্পলাদ, শৌনক, তোদ, মোদ, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবেদ, দেবদর্শ, চারণবৈদ্য, দামোদ, তোত্তায়ন, জাবাল, কুনখী, ব্রহ্মপলাশ, ত্রিখর্ব, ততিল, শৈখণ্ড, সৌকর সদ্ম, শাঙ্গ'রব অশ্বপেয় ইত্যাদি।

বেদের শাখা বলিতে কি বুঝায় তাহা এই পরিচ্ছেদের সূচনায় আমরা আলোচনা করিয়াছি। বিদ্বৎসমাজে অনেকের বেদের শাখা সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন এবং লিখিয়াও গিয়াছেন যে মূল সংহিতাগ্রন্থ শাখা ভেদে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ একটি বেদের যতগুলি শাখা মূল সংহিতা ততগুলি পৃথক পৃথক রূপে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যথা ঋগ্বেদের যে একুশ শাখা ছিল বা যে পাঁচটি শাখা বর্তমানে পাওয়া যায় তাহার অর্থ মূল সংহিতা একুশটি বা পাঁচটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হয়। তাঁহারা মনে করেন এক একটি শাখা সেই বেদের এক একটি সম্পূর্ণ নবীন রূপায়ন, একটি অপরটি হইতে পৃথক, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; যতগুলি শাখা ততগুলি সংহিতা; শাখার বহুত্ব সংহিতার বহুত্বের কারণ অর্থাৎ যত শাখা তত সংহিতা।

বেদের শাখা সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা

এই ধারণা সম্পর্ণ ভ্রান্ত। বস্তুতঃ শাখাভেদে সংহিতার ভেদ হয় না। এক সংহিতার বহু শাখা থাকিলেও মূল সংহিতার আক্ষরিকরূপ এক ও অবিকৃত থাকে; তজ্জন্যই এক বেদের যে কোন একটি শাখা অধ্যয়ন

করিলেই সেই বেদের অধ্যয়ন হইয়া যায়। যেমন ঋক্ সংহিতার শাকল শাখা বা বষ্কল শাখা বা আশ্বলায়ন শাখা যে কোনও একটি শাখার অধ্যয়ন করিলে তাহা ঋক্-সংহিতার অধ্যয়ন বলিয়া গণ্য হইবে। একটি সংহিতার সমস্ত শাখা অধ্যয়ন করিলে সেই অধ্যয়ন সমষ্টি সংহিতার অধ্যয়নের সমতুল্য হইবে বলিয়া কেহ ভাবিলে ভুল হইবে। ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তির কারণ আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয় অধ্যয়নের, আবৃত্তির, উচ্চারণের নানাপ্রকার ভেদই শাখাভেদের কারণ, সংহিতাভেদ শাখা ভেদের কারণ নহে। তাঁহার প্রণীত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'ঐতরেয়ালোচন' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিস্তৃত ভূমিকায় বেদবিদ্যানিষ্ণাত আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী শাখা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'অধ্যয়নভেদ এব শাখাভেদনিদানং নতু গ্রন্থভেদ ইতি।
এ‍ৈকৈকবেদস্য অনেকশাখাত্বেঽপি তাত্ত্বিকভেদাভাবাৎ।'

অর্থাৎ 'অধ্যয়নভেদই শাখাভেদের কারণ, মূল গ্রন্থভেদ শাখাভেদের কারণ নহে। এক একটি বেদের অনেক শাখা থাকা সত্ত্বেও মূল গ্রন্থের ভেদ হয় না।' ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন-রীতির ভেদ ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তিবীজ এবং সামবেদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শাখার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন সামগানের প্রকার বা রীতি। সামবেদের সহস্র শাখার অর্থ সামগানের সহস্র বা অসংখ্য প্রকার। বেদ ভাষ্যভূমিকায় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উক্তি অনুধাবনীয়, 'সহস্রবর্ত্মা সামবেদ ইত্যস্য সহস্রং গীত্যুপায়া ইতি ভাবঃ।' 'সামবেদের সহস্র শাখা কথাটির অর্থ হইল সামগানের সহস্র প্রকার।'

গুরু-শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরা যুগ যুগ ধরিয়া বেদ শ্রুতিতে ধৃত হইয়া আসিতেছিল তজ্জন্য কালভেদ, দেশভেদ, ব্যক্তিভেদ, এবং উচ্চারণ ভেদজনিত ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তি স্বাভাবিক।

বেদের প্রখ্যাত ভাষ্যকার সায়ণাচার্য ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি বেদের প্রত্যেক শাখার পৃথক্ পৃথক্ ভাষ্য রচনা করেন নাই; মাত্র এক একটি শাখাধৃত গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন অথচ সেই বেদের ভাষ্যকার বলিয়াই তিনি পরিচিত। যথা, শুক্লযজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন দুইটি শাখার মধ্যে কেবল কাণ্ব শাখার তিনি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন কিন্তু তিনি শুক্লযজুর্বেদের ভাষ্যকার বলিয়াই পরিচিত। শাখাভেদে গ্রন্থভেদ হয় না বলিয়াই মাত্র একটি শাখাধৃত গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করিলেই সেই বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করা হইল। এইরূপ

সামবেদের বহু শাখার মধ্যে মাত্র কৌথুম শাখার ভাষ্য সায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহাতে সামবেদের ভাষ্যই রচনা করা হইল।

শাখাভেদের নিদান অধ্যয়নভেদ ইহা প্রমাণিত হইল। এই অধ্যয়ন বলিতে পারায়ণের, উচ্চারণের, স্বরের, সুরের, জিহ্বাচালনা ও অঙ্গুলিচালনার পৃথক্, পৃথক্ রীতি বোধ্য। দুই একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইবে। শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। তাহার কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামে দুইটি শাখা আছে। মাধ্যন্দিন শাখায় অন্তস্থ 'য' এর উচ্চারণ বর্গীয় 'জ' এর ন্যায় এবং মূর্ধণ্য এর উচ্চারণ 'খ' এর ন্যায় করিতে হয়; কোন ও পদের প্রথম বর্ণ 'ব' কার হইলে লেখায় ও উচ্চারণে সেই 'ব' কারের দ্বিত্ব হয়। বিসর্গ উচ্চারণের সময় অঙ্গুলি সঞ্চালন নিষিদ্ধ। এই মাধ্যন্দিন শাখায় মাত্র দুটি স্বরের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় উদাত্ত এবং অনুদাত্ত; স্বরিতের প্রয়োগ দেখা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ

প্রতিবেদের প্রতিসূক্তের এবং স্থল বিশেষে প্রতিমন্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ আছে। মন্ত্রের সম্যক্‌জ্ঞানজন্য কেবল মন্ত্রের অক্ষরার্থ জানিলেই চলিবে না, প্রতিমন্ত্রের ঋষি কে, ছন্দ কি, দেবতা কে এবং যজ্ঞে তাহার বিনিয়োগ বা প্রয়োগ কিরূপ তাহাও নির্ভুলভাবে জানিতে হইবে। মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োখের জ্ঞান বৈকল্পিক নয়, বাধ্যতা-মূলক। বেদ মন্ত্রের জ্ঞানজন্য এইগুলি জানা অপরিহার্য এবং কেহ যদি এইগুলি না জানিয়া বেদমন্ত্র স্বাধ্যায় করে তাহাকে ধর্মশাস্ত্রে 'মন্ত্রকণ্টক' বলা হইয়াছে;

'ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাদ্যপি।
অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যতে॥'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদমন্ত্র সমূহের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ এবং স্বর প্রক্রিয়াদি না জানিয়া মন্ত্রের প্রয়োগ করে তাহাকে মন্ত্রকণ্টক বলা হয়। অতএব বেদাধ্যয়নরত ছাত্র বা শিক্ষক বা ব্যক্তিমাত্রেরই এই কয়টি বিষয় ভালভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন। এই সকল না জানিয়া যদি কেহ অধ্যাপনা করে বা মন্ত্র জপ করে সে পাপী হয়। তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে,—

'অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দোদৈবতং যোগমেব।
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়ান্ জায়তেতু সঃ॥'

এখন আমরা ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও বিনিয়োগের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ আলোচনা করিব। ঋষি ;--'ঋষি' শব্দের কয়েক প্রকার ব্যুৎপত্তি আছে। ঋষ্ ধাতুতে ইন্ প্রত্যয় যোগে 'ঋষি' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ঋষ্ ধাতুর গমন অর্থ ধরিয়া যাস্ক ঋষি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,--'যদেনান্ তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু অভ্যানার্যত তদৃষয়োঃ-ভবন্। তৎঋষীণাম্‌ঋষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।' তপস্যারত যতিগণের নিকট স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন তজ্জন্যই সেই যতিগণকে ঋষি বলা হয়। ইহাই ঋষিদের ঋষিত্ব। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এইভাবে ঋষিশব্দের নির্বচন করা হইয়াছে। তপস্যারত ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মের কৃপায় বেদমন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের চিত্তে বেদমন্ত্র স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল। এইজন্য ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা বলা হয় এবং এইজন্যই কেহ কেহ দর্শনার্থক ঋষ্ ধাতু হইতে ঋষি শব্দটির নির্বচন করিয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্কমুনি ইহা উপমন্যুপুত্র এবং তদনুযায়িগণের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'ঋষির্দর্শনাৎ। স্তোমান্ দদর্শ ইতি ঔপমন্যবঃ'। 'ঋষি' শব্দের অথ যিনি দর্শন করিয়াছেন। কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টিকে স্তোম বলে। যাস্ক নিজেও ঋষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন করিয়াছেন। তিনি ঋষির লক্ষণ দিয়াছেন, 'সাক্ষাৎকৃতধর্মাণঃ ঋষয়ো বভূবুঃ।' (নিরুক্ত ১'১), যাঁহারা ধর্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা ঋষি। বেদ অখিলধর্মের মূল, তজ্জন্য ধর্মশব্দে এখানে বেদ বুঝিতে হইবে। সাক্ষাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যাহারা বেদের সাক্ষাৎ পায় নাই তাদৃশ ব্যক্তিগণকে উপদেশ প্রসঙ্গে মন্ত্রসকল দান করিলেন। মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যাব্যতীত গ্রহণ করিতে যাহারা অপারগ হইল তাহাদের জন্য বৈদাঙ্গ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। এইভাবে যাস্ক বিষয়টি বুঝাইয়াছেন। মন্ত্রদর্শন করা অর্থ কি ? ঋষিদের মন্ত্রদ্রষ্টা বলা হইতেছে কেন,—মন্ত্ররচয়িতা ও মন্ত্রদ্রষ্টা শব্দ দুইটির পার্থক্য কোথায়,— অধুনা তাহা আলোচনা করিব। বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় অর্থাৎ ইহা কোনও পুরুষের চেষ্টা দ্বারা রচিত হয় নাই, ইহা কাহারও কৃত বা রচিত নহে। বেদের নিত্যত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন সেই মীমাংসকগণ বলেন পুরুষের চেষ্টায় যাহা নির্মিত বা রচিত হয় তাহার উৎপত্তি আছে এবং বিনাশও আছে। সৃষ্ট বা জন্য পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি এবং বিনাশ হইবেই। বেদের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তাহা অনাদি ও অনন্ত এইজন্যই বেদের কেহ

কর্তা বা রচয়িতা থাকিতে পারে না। ঋষিরা এই জন্যই মন্ত্রের দ্রষ্টা, কর্তা নহেন। এমন কি পরমেশ্বরও বেদের কর্তা নহেন। প্রতিকল্পে তিনি বেদ স্মরণ করেন। এই বিষয়টি আমরা অপৌরুষেয়ত্ব পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচন করিব, তজ্জন্য এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট। ঋষিগণ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই সময় স্বয়ম্ভু পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে বেদমন্ত্র স্বতঃই আবির্ভূত হইয়াছিল। এক একজন ঋষির নিকট বেদের একটি সূক্ত, ক্ষেত্র বিশেষে এক একটি অনুবাক প্রকাশিত হইয়াছিল; যাঁহার নিকট যে যে মন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছিল তিনি সেই মন্ত্রগুলির দ্রষ্টা বা ঋষি। যথা ঋগ্-বেদের প্রথম সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দা ঋষির নিকট ঐ সূক্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের কোন কোন মণ্ডল এক একজন ঋষিদৃষ্ট; দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি গৃৎসমদ, তৃতীয় মণ্ডলের বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্বাজ, সপ্তমের বশিষ্ঠ এবং অষ্টম মণ্ডলের ঋষি কণ্ব। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মের কৃপায় ঋষিগণের তপস্যাদ্বারা যুগান্তে প্রতি কল্পারম্ভে এই বেদপ্রাপ্তিবার্তা একটি শ্লোকে নিবদ্ধ আছে,—

'যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা ॥'

দেবতা :—প্রতি মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একজন আছেন। সেই মন্ত্রের দ্বারা সেই দেবতার আবাহন ও প্রশংসা করা হয়। দেবতা, দেব, দেবী প্রভৃতি শব্দ বিদ্ ধাতু হইতে আসিয়াছে। দিব্ + অচ্ = দেবঃ। দেব + তল্ = দেবতা। বিদ্ ধাতুর বহু অর্থ আছে। একটি অর্থ প্রকাশ পাওয়া। যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর, যিনি স্বপ্রকাশ তিনি দেবতা। 'দেব এব দেবতা' অর্থাৎ 'দেব' শব্দ ও 'দেবতা' শব্দ সমানার্থক। নিরুক্তে যাস্ক 'দেব' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলিতেছেন, 'দেবো দানাৎ বা দীপনাৎ বা দ্যোতনাদ্ বা ভবতি।' অর্থাৎ দান করেন যিনি তিনি দেবতা অথবা যিনি নিজে প্রকাশ পাইয়া অন্যকে প্রকাশিত করেন তিনি দেবতা। দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠে, স্তুতি-গীতি বন্দনায় অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানে মানুষের অভীষ্টের পূরণ হয়; তজ্জন্য তিনি অভীষ্ট দাতা। দান করার অর্থ ইহাই। তিনি নিজে দীপ্তি পান, স্বয়ংজ্যোতি এবং অন্যকে উদ্ভাসিত করেন। মন্ত্রের চৈতন্য বা অধিষ্ঠাত্রী হইলেন দেবতা। চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ এবং চৈতন্যের আলোকে সকল জড়পদার্থ প্রকাশিত হয়। অতএব মূলতঃ সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মচৈতন্যই দেবতামণ্ডলীর প্রকৃত স্বরূপ; বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে ব্যক্ত দেবতাগণ সেই এক অব্যক্ত

অদৃশ্য পরম ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। ঋগবেদের একটি বহুপ্রচলিত ও বহুশ্রুত মন্ত্রে এই তত্ত্বটি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।'

সেই এক অখণ্ড অব্যাকৃত সৎ ব্রহ্মকে বিপ্রগণ বহুপ্রকার নামে অভিহিত করেন, যথা, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি। মাতরিশ্বা বায়ুর একটি নাম।

বহু দেবতার নাম বেদে আমরা পাই। যাস্ক বলিতেছেন, মূলতঃ, দেবতার সংখ্যা মাত্র তিনটি। 'তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ' (নিরুক্ত সপ্তম অধ্যায়)। এই তিন মূল দেবতা যাস্কের মতে (১) অগ্নি, (২) বায়ু বা ইন্দ্র এবং (৩) সূর্য। তিন জনের এক একজন এক এক রাজ্যের অধিপতি। অগ্নি পৃথিবীর দেবতা, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষলোকের দেবতা। বেদে 'অন্তরিক্ষ, শব্দে সর্বদা হ্রস্বই'কার দৃষ্ট হয়; লৌকিক সংস্কৃতে দীর্ঘ হইয়াছে। এই তিন দেবতার মধ্যে আমাদের নিকটতম হইলেন অগ্নি (অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ) এবং দূরতম হইলেন আদিত্য (সূর্যো বৈ দেবানাং পরমঃ) মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের নাম বিষ্ণু; তিনিই সর্বাপেক্ষা দূরে। এই নিকটতম অগ্নি ও দূরতম সূর্যের মধ্যে অন্যান্য সকল দেবতা অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটি দেবতার নানা অবস্থার ও নানা ক্রিয়ার নামকরণ হইয়াছে অন্যান্য দেবতার নাম দ্বারা; অর্থাৎ ইঁহাদের এক একটি অবস্থা বা কার্য এক একটি দেবতার নাম পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে নিরুক্ত প্রবচন,—'তাসামেব ভক্তিসাহচর্যাদ্ বহুনি নামধেয়ানি ভবন্তি। কর্ম-পৃথক্ত্বাৎ বা।' সেই তিন জন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম পাইয়াছে। দেবতা সম্বন্ধী পরিচ্ছেদে আমরা বিশেষভাবে দেবতাতত্ত্বের আলোচনা করিব। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মন্ত্রদ্বারা যে দেবতার স্তুতি করেন, সেই দেবতা সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী।

ছন্দ:—নিরুক্তে এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'ছন্দ' শব্দটির অনেক প্রকার নির্বচন বা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। যাহা পাপকে আচ্ছাদন করে তাহা ছন্দ, যাহা পাপ হইতে যজমান ও পুরোহিতদের আচ্ছাদন করে, রক্ষা করে তাহা ছন্দ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। প্রজাপতি অগ্নিকে চয়ন করিয়াছিলেন অর্থাৎ অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই প্রজ্বলিত হুতাশন ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। তিনি নিশিত ক্ষুরের তীক্ষ্ণভাগের রূপ ধরিয়া দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন। সেই উগ্ররূপ দর্শনে দেবতাগণ ভীতিবিহ্বল হইলেন এবং অগ্নির নিকট গমন করিতে সাহস পাইলেন না। তখন তাঁহারা ছন্দের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া

অগ্নির নিকট গমন করিলেন ও অক্ষত রহিলেন। তাঁহারা তদ্দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়াছিলেন বলিয়াই ছন্দকে ছন্দ বলা হয়। কেহ কেহ বলেন ঋষিদের নিকট মন্ত্র যখন প্রকাশ হইয়াছিল তখন তাঁহারা যে হিল্লোল বা স্পন্দন অনুভব করিয়াছিলেন, সেই স্পন্দনই ছন্দের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

বেদে সাতটি মুখ্য ছন্দ আছে, গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুস্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিস্টুপ্ ও জগতী। বৈদিক ছন্দকে অক্ষরছন্দ বলা হয় কারণ একটি মন্ত্রের মোট অক্ষর সংখ্যা গুণিয়া তাহার ছন্দ নির্ণয় করা হয়। এখানে অক্ষরের অর্থ বর্ণ নহে; অক্ষর বলিতে Syllable বোঝায়। যেমন রাম' শব্দে চারিটি বর্ণ আছে যথা 'র্ আ ম্ অ'। কিন্তু দুটি অক্ষর আছে 'রা,' এবং 'ম'। নিম্নে সাতটি বৈদিক ছন্দের মোট অক্ষর সংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে,—

গায়ত্রী—২৪
উষ্ণিক্—২৮
অনুষ্টুপ্—৩২
বৃহতী—৩৬
পঙ্‌ক্তি—৪০
ত্রিষ্টুপ্—৪৪
জগতী—৪৮

সাধারণতঃ প্রতি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের চারিটি করিয়া পাদ আছে এবং প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা সাধারণতঃ সমান থাকে; যেমন অনুস্টুপ্ ছন্দের মোট অক্ষর সংখ্যা বত্রিশ অতএব চার পাদের প্রতিপাদে আটটি করিয়া অক্ষর থাকিবে। এই চারিপাদ বা চারিচরণের ব্যতিক্রম দুটি ছন্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়, গায়ত্রী এবং পঙ্‌ক্তি। গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রে সাধারণতঃ তিনটি করিয়া পাদ থাকে; প্রতি পাদে আটটি অক্ষর। কখনও কখনও চারিটি পাদ ও প্রতি পাদে ছয় অক্ষর (মোট চব্বিশ) দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ পঙ্‌ক্তি ছন্দের চারিচরণের প্রতি পাদে দশটি করিয়া অক্ষর; মোট চল্লিশ অক্ষর। কখনও কখনও পঙ্‌ক্তি ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের পাঁচটি পাদ এবং প্রতি পাদে আটটি করিয়া অক্ষরও দৃষ্ট হয়। দ্বিজাতিগণ নিত্য যে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেন তাহার আসল নাম সাবিত্রী মন্ত্র কারণ সবিতার স্তুতি ও ধ্যান সেই মন্ত্রে আছে। মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দে রচিত বলিয়া গায়ত্রী নামও পাইয়াছে। গায়ত্রী ছন্দের নিয়ম অনুযায়ী চব্বিশটি অক্ষর এই মন্ত্রে থাকা উচিত কিন্তু একটি অক্ষর কম আছে, মোট তেইশটি অক্ষর আছে। চব্বিশ সংখ্যা পূরণ জন্য পিঙ্গল ঋষি তাঁহার ছন্দঃ

সূত্রে বিধান দিয়াছেন 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্' পদটিতে 'বরেণ্যম্' কথাটি 'বরেণিঅম্' পাঠ করিতে হইবে; তাহাতে অক্ষর সংখ্যা আট হইবে এই পাদে এবং সর্বসমেত চব্বিশ হইবে। ঋগ্‌বেদে 'ত্রিষ্টুপ্' ছন্দ সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। কোনও কোনও দেবতার এক একটি ছন্দ নির্দিষ্ট আছে। অগ্নির মন্ত্র গায়ত্রী ছন্দে নিবদ্ধ। ইন্দ্রের মন্ত্র ত্রিষ্টুপ ছন্দে নিবদ্ধ। অগ্নির সঙ্গে গায়ত্রী ছন্দের এবং ইন্দ্রের সঙ্গে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের নিত্য সম্বন্ধ বলা চলে। ঋগ্‌বেদের প্রথম সূক্তটি অগ্নিদেবতার এবং তাহা গায়ত্রী ছন্দে রচিত। প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্র,

'১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
অগ্নি মীড়ে পুরোহিতং
৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বি জং
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
হোতারম্ রত্নধাতমম্ ॥'

চব্বিশটি অক্ষর, অতএব গায়ত্রী ছন্দ।

লৌকিক ছন্দকে গণছন্দ বলা হয়, তাহা অক্ষর ছন্দ হইতে পৃথক। তাহাতে তিন তিনটি অক্ষর লইয়া এক একটি গণ হয় এবং গুরু লঘু প্রভৃতি বর্ণের বিশেষ সন্নিবেশে এক একটি গণের নামকরণ হয়। যেমন, তিনটিই যদি পর পর গুরুবর্ণ বসে তাহাকে সংক্ষেপে 'ম' গণ বলা হয়; তিনটি পর পর লঘু বর্ণ বসে তাহাকে 'ন' গণ বলে। প্রথম বর্ণ গুরু এবং পরের দুটি যদি লঘু হয় অর্থাৎ 'গুরু লঘু লঘু' হয় তাহাকে 'ভ' গণ বলে। একটি পদ্য স্তবকের এই ভিন্ন ভিন্ন গণের যত প্রকার সন্নিবেশ সম্ভব ততগুলি গণ ছন্দ আছে।

বিনিয়োগ :—যজ্ঞকর্মে মন্ত্রের প্রয়োগকে বিনিয়োগ বলে। বিশেষরূপে নিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ বিনিয়োগ। যজ্ঞকর্মের সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ হইল বিনিয়োগ। 'অনেনেদং তু কর্তব্যং বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ' অর্থাৎ এই মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞের এই কর্ম করিতে হইবে এই যে মন্ত্রের প্রয়োগ ইহাই বিনিয়োগ। কোন্ যাগের কোন্ বিশেষ অনুষ্ঠানে কোন্ মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহার বিধান শ্রৌতসূত্র গ্রন্থরাজিতে প্রদত্ত আছে। সায়ণাচার্য্য তাঁহার বেদের ভাষ্যে প্রতিমন্ত্রের বিনিয়োগ শ্রৌতসূত্র প্রবচন উদ্ধৃতি করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। সামান্য (general) ও বিশেষ (particular) ভেদে বিনিয়োগ দুই প্রকার। সমগ্র সংহিতার ব্রহ্মযজ্ঞে (বেদ পারায়ণে) বিনিয়োগকে সামান্য বিনিয়োগ

বলে। প্রতিসূক্তের ও সূক্তগত মন্ত্রের আশ্বলায়ন প্রদর্শিত বিনিয়োগ হইল বিশেষ বিনিয়োগ। বিশেষ বিনিয়োগ কয়েক প্রকারের হইতে পারে, যথা, সমগ্র সূক্তের বিনিয়োগ, সূক্তের অন্তর্গত তিনটি বা চারটি ঋকের সামূহিক বিনিয়োগ অথবা এক একটি ঋকের পৃথক বিনিয়োগ। নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইবে। ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের শতোত্তর পঞ্চদশতম (১১৫ সংখ্যক) সূক্তটি সূর্য দেবতার উদ্দিষ্ট। 'চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং' সূক্তটির প্রথম ঋকের প্রথম চরণ। এই সূক্তটির ও তদ্‌গত ঋক্‌ বিশেষের বিনিয়োগ সম্বন্ধে সায়ণ বলিতেছেন, আশ্বিনশস্ত্রে সূর্যোদয়াদূর্ধ্বং সৌর্যানি সূক্তানি শংসনীয়ানি। তত্রেদং সূক্তং শংসনীয়ম্। সূত্রিতঞ্চ 'চিত্রং দেবানাম্ নমো মিত্রস্য (আ. শ্রৌ. সূ ৬-৫-১৮) ইতি।' ইহার অর্থ এই ;—সোমযাগে যেদিন সোমরস নিষ্কাশন করা হয় তাহাকে সূত্যাদিন কহে। তৎপূর্বদিনের রাত্রির শেষাংশে বহু মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি, উষা ও অশ্বিযুগল এই দেবতাত্রয়ের স্তুতি করা হয়। এই স্তুতির নাম প্রাতরনুবাক। গানরহিত স্তুতিকে শস্ত্র কহে। সোম যাগের সাতটি সংস্থা। অনুষ্ঠানের প্রকার বিশেষকে সংস্থা বলে। সাতটি সংস্থার যথাক্রমে নাম—অগ্নিষ্টোম, অত্যাগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম। প্রতি পর্যায়ে চারিটি করিয়া শস্ত্রের কীর্তন (শংসন) হয়। তিনটি পর্যায় শেষ হইলে আশ্বিনশস্ত্র কীর্তন করিতে হয়। সেই আশ্বিন শস্ত্রে অগ্নি, উষা ও অশ্বিযুগলের স্তুতি বিহিত। বিহঙ্গকুলের কলকাকলি আরম্ভ হইবার পূর্বে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রাতরানুবাক সমাপ্ত করিতেই হইবে। সূর্যোদয়ের পর আশ্বিনশস্ত্রে সূর্যদেবতানিষ্ঠ সূক্ত সকলের কীর্তন বিহিত। তন্মধ্যে এই সূর্যসূক্তটিও শংসন করিতে হইবে। আশ্বলায়ন তাঁহার শ্রৌতসূত্র গ্রন্থের ৬-৫-১৮ সূত্রে এই বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতঃপর এই সূর্যসূক্তগত ঋক্‌সকলের বিশেষ বিনিয়োগ সম্বন্ধে সায়ণ বলিতেছেন,—'আদিত-স্তিস্র ঋচঃ সৌর্যস্য পাশোর্বপা পুরোডাশ হবিষাং ক্রমেণানুবাক্যাঃ। ততো দ্বে বপাপুরোডাশয়োর্যাজ্যে।' এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্‌ যথাক্রমে সূর্যদেবতার উদ্দিষ্ট পশুর মেদ, পুরোডাশ ও হবিগ্রহণের সময় অনুবাক্যা রূপে কীর্তনীয়। পরবর্তী দুইটি ঋক্‌ অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্‌ যথাক্রমে পশুর বপা বা মেদ এবং পুরোডাশ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিদান কালে যাজ্যারূপে পাঠ করিতে হইবে। দেবতাকে স্মরণ করিয়া পুরোহিত যখন হবন বা আহুতির জন্য হাতায় আহুতির দ্রব্য গ্রহণ করেন তখন যে ঋক পাঠ করা হয় তাহা

'অনুবাক্যা।' 'হবিগ্রহণাবসরে উচ্যমানা ঋক্ অনুবাক্যা'। যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি অর্পণ কালে পাঠ করা হয় যে ঋক্ তাহার নাম 'যাজ্যা'। 'হবিঃপ্রক্ষেপাবসরে উচ্যমানা ঋক্ যাজ্যা।' অনুবাক্যা অগ্রে পাঠ করিতে হয়, তৎপর যাজ্যা। অনুবাক্যা মন্ত্র দাঁড়াইয়া ব্যাহরণ করিতে হয় এবং যাজ্যামন্ত্র উপবিষ্ট হইয়া ব্যাহরণ করার বিধি ('অনুবাক্যা তিষ্ঠন্নাহ, আসীনো যাজ্যাং যজোতি')। 'হবি' শব্দের অর্থ 'হূয়তে ইতি হবিঃ।' যাহা কিছু যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয় তাহাই হবি। পশু মাংস, পিষ্ট তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ নামক রুটি, সোমরস, আজ্য বা ঘৃত সকলই 'হবি' শব্দবাচ্য। এই সকল হব্য দ্রব্যের মধ্যে আজ্যের আধিক্য ও প্রচলন হেতু পরবর্তীকালে 'হবি' শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া ঘৃত শব্দের বোধক হইয়া দাঁড়ায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেদ পাঠের বিবিধ প্রকার

ঋক্ সংহিতার মন্ত্রমধ্যে যাহাতে কালবশে কোনও প্রক্ষিপ্ত অংশ বা বিকার প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য ঋষিগণ বিবিধ উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তৃতীয়-পরিচ্ছেদে আমরা দেখাইয়াছি কিভাবে শ্রদ্ধেয় শৌনক তাঁহার চরণ-ব্যূহ গ্রন্থে সংহিতার সূক্ত সংখ্যা, ঋক্ সংখ্যা, ঋকের পদসংখ্যা ও সমগ্রসংহিতার অক্ষর সংখ্যা পর্যন্ত গণনা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগে এতাদৃশ গবেষণাকার্য মানব-চিন্তার অতীত এবং নিরতিশয় প্রশংসনীয়। বেদরক্ষার্থ ও প্রক্ষেপনিবারণার্থ এইভাবে সূক্ত-ঋক্-পদ-অক্ষর সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি একটি অক্ষরের স্থানে অপর অক্ষর বসাইয়া দিলে অক্ষর সংখ্যা ঠিক থাকিবে কিন্তু প্রক্ষেপ নিবারিত হইবে না। তাহার প্রতিষেধের উপায় কি? এই আশঙ্কাও বৈদিকযুগের ঋষিদের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল এবং তাহার প্রতিষেধের জন্য তাঁহারা বেদমন্ত্রের বিবিধ প্রকারের পাঠরীতি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের এই আশ্চর্য বিচার বুদ্ধি ও ভূয়োদৃষ্টি পর্যালোচনা করিলে বর্তমান যুগের মনীষীগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইতে বাধ্য। বেদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য—তাঁহাদের এই উদ্ভাবনী শক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনও জাতির ধর্মগ্রন্থ-রক্ষার ঐতিহ্যে অদ্যাবধি দৃষ্ট হয় নাই। অধুনা

আমরা বেদপাঠের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিচয় দান করিব। ঋগ্‌বেদের মন্ত্র আমরা যে আকারে সংহিতায় পাই তাহা ঐরূপ সন্ধিযুক্ত সমাসবদ্ধ ভাবে পাঠ করিলে তাহাকে সংহিতা পাঠ কহে। সর্বসমেত একাদশ প্রকারের পাঠ আছে, তন্মধ্যে তিনটিকে প্রকৃতিপাঠ ও আটটিকে বিকৃতিপাঠ বলে। সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, ও ক্রমপাঠ এই তিনটি হইল প্রকৃতিপাঠ, তন্মধ্যে সংহিতাপাঠকে যোগা প্রকৃতি এবং অন্য দুইটিকে রূঢ়া প্রকৃতি বলা হয়। আটটি বিকৃতি পাঠের নাম জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ এবং ঘন। ইহাদের প্রত্যেকের নামের পূর্বে 'ক্রম' শব্দটি পাঠ করিতে হয় অর্থাৎ ক্রমজটাপাঠ, ক্রমমালাপাঠ এইরূপ বলিতে হইবে। সংক্ষেপে জটাপাঠ, মালাপাঠ, শিখাপাঠ ইত্যাদি বলা হয়। ব্যাড়ীমুনি তাঁর জটাপটল গ্রন্থে উপরি উক্ত বিষয়টি শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

'জটা-মালা-শিখা-লেখা ধ্বজো দণ্ডোরথোঘনঃ।
অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্বা মনীষিভিঃ॥'

এই একাদশ প্রকারের পাঠের মধ্যে সংহিতাপাঠের পরেই পদপাঠ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঐতরেয় আরণ্যকে পদপাঠ দৃষ্ট হয় সুতরাং পদপাঠ ঐতরেয় আরণ্যক, ঋক্ প্রাতিশাখ্য নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থের কাল অপেক্ষা পূর্ববর্তী। বিকৃতিপাঠগুলির মধ্যে জটাপাঠ ও দণ্ডপাঠ গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশিষ্ট বিকৃতি পাঠের উৎস, শিখাপাঠ জটাপাঠকে অনুসরণ করে এবং মালা, লেখা, রথ ও ধ্বজ পাঠের উৎস হইতেছে দণ্ডপাঠ। ঘনপাঠের উৎস জটা ও দণ্ড উভয়ই। এখন আমরা এই তিনপ্রকার প্রকৃতিপাঠ ও আট প্রকারের বিকৃতিপাঠ, সর্বসমেত একাদশ প্রকারের বেদমন্ত্রপাঠের অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার পাঠের লক্ষণ দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দিব। ঋগ্‌বেদের প্রথম ঋক্‌টিকেই আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিব। প্রথম ঋক্‌টি আমাদের সুবিদিত,—

'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্॥
হোতারং রত্নধাতমম্॥' (ঋ ম-১.১.১)

এই ঋকের একাদশ প্রকার পাঠভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদর্শিত হইতেছে,—

(১) <u>সংহিতাপাঠ</u>:—বেদের সংহিতাভাগে মন্ত্রটি যেমন লিপিবদ্ধ আছে অবিকল সেইভাবে পাঠ করাকেই সংহিতা পাঠ বলে। অতএব উল্লিখিত ঋক্‌টি যেরূপ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে সংহিতাপাঠে ঠিক তদ্রূপই পাঠ করিতে হইবে।

সংহিতাপাঠ

পদপাঠ

(২) পদপাঠ :—একটি ঋকের প্রত্যেকটি পদ বা শব্দ স্বতন্ত্ররূপে সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া ও সমাসবদ্ধ পদকে ব্যস্ত করিয়া দেখান হইয়াছে। আলোচ্য ঋক্‌টির পদপাঠ এইরূপ হইবে,—

'অগ্নিম্। ঈড়ে। পুরঃ S হিতম্।
যজ্ঞস্য। দেবম্। ঋত্বিজম্।
হোতারম্। রত্ন S ধাতমম্॥'

এই পদপাঠে 'পুরোহিতম্' ও 'রত্নধাতমম্' সমাস দুইটিকে ব্যস্তরূপে দেখান হইয়াছে যথা 'পুরঃ S হিতম্' এবং 'রত্ন S ধাতমম্', ইহার মধ্যে ব্যাসসূচক "S" চিহ্নটিকে অবগ্রহ বলে। শাকল্যঋষি ঋগ্বেদের পদপাঠ রচনা করিয়াছেন; তজ্জন্য ইহাকে শাকল্য সংহিতাও বলা হয়। তিনি ঋক্‌সংহিতার সকল মন্ত্রের পদপাঠ রচনা করিয়াছেন, কেবল ছয়টি ঋকের পদপাঠ রচনা করেন নাই, সেই ছয়টি ঋক্ হইল ৭-৫৯-১২, ১০-২০-১, ১০-১২১ ১০, ১০-১৯০-১, ২, ৩; কেন করেন নাই তাহা জানা যায় না; কেহ কেহ বলেন তিনি এই ছয়টি ঋক্ মূলসংহিতার অন্তর্গত কিনা এ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন।)

ক্রমপাঠ

(৩) ক্রমপাঠ :—ক্রমপাঠে একটি ঋকের দুইটি করিয়া পদ (words) এক একবারে গৃহীত হয় এবং প্রথম পদ ও অন্তিম পদ ব্যতীত মধ্যবর্তী সকল পদই দুইবার করিয়া পঠিত হয়। যথা,—

'অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতং যজ্ঞস্য।
যজ্ঞস্য দেবম্। দেবম্ ঋত্বিজম্। ঋত্বিজং হোতারম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥'

এই ক্রমপাঠে প্রথম পদ 'অগ্নিম্' এবং অন্তিম পদ 'রত্নধাতমম্' ব্যতীত প্রতিপদ দুইবার করিয়া পঠিত হইয়াছে। আক্ষরিক প্রতীকের মাধ্যমে ক্রমপাঠকে এই ভাবে বুঝান যাইতে পারে—

এক দুই, দুই তিন, তিন চার, চার পাঁচ, পাঁচ ছয়, ছয় সাত, সাত আট ইত্যাদি। ক্রমপাঠ প্রক্ষিপ্ত নিবারণের একটি উপায় সন্দেহ নাই কিন্তু প্রথম ও অন্তিম পদ দুটির দ্বিত্ব না হওয়ায় এই দুইটি পদের প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। এই সম্ভাবনা পরবর্তী জটাপাঠনামক পাঠের রীতিতে নিরাকৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় বেদের ধারক ও বাহক ঋষিগণ কিরূপ সূক্ষ্মদর্শী ও তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ছিলেন। ক্রমপাঠকে ইংরাজিতে 'step text' বলা হয় অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে এক একটি পদ দুইবার করিয়া গৃহীত হইয়াছে।

(৪) জটাপাঠ :—বস্ত্রবয়নে বা পশমবয়নে যেমন টানাপোড়েন ব্যবহৃত হয় জটাপাঠের রীতি অনেকাংশে তদ্রূপ বলিয়া ইংরাজিতে ইহাকে কেহ কেহ 'Woven text' আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে প্রথম ও অন্তিম পদ দুইটি তিনবার করিয়া এবং মধ্যবর্ত্তী পদগুলি প্রতিটি ছয়বার করিয়া উচ্চারিত হয়, যথা,—

জটাপাঠ

'অগ্নিম ঈড়ে, ঈড়ে অগ্নিম, অগ্নিম ঈড়ে
ঈড়ে পুরোহিতং, পুরোহিতম্ ঈড়ে, ঈড়ে পুরোহিতম্
পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য
যজ্ঞস্য দেবং, দেবং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য দেবম

এইভাবে চলিবে। আক্ষরিক প্রতীকে জটাপাঠ এইরূপ দাঁড়াইবে,—

এক দুই, দুই এক, এক দুই, দুই তিন, তিন দুই, দুই তিন,
তিন চার, চার তিন, তিন চার, চার পাঁচ,
পাঁচ চার, চার পাঁচ, পাঁচ ছয়, ছয় পাঁচ, পাঁচ ছয়, ইত্যাদি।

(৫) মালাপাঠ :—ইহাকে ইংরাজিতে 'Garland Text' বলা হয়। ইহার পাঠরীতি কঠিন। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ পাঠ করিয়াই তৎপর ষষ্ঠ পদ ও পঞ্চম পদ পাঠ করিতে হয়; তৎপর পুনরায় দ্বিতীয় পদ ও তৃতীয় পদ; তৎপর পঞ্চম পদ ও চতুর্থ পদ। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ব্যতীত এই দুরূহ পাঠরীতি আয়ত্ত করা কঠিন। অগ্নিমীড়ে... ঋকের মালাপাঠ এইরূপ,—

মালাপাঠ

'অগ্নিম্ ইড়ে, ঋত্বিকং দেবম্। ঈড়ে পুরোহিতং, দেবং যজ্ঞস্য
পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতম্। যজ্ঞস্য দেবং
পুরোহিতম ঈড়ে। দেবম ঋত্বিজম, ঈড়ে অগ্নিম।'

এই পাঠের আক্ষরিক রূপায়ন এইরূপ হইবে,—

এক দুই ছয় পাঁচ ॥ দুই তিন পাঁচ চার ॥ তিন চার চার তিন।
চার পাঁচ তিন দুই ॥ পাঁচ ছয় দুই এক ॥ ইত্যাদি।

পাঁচ ছয় রকমের ফুলের মালা গাঁথিতে হইলে যেমন ঐ কয়রকম ফুলকেই ঘুরিয়া ফিরিয়া গাঁথিতে হয় এই পাঠক্রমেও তদ্রূপ পাঁচ ছয়টি পদের পুনঃ পুনঃ যথাক্রম এবং বিপরীতক্রমে পাঠ করিতে হয় বলিয়া ইহাকে মালা পাঠ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই তত্ত্ব নিম্নের শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে,—

'মালা মালেব পুষ্পাণাং পদানাং গ্রন্থিনী হিসা।
আবর্ত্তন্তে ত্রয়স্তস্যাং ক্রম-ব্যুৎক্রম-সংক্রমাঃ॥'

(৬) লেখাপাঠ :—ইহাকে ইংরাজিতে 'Line Text' বলা হয়। ক্রম-পাঠের বিপর্য্যাস ইহাতে দৃষ্ট হয় ; কখনও দুইটি পদ, কখনও তিনটি পদ একত্রে পাঠ করা হয়, যথাক্রম ও বিপরীতক্রম উভয়রূপে। আলোচ্য ঋকটির লেখাপাঠ এইরূপ দাঁড়াইবে,—

লেখাপাঠ

'অগ্নিম্ ঈড়ে, ঈড়ে অগ্নিম্ : অগ্নিম্ ঈড়ে ;

ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য ; যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ ঈড়ে ;

ঈড়ে পুরোহিতম্ ; পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য' ইত্যাকারে পঠিত হয়।

আক্ষরিক প্রতীক এইরূপ হইবে,—

এক দুই, দুই এক, এক দুই ॥ দুই তিন চার ; চার পাঁচ দুই ;

দুই তিন ; তিন চার, ইত্যাদি।

লেখা পাঠের লক্ষণ নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

'ক্রমাদ্ দ্বিত্রিচতুঃ-পঞ্চপদক্রমমুদাহরেৎ।

পৃথক্ পৃথক্ বিপর্যস্য লেখামাহুঃ পুনঃক্রমাৎ ॥'

লেখাপাঠকে রেখাপাঠও বলা হয়।

(৭) শিখাপাঠ :—ইহা জটাপাঠের অনুরূপ, কেবল এই পার্থক্য যে জটাপাঠে দুটি করিয়া পদ এক একবারে উচ্চারিত হয় ; ইহাতে মধ্যে মধ্যে অথবা তৃতীয় চরণে, ষষ্ঠ চরণে, নবম চরণে তিনটি করিয়া পদ থাকে। যথা,—

শিখাপাঠ

'অগ্নিম্ ঈড়ে ॥ ঈড়ে অগ্নিম্ ॥ অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্ ॥

ঈড়ে পুরোহিতম্ ॥ পুরোহিতম্ ঈড়ে ॥ ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য ॥

পুরোহিতং যজ্ঞস্য ॥ যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ ॥ পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ॥

যজ্ঞস্য দেবম্ ॥ দেবং যজ্ঞস্য ॥ যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্ ॥'

এই প্রকারে পাঠ চলিতে থাকিবে। ইহার পাঠক্রম অক্ষর প্রতীকে বুঝাইতে হইলে এইরূপ দাঁড়াইবে,—

'এক দুই ॥ দুই এক ॥ এক দুই তিন ॥

দুই তিন ॥ তিন দুই ॥ দুই তিন চার ॥

তিন চার ॥ চার তিন ॥ তিন চার পাঁচ ॥

চার পাঁচ ॥ পাঁচ চার ॥ চার পাঁচ ছয় ॥'

এইরূপ চলিবে।

(৮) ধ্বজপাঠ,—ইহাতে প্রথমে অবিকল ক্রম পাঠের ন্যায় ছয়টি পদ উচ্চারণ করিয়া তৎপর বিপরীত ক্রমে সেই ছয়টি পদের পাঠ বিহিত ; যথা—

ধ্বজপাঠ

অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতং যজ্ঞস্য।
পুরোহিতং যজ্ঞস্য। ঈড়ে পুরোহিতম্। অগ্নিম্ ঈড়ে॥
যজ্ঞস্য দেবম্। দেবম্ ঋত্বিজম্। ঋত্বিজং হোতারম্।
ঋত্বিজং হোতারম। দেবম ঋত্বিজম। যজ্ঞস্য দেবম।

ইহাতে প্রথম চরণ ঠিক ক্রম পাঠের অনুযায়ী। দ্বিতীয় চরণ তাহার বিপরীত। তৃতীয় চরণ ক্রম পাঠ অনুযায়ী, চতুর্থ চরণ তাহার বিপরীত। এইভাবে ধ্বজপাঠের উচ্চারণ ক্রম চলিতে থাকিবে। ইহার আক্ষরিক রূপায়ণ এইরূপ,—

এক দুই, দুই তিন, তিন চার। তিন চার, দুই তিন, এক দুই। চার পাঁচ, পাঁচ ছয়, ছয় সাত। ছয় সাত, পাঁচ ছয়, চার পাঁচ। এই ভাবে চলিতে থাকিবে।

(৯) দণ্ডপাঠ :—ইহাতে ক্রম পাঠের দুটি দুটি পদ যথাক্রমে তিন তিনবার উচ্চারিত হয়, কেবল দ্বিতীয়বার বিপরীত ক্রমে পাঠ করিতে হয়, যথা—

দণ্ডপাঠ

'অগ্নিম ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম্। অগ্নিম ঈড়ে।
ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতম্ ঈড়ে অগ্নিম্।'

ইত্যাকারে পাঠ চলিতে থাকিবে। আক্ষরিক রূপ এইভাবে হইবে,—

এক দুই॥ দুই এক॥ এক দুই
দুই তিন॥ তিন দুই এক॥

দণ্ড পাঠের লক্ষণ নিম্নের শ্লোকে নিবদ্ধ আছে ;—

'ক্রমমুক্তা বিপর্যস্য পুনশ্চ ক্রমমুক্তরম্।
অর্ধর্চাদেব মুক্তোঽয়ং ক্রমদণ্ডোঽভিধীয়তে॥'

(১০) রথপাঠ :—ক্রমপাঠের ধারা এবং তাহার বিপরীত ধারা এই দুইটি মিশ্রিত করিয়া রথপাঠের সৃষ্টি হইয়াছে। রথপাঠ দুই প্রকারের হইতে পারে, একটি চরণের একপাদ বা এক অংশ ধরিয়া অথবা সমগ্র চরণ ধরিয়া।

রথপাঠ

(i) প্রথম প্রকারটি এইরূপ হইবে :—

সমিধাগ্নিম্ অগ্নিং সমিধা॥ ঘৃতৈর্বোধয়েৎ, বোধয়েৎ ঘৃতৈঃ সমিধা অগ্নিম্॥ ইহার আক্ষরিক রূপ হইবে,—এক দুই দুই এক। তিন চার, চার তিন, এক দুই॥

(ii) দ্বিতীয় প্রকারটি এইরূপ :—

অগ্নিম্ ঈড়ে যজ্ঞস্য দেবম্ ॥ ঈড়ে অগ্নিম্ দেবং যজ্ঞস্য ॥ অগ্নিম্ ঈড়ে ঈড়ে পুরোহিতম্ ॥ যজ্ঞস্য দেবং দেবম্ ঋত্বিজম্ ॥ ইহার আক্ষরিক রূপ হইবে—এক দুই চার পাঁচ ॥ দুই এক পাঁচ চার ॥ এক দুই দুই তিন ॥ চার পাঁচ পাঁচ চার ॥

(১১) ঘনপাঠ :—ইহাতে প্রথম চারিটি পদ দুইটি দুইটি করিয়া ঠিক জটা পাঠ অনুযায়ী পাঠ করিতে হয় ; তৎপর তিনটি করিয়া পদ যথাক্রমে, বিপরীতক্রমে ও বিপর্যস্তভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। যথা,—

ঘনপাঠ

'অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম্। অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্।
পুরোহিতম্ ঈড়ে অগ্নিম্। অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্।
ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতম্ ঈড়ে। পুরোহিতং যজ্ঞস্য।
যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য।...

এই ভাবে চলিবে। পাঠরীতির আক্ষরিক রূপ এই,—

এক দুই। দুই এক। এক দুই তিন। তিন দুই এক। এক দুই তিন। দুই তিন। তিন দুই। দুই তিন চার। চার তিন দুই। দুই তিন চার। তিন চার। চার তিন। তিন চার পাঁচ। পাঁচ চার তিন। তিন চার পাঁচ। এই রূপ চলিতে থাকিবে।

উপরে উল্লিখিত একাদশ প্রকার পাঠকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে,—নির্ভুজ এবং প্রতৃণ। সংহিতায় যেরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ বা শ্রুতিধৃত আছে অবিকল তদ্রূপে পাঠ করাকে নির্ভুজ পাঠ কহে এবং তাহা হইতে ব্যতিক্রম হইলেই তাহাকে প্রতৃণ পাঠ বলা হয়। অতএব কেবলমাত্র সংহিতা পাঠই নির্ভুজের অন্তর্ভুক্ত, অবশিষ্ট পদ, ক্রম, জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ ও ঘন নামক দশ প্রকারের পাঠই প্রতৃণ পাঠের অন্তর্ভুক্ত হইবে। মূলের অবিকল পাঠ একমাত্র সংহিতা পাঠেই রহিয়াছে তজ্জন্য উহাই একমাত্র নির্ভুজ পাঠ বলিয়া গণ্য।

সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্বে যখন এইসকল বিভিন্ন পাঠরীতি সৃষ্টি হইয়াছিল তখন ছাপাখানা বা মুদ্রণযন্ত্রও ছিল না এবং লিখন রীতিও প্রচলিত হয় নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অধিকাংশ বিদ্বানের মতে খৃষ্ট পূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে ভারতে লিখন বিদ্যা (Art of writing) ছিল না। চারি সহস্র বর্ষ পূর্বে এতগুলি বেদ-মন্ত্রের এত প্রকার বিভিন্ন পাঠ ও জটিল পাঠ কেবল মুখে মুখে শ্রবণ করিয়া—তদানীন্তন আর্যগণ শ্রুতিতে যথাযথ ধারণ করিতেন এবং

এইভাবে পূর্বাচার্যগণের মাধ্যমে উত্তর সাধকগণ সমুদ্রতুল্য বিশাল বৈদিক বাঙ্ময় অবিকৃতরূপে লাভ করিয়াছেন। যে অলোকসামান্য অমানবীয় প্রতিভাবলে, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞায় বৈদিক আচার্যগণ এই বিশাল বেদ শাস্ত্র বিভিন্ন পাঠ সহ কণ্ঠস্থ করিয়া অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ও প্রক্ষেপাদিদোষ নিবারণার্থ অক্লান্ত সারস্বত সাধনাবলে ও লোকোত্তরমনীষাসহকারে বেদরক্ষার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া উত্তর সাধকদিগকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে মানব বিস্ময়ে হতবাক হইবে, সুপ্রাচীন কালের ভারতীয় আর্যগণের মনীষার জয়গানে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিবে।

সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, ক্রমপাঠ প্রভৃতি নানা প্রকারের বেদপাঠের ফলশ্রুতি ও প্রশংসা শিক্ষাগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষায় কয়েকটি শ্লোকে এই সকল বিভিন্ন পাঠের প্রশস্তি করা হইয়াছে,—

বিভিন্ন প্রকারের পাঠের ফল ও প্রশস্তি

'সংহিতানয়তে সূর্যপদং চ শশিনঃ পদম্।
ক্রমশ্চ নয়তে সূক্ষ্মং যত্তৎপদমনাময়ম্॥
কালিন্দী সংহিতা জ্ঞেয়া পদযুক্তা সরস্বতী।
ক্রমেনাবর্ত্ততে গঙ্গাশম্ভোর্বানীতু নান্যথা॥
যথা মহাহ্রদং প্রাপ্য ক্ষিপ্তো লোষ্ট্রো বিনশ্যতি।
এবং দুশ্চরিতং সর্বং বেদে ত্রিবৃত্তি মজ্জতি॥'

সংহিতা, পদ ও ক্রম এই তিন্ প্রকার পাঠের ফল প্রশংসাচ্ছলে ঋষি বর্ণনা করিতেছেন। (সংহিতাপাঠের দ্বারা সূর্যলোক, পদপাঠের দ্বারা চন্দ্রলোক এবং ক্রমপাঠের দ্বারা সূক্ষ্ম অক্ষয় লোক লাভ করা যায়।) সংহিতাপাঠ কালিন্দী বা যমুনা স্বরূপ, পদপাঠ সরস্বতী স্বরূপ এবং ক্রমপাঠ গঙ্গাস্বরূপ অর্থাৎ তত্তৎনদীতে স্নানের ফল দান করে; মহাদেবের এই বাক্য কখনও অন্যথা হইবার নহে। মহাহ্রদের গভীর জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ সংহিতাপদ ক্রমানুযায়ী বেদ পাঠ করিলে সকল পাপ বিধৌত হইয়া যায়। মানুষের যাহাতে প্রবৃত্তি হয় তজ্জন্য এইভাবে উপাদেয় ও পুণ্য কর্মের প্রশংসা বেদাঙ্গে, ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যাহার প্রশংসা করা হয় তদ্রূপ কর্মে মানুষের প্রবৃত্তি হয় এবং যাহার নিন্দা করা হয় তাহার প্রতি সাধারণতঃ মানুষের বিমুখতা আসে। মীমাংসা-দর্শনের বিবিধ ন্যায়ের মধ্যে একটি ন্যায় 'যৎ স্তূয়তে তদ্ বিধীয়তে যন্নিন্দ্যতে তন্নিষিধ্যতে' অর্থাৎ যাহার প্রশংসা করা হয় তাহাকে বিধি রূপে স্থাপন করা হয়, তাহার অনুষ্ঠানের জন্য প্রণোদিত করা হয়;

যাহার নিন্দা করা হয় তাহার অনুষ্ঠানের নিষেধ করা হয়; যাহা প্রশংসিত তাহা বৈধ বা বিহিত, যাহা নিন্দিত, তাহা নিষিদ্ধ। এই সকল প্রশংসাকে সাধারণতঃ অর্থবাদ বলা হয়। সূর্যলোকপ্রাপ্তি, চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি, প্রভৃতি প্রশংসার আক্ষরিত অর্থ উদ্দিষ্ট নহে, প্রশংসাচ্ছলে তৎপ্রতি বেদাধ্যায়ীকে আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য; এই জাতীয় প্রশংসাকে এইজন্য অর্থবাদ বলে। বিধিবাক্যের সঙ্গে বিধির প্রশংসাত্মক যে বাক্য অনুগমন করে তাহা অর্থবাদ; আক্ষরিক অর্থ তাহার লক্ষ্য নহে, বিধির স্তুতিব্যাজে বিধির প্রতি অনুষ্ঠাতার চিত্তের আনুকূল্য সম্পাদনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেদের স্বর (Accent)

লৌকিক সংস্কৃত হইতে বৈদিক সংস্কৃতের একটি বিশেষ পার্থক্য হইতেছে, লৌকিক সংস্কৃতে স্বরের, Accent এর প্রয়োগ নাই, বৈদিক সংস্কৃতে স্বর একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বরের জ্ঞান না থাকিলে কেবল যে বেদ পাঠ অশুদ্ধ হয়, তাহা নহে, অর্থবোধেরও ব্যাঘাত ঘটে। একই শব্দের বর্ণরাশির উপর পৃথক্ পৃথক্ স্বরের প্রয়োগ পৃথক্ পৃথক্ হয়। সাধারণতঃ বেদে তিনটি স্বরের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। পাণিনি এই তিনটি স্বরের লক্ষণ দিয়াছেন,—

উদাত্ত—'উচ্চৈরুদাত্তঃ' (Acute or Raised Accent)

অনুদাত্ত—'নীচৈরনুদাত্তঃ' (Grave Accent)

স্বরিত—'সমাহারঃ স্বরিতঃ' (Circumflex Accent)

উদাত্ত অর্থাৎ স্বরের উত্থান এবং তাহার বিপরীত হইল অনুদাত্ত, ন উদাত্ত অর্থাৎ স্বরের যে স্থলে উত্থান নাই। উদাত্ত ও অনুদাত্তের মাঝামাঝি হইল স্বরিত স্বর। উদাত্ত স্বর হইতেও সামান্য ঊর্দ্ধে উঠিয়া ('উদাত্তাদপি উদাত্ততরা') ক্রমশঃ অনুদাত্তের দিকে তার গতি।

বেদমন্ত্রে কয়েকটি চিহ্নের দ্বারা এই তিনটি স্বর প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋক্‌-সংহিতার প্রথম ঋক্ দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে,—

'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।'

দুই প্রকারের স্বরচিহ্ন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। বর্ণের নিম্নের চিহ্নগুলি যথা—অ, পু, য, ইত্যাদি অনুদাত্ত স্বরের জ্ঞাপক। বর্ণের উপরের দণ্ডবৎ চিহ্নগুলি যথা—মী, হি, স্য, ইত্যাদি স্বরিত স্বরের জ্ঞাপক এবং যে সকল বর্ণে কোনও স্বরের চিহ্ন নাই সেইগুলির স্বর উদাত্ত বুঝিতে হইবে। উদাত্তস্বর-বোধক কোনও চিহ্ন নাই। যেগুলি অনুদাত্তও নহে স্বরিতও নহে সেগুলি উদাত্ত। বেদে স্বর-প্রয়োগের বিধি সম্বন্ধে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে সূত্র রচনা করিয়াছেন। স্বরের জ্ঞান না থাকিলে বেদমন্ত্রের যথার্থ অর্থ বহুস্থলে প্রতীত হয় না।

'স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগোঽর্থ এব চ
মন্ত্রং জিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্য পদে পদে ॥'

বেদমন্ত্রের যথার্থ জ্ঞানের জন্য স্বর, বর্ণ, অক্ষর, মাত্রা বিনিয়োগ এবং অর্থের জ্ঞান পদে পদে আবশ্যক।

যদি মন্ত্র ব্যাহরণে স্বরের ভ্রান্তি ঘটে, অর্থ অন্যরূপ হইয়া যাইবে; এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে একই পদে স্বরভেদে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন 'ইন্দ্রশত্রু' পদটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে দুই রকম সমাসভেদে। 'ইন্দ্রস্য শত্রু'—'ইন্দ্রের শত্রু' ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলে 'ইন্দ্রের শত্রু' অর্থ হইবে। আবার 'ইন্দ্রঃ শত্রুঃ যস্য' ইন্দ্র যার শত্রু, বহুব্রীহি সমাস করিলে বিপরীত অর্থ হইবে। লৌকিক সংস্কৃতে কালের স্রোতে স্বরচিহ্ন লুপ্ত হওয়ায় স্বরহীন (Accentless) 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দ উচ্চারণ করিলে বুঝিবার উপায় নাই, ইহা—তৎপুরুষ সমাস, না বহুব্রীহি সমাস; কিন্তু বেদমন্ত্রে স্বরচিহ্ন থাকায় উচ্চারণ মাত্র বুঝা যাইবে ইহা কোন্ সমাস হইবে। যদি পদটির আদিতে উদাত্ত (আদ্যুদাত্ত) স্বর থাকে তাহা হইলে বহুব্রীহি হইবে এবং যদি অন্তে উদাত্ত (অন্তোদাত্ত) স্বর থাকে তাহা হইলে তৎপুরুষ সমাস হইবে। এই 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দটি লইয়া একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে; তাহাতে স্বরের ভুলে কিরূপ বিপর্যয় ঘটিতে পারে তাহা দেখান হইয়াছে। ইন্দ্রের প্রতি আক্রোশবশতঃ বৃত্রাসুরের পিতা বর প্রার্থনা করিলে তাহাকে প্রত্যহ 'ইন্দ্রশত্রুবর্দ্ধস্ব' মন্ত্রে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতে বলিলেন। এখানে শত্রুর অর্থ ঘাতক এবং তৎপুরুষ সমাস হইবে; অর্থ হইবে ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ ইন্দ্রের ঘাতক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। তৎপুরুষ সমাসের

স্বরের সহিত অর্থের সম্বন্ধ

অন্তে উদাত্ত হইবে। পাণিনি সমাসস্য (৬-১-২২৩) সূত্রে ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু বৃত্রাসুরের পিতা ভুল করিয়া প্রত্যহ বৃত্রের বলাধান জন্য আহুতি প্রদান কালে 'ইন্দ্রশত্রু' পদটির আদিতে উদাত্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। ফলে উহা বহুব্রীহি হইয়া পড়ে এবং অর্থ দাঁড়ায় 'ইন্দ্র শত্রু (ঘাতক) যাহার'; তাঁহার এই বিষমভ্রান্তি জন্য বৃত্রের বলাধান না হইয়া ইন্দ্রেরই বলাধান হইতে লাগিল এবং শেষে ইন্দ্রই বৃত্রকে বধ করিলেন। স্বরের ভ্রান্তি হইতে কি দারুণ সর্বনাশ ঘটিতে পারে এই আখ্যায়িকা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নিরুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত নিম্নের শ্লোকের এই আখ্যায়িকাটির উল্লেখ আছে,—

ইন্দ্রশত্রু সম্পর্কে আখ্যায়িকা

'মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ ॥
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥'

অর্থাৎ মন্ত্র ব্যাহরণে যদি স্বরের বা বর্ণের ত্রুটি ঘটে তাহা হইলে ইপ্সিত অর্থ প্রসব করে না। ত্রুটি যুক্ত মন্ত্রের ব্যাহৃতি বজ্র স্বরূপ হইয়া যজমানের ক্ষতি সাধন করে যেমন 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দটির স্বরের বিচ্যুতি ঘটায় বৃত্র ইন্দ্র দ্বারা নিহত হইয়াছিল এবং মন্ত্রের ফল বিপরীত হইয়াছিল। এই শ্লোকটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিতরূপে পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও দৃষ্ট হয়, মাত্র প্রথম চরণটির পাঠ একটু পৃথক। নিরুক্তের প্রথম চরণটি, 'মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা' মহাভাষ্যে 'দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা' পাঠে পর্যবসিত হইয়াছে। কেবল ছন্দোবদ্ধ বা পদ্যময় মন্ত্রেই যে তিন প্রকার স্বর থাকিত তাহা নহে, যজুর্বেদের গদ্যময় অংশে এবং গদ্যে রচিত তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও স্বরের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। একই পদে বর্ণভেদে স্বরাঘাত জন্য অর্থের পরিবর্ত্তন ইংরাজী ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। ইংরাজী শব্দে স্বর বা Accent একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি সরল হইবে। যেমন ইংরাজীতে 'Conduct' শব্দটি বিশেষ্যও (Noun) হইতে পারে, আবার ক্রিয়াপদও (Verb) হইতে পারে। বিশেষ্য হইলে অর্থ হইবে 'আচরণ', এবং ক্রিয়া হইলে অর্থ হইবে 'চালনা করা', এখন 'conduct' শব্দটি কেহ উচ্চারণ করিলে আমরা কি করিয়া বুঝিব ইহা বিশেষ্যপদ অথবা ক্রিয়াপদ। স্বরের প্রয়োগেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিশেষ্য হইলে শব্দটির প্রথমাংশে স্বরাভিঘাত হইবে Con´-duct অর্থ হইবে আচরণ।

ইংরাজী ভাষায় স্বরের গুরুত্ব

ক্রিয়াপদ হইলে শব্দটির শেষাংশে স্বরাভিঘাত হইবে con-duct,—অর্থ হইবে চালনা করা।

সংস্কৃত ভাষায় "তে" শব্দটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। যদি 'তদ্' শব্দের প্রথমার বহুবচন হয়, অর্থ হইবে 'তাহারা' আর যদি যুষ্মদ্ শব্দের ষষ্ঠীর একবচন হয় অর্থ হইবে 'তোমার'। লৌকিক সংস্কৃতে স্বর না থাকায় কেহ 'তে' শব্দ উচ্চারণ করিলে কোন্ অর্থটি বক্তার অভিপ্রেত ধরা কঠিন কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে ইহা শ্রবণ মাত্র বলিতে পারা যায় অভিপ্রেত অর্থ কোন্‌টি। যদি স্বরযুক্ত হয় তবে অর্থ হইবে 'তাহারা', যদি স্বরযুক্ত (Accented) না হয়, অর্থ হইবে 'তোমার'। এইরূপ 'ভূমন্' শব্দের প্রথমাংশে (first syllable) স্বরাঘাত হইলে পৃথিবী এবং অন্তিমাংশে (final syllable) স্বরাঘাত হইলে অর্থ হইবে ভূমা অর্থাৎ প্রাচুর্য।

সংস্কৃতে যেমন একই শব্দ 'ইন্দ্রশত্রু' স্বরের স্থানভেদে দুইটি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে গ্রীক্ ভাষাতেও তদ্রূপ বহুশব্দ স্বরের স্থান পরিবর্তনে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। গ্রীক্‌ভাষায়, বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীক্‌ভাষায় স্বরের প্রয়োগ অতি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীক্ "Patroktonos" শব্দটির দুটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ সম্ভব যথা 'পিতৃহন্তা' এবং 'পিতা কর্তৃক হত'; উপান্তে স্বরাঘাত হইলে 'পিতৃহন্তা' অর্থ হইবে এবং উপান্তের পূর্বাংশে স্বরাঘাত হইলে অর্থ হইবে 'স্বীয় পিতা কর্তৃক হত'। গ্রীক্ 'Lithobolos' শব্দটির উপান্তাংশে স্বরাঘাত হইলে অর্থ হইবে 'প্রস্তর নিক্ষেপ করা' কিন্তু উপান্তের পূর্বাংশে (antepenult) স্বরাঘাত হইলে অর্থ হইবে,—'নিক্ষিপ্ত প্রস্তর কর্তৃক আহত'।

গ্রীক্ ভাষায় স্বরের গুরুত্ব

পাণিনি সূত্রে বলা হইয়াছে দূর হইতে কাহাকেও আহ্বান করার সময় প্লুতস্বর প্রয়োগ করা হয়। আরও অন্য কারণ আছে। বৈদিক যজ্ঞের মন্ত্রে প্লুত স্বরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা অধ্বর্যু যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দানের পূর্বে হোতাকে মন্ত্র শুনাইবার জন্য 'ও শ্রাংবয়' শব্দে অনুরোধ জানান। কথঞ্চিৎ দূর হইতে অধ্বর্যু হোতাকে এই উক্তি করেন বলিয়া প্লুত স্বরের প্রয়োগ হইয়াছে।

প্লুতস্বর :—প্লুতস্বরের প্রয়োগ বেদে দৃষ্ট হয়। হ্রস্ব স্বরবর্ণ পাঁচটি— অ, ই, উ, ঋ, ৯ এবং দীর্ঘ স্বরবর্ণ আটটি—আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ ঐ, ও ঔ। উচ্চারণে হ্রস্ব স্বরবর্ণ একমাত্রা বিশিষ্ট এবং দীর্ঘ স্বরবর্ণ দ্বিমাত্রা বিশিষ্ট। প্লুতস্বর তিনমাত্রাবিশিষ্ট কিন্তু প্লুতস্বর লিখিবার

প্লুতস্বরের বৈশিষ্ট্য

জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর বা বর্ণ নাই। দীর্ঘস্বর বোধক স্বরের উত্তর "৩" (তিন) লিখিয়া সেই বর্ণের প্লুতত্ব ও ত্রিমাত্রা বুঝান হয়। হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘ অবস্থা হইল দীর্ঘস্বর ; উহা আরও দীর্ঘ রূপে উচ্চারণ করিলে প্লুত হয়। এই জন্য প্লুতস্বরের ত্রিমাত্রা। আ৩, ঈ৩, ঊ৩, ঋ৩, এ৩, ঐ৩, ও৩, ঔ৩ এই সাতটি প্লুতস্বর। ব্যঞ্জন বর্ণের মাত্রা অর্ধ।

'একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে
ত্রিমাত্রস্তু ভবেৎ প্লুতো ব্যঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকম্।'

হ্রস্ব স্বরের একমাত্রা, দীর্ঘস্বরের দুইমাত্রা, প্লুতের তিনমাত্রা এবং ব্যঞ্জন বর্ণের অর্ধমাত্রা। কুক্কুট বা মোরগের ডাকের সহিত প্লুতস্বরের তুলনা করা হইয়াছে। মোরগের ডাকের স্বর গ্রামে গ্রামে চড়িতে থাকে, প্রথমে একমাত্রা ও শেষাংশে তিনমাত্রা প্লুতে পরিণত হয়।

মোরগের যতগুলি সংস্কৃত প্রতিশব্দ আছে তন্মধ্যে একটি হইল 'কৃকবাকু'। বেদাঙ্গ নিরুক্ত গ্রন্থে যাস্কাচার্য 'কৃকবাকু' শব্দটিকে কুক্কুটের ধ্বনির অনুকৃতি (onomatopoetic) বলিয়াছেন। মোরগের এই প্রতিশব্দটিকে 'কৃ-ক-বা-কু৩' এইভাবে যথাধ্বনি পাঠ করিলে মোরগের ডাকের অনুকৃতি সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। মোরগের ডাক লক্ষ্য করিয়া ইংরাজী 'Cock-a-doodle-doo' কথাটিতেও এই কুক্কুট ধ্বনির অনুকৃতি সুব্যক্ত।

শারীরিক বিকলতা জনিত বেদপাঠের অনধিকার :—যথারীতি বেদপাঠ করিতে হইলে জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত প্রভৃতি বিকলতারহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, নচেৎ বিশুদ্ধ উচ্চারণ হইতে পারে না। বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি বেদপাঠে অনধিকারী। যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষায় বলা হইয়াছে,—

'ন করালো ন লম্বোষ্ঠো নাব্যক্তো নানুনাসিকঃ।
গদ্‌গদো বদ্ধজিহ্বশ্চ ন বর্ণান্ বক্তুমর্হতি।'

অর্থাৎ, যাঁহার বদন করাল, ওষ্ঠ লম্বা, যাঁহার স্বর অনুনাসিক, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ (অস্পষ্ট) ও জিহ্বা জড় (তোত্‌লা) তাঁহার বর্ণোচ্চারণ কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া তিনি বেদপাঠে অনধিকারী। অধিকারীর লক্ষণ নিম্নের শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে,—

বেদপাঠে অনধিকারীর শারীরিক লক্ষণ

"প্রকৃতির্যস্যকল্যাণী দন্তোষ্ঠৌ যস্য শোভনৌ।
প্রগল্‌ভশ্চ বিনীতশ্চ স বর্ণান্ বক্তুমর্হতি॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা—

যাঁহার প্রকৃতি শান্ত, দন্ত ও ওষ্ঠ সুগঠিত, যাঁর উচ্চারণ সুস্পষ্ট এবং যাঁর প্রকৃতি বিনয়গুণ সম্পন্ন অথবা যিনি সংযমী (বিনীত) তাদৃশ ব্যক্তি বেদপাঠে অধিকারী।

বেদপাঠে অধিকারীর শারীরিক লক্ষণ

শিক্ষাগ্রন্থে পাঠের চতুর্দ্দশ প্রকার দোষ এবং ছয় প্রকার গুণের উল্লেখ আছে। চতুর্দ্দশ প্রকার দোষের তালিকায় যাজ্ঞবল্ক্য এই দোষগুলির নাম করিয়াছেন,—অক্ষর সম্বন্ধে শঙ্কা, ভীতি, উচ্চস্বর, অব্যক্ত বা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, অনুনাসিকস্বর, কর্কশকণ্ঠ, মূর্দ্ধিস্বর অর্থাৎ অত্যুচ্চ উচ্চস্বর, স্থান ভ্রষ্ট উচ্চারণ (যথা কণ্ঠস্বর জিহ্বা দ্বারা, তালব্যস্বর দন্তদ্বারা উচ্চারণ), কুস্বর, বিরসকণ্ঠ, বিশ্লিষ্ট (এক অক্ষরে অনেক অক্ষরের উচ্চারণ), বিষমরূপে অক্ষরকে আঘাত করিয়া উচ্চারণ, ব্যাকুল হইয়া পাঠ ও তালহীন বা লয়হীন ভাবে পাঠ করা।

রীতিভ্রষ্ট বেদপাঠের চতুর্দ্দশদোষ

পাণিনি শিক্ষায় পাঠের ছয়টি গুণ কীর্তিত হইয়াছে,—

মাধুর্য্যমক্ষরব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্তু সুস্বরঃ।
ধৈর্য্যং লয়সমর্থঞ্চ ষড়েতে পাঠকাঃ গুণাঃ॥

মধুর কণ্ঠে পাঠ প্রতি অক্ষরের সুস্পষ্ট উচ্চারণ, পদচ্ছেদ করিয়া পাঠ, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতাদি যথাস্বরে পাঠ, ধৈর্য্যের সহিত পাঠ ও লয়যুক্ত পাঠ,—এই ছয়টি পাঠের গুণ।

যথারীতি বেদপাঠের ছয়টি গুন

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেদাঙ্গ

বেদাঙ্গ ছয়টি,—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ। এই ছয়টি বেদাঙ্গকে বেদের ষড়ঙ্গ বা ছয়টি অঙ্গ বলা হয়। প্রধানের বা অঙ্গীর যাহা উপকারক তাহাকে অঙ্গ বলে। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষৎ যথারীতি পাঠের, তাহাদের অর্থবোধের এবং বিনিয়োগের সহায়ক এই ছয় বেদাঙ্গ। অঙ্গী বেদের শব্দবোধ, অর্থবোধ, ক্রিয়ার সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ, পাঠের রীতি, প্রভৃতি ব্যাপারে অপরিহার্য বলিয়াই ইহাদের বেদের অঙ্গ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক একটি অঙ্গের দ্বারা এক এক প্রকার প্রয়োজন সাধিত হয়। উপনিষদ্ গ্রন্থরাজি প্রকাশের পূর্বেই বেদাঙ্গ প্রকাশিত বা বিরচিত হইয়াছিল কারণ উপনিষদে ছয় বেদাঙ্গের নাম দৃষ্ট

হয়।)যথা, প্রসিদ্ধ মুণ্ডকোপনিষদের সূচনাতেই পরা ও অপরা উভয় প্রকার বিদ্যার উল্লেখ করিয়া অপরা বিদ্যার দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে ঋষি চারি বেদ ও ছয় বেদাঙ্গের নাম করিয়াছেন,—

'তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষম্।' (১-১)

ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব এই চারিটি বেদকে এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গকে অপরা বিদ্যা বলিয়াছেন, এবং যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম লাভ করা যায় তাহাকে পরা বিদ্যা বলিয়াছেন। বেদ এবং বেদাঙ্গকে যে অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে তাহা হেয় অর্থে নহে; কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলেই শাস্ত্রবেদ্য পরমপুরুষকে লাভ করা যায় না; যদি যাইত তাহা হইলে প্রত্যেক শাস্ত্র-পাঠকারীর ব্রহ্মলাভ হইত। ব্রহ্মদর্শন জন্য আত্মজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। বেদ, বেদাঙ্গ বা শাস্ত্রপাঠ আস্তিক্যবুদ্ধির দৃঢ়তা সম্পাদন করে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইতে পারে না। এই অর্থে 'অপরা বিদ্যা' বলা হইয়াছে। ছয়টি বেদাঙ্গকে বেদের ছয়টি অঙ্গরূপে পাণিনীয় শিক্ষায় বর্ণনা করা হইয়াছে ;—

'ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥'

(পাণিনীয় শিক্ষা, ৪১, ৪২)

অর্থাৎ ছন্দ বেদের পদদেশ, কল্প বেদের হস্তযুগল, জ্যোতিষ বেদের চক্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা নাসিকা, এবং ব্যাকরণ বেদের মুখ। এই ছয়টি অঙ্গ সহ বেদ অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। অঙ্গ ব্যতীত যেমন অঙ্গীর বা শরীরধারীর পরিচয় অসম্ভব তদ্রূপ বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদের সম্পূর্ণ পরিচয় সম্ভব নহে।

শিক্ষা ;—ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষাকে প্রথমে স্থান দেওয়া হইয়াছে। যে শাস্ত্রে বেদের বর্ণ, স্বর, মাত্রা, ইত্যাদির যথাযথ উচ্চারণ ও প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকে শিক্ষা কহে। ইংরাজিতে শিক্ষাকে phonetics (ধ্বনি বিজ্ঞান) বলা হয়। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম, সন্তান এই বিষয়গুলির আলোচনা শিক্ষাগ্রন্থে আছে। প্রত্যেক বেদের পৃথক পৃথক 'শিক্ষা' আছে। তৈত্তিরীয় শাখার উপনিষদের সূচনাতেই 'শিক্ষাং

ব্যাখ্যাস্যামঃ',—'শিক্ষা ব্যাখ্যা করিব' বলা হইয়াছে। শিক্ষাগ্রন্থ 'অকার' প্রভৃতিকে স্পষ্টরূপে বর্ণ বলিয়াছে। 'ক, খ, গ, ঘ, ঙ' প্রভৃতি যে ক্রমে আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ পাঠ করি পাণিনি ব্যাকরণে শিবসূত্রে সেই ক্রম পাওয়া যায় না। পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন ঋক্ প্রাতিশাখ্যে এই ক্রম দৃষ্ট হয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতভেদে তিনটি স্বরের লক্ষণ ও প্রয়োগবিধি শিক্ষায় উক্ত হইয়াছে। "বেদের স্বর" শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা স্বরের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত তিনটি মাত্রার লক্ষণ ও প্রয়োগবিধি শিক্ষায় উপদিষ্ট হইয়াছে। অল্প কালে হ্রস্ব, ততোধিক দীর্ঘ এবং গান ও দূর হইতে আহ্বানাদি ক্ষেত্রে অতি দীর্ঘ কালে প্লুতমাত্রা প্রযুক্ত হয়। উচ্চারণস্থান ও প্রযত্ন প্রভৃতিও এই বেদাঙ্গের বিষয়। স্বরের ভুল উচ্চারণ জন্য কিরূপ বিষম বিপত্তি ঘটিতে পারে তাহাও "বেদের স্বর" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেক বেদের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষাগ্রন্থ ছিল কিন্তু অধুনা সকল শিক্ষাগ্রন্থ পাওয়া যায় না। সামবেদের 'নারদ-শিক্ষা', শুক্ল যজুর্বেদের 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' এবং অথর্ববেদের 'মাণ্ডুকীশিক্ষা' উবট ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের বিশিষ্ট শিক্ষাগ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই; পাণিনীয় শিক্ষাকেই ঋগ্‌বেদের শিক্ষারূপে ধরা হয়।

শিক্ষা নামক বেদাঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ বেদের প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের বিষয় পরে আলোচনা করিব।

কল্প ;—যাহা দ্বারা যজ্ঞাদি কল্পিত, সমর্থিত হয় তাহাকে কল্প বলে। বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যাগ্‌যজ্ঞাদির বিবরণ বহুবিস্তৃত এবং নানা আখ্যায়িকা জড়িত। তাহার আখ্যায়িকা প্রভৃতি অংশ বাদ দিয়া কেবল যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রক্রিয়াদি লইয়া সূত্রাকারে যে সকল গ্রন্থ রচিত তাহাকেই কল্প সূত্র বা 'কল্প' নামক বেদাঙ্গ বলা হয়। কল্পসূত্রের দুইটি মুখ্য বিভাগ,—শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিহিত ও বিবৃত শ্রৌত যাগের বিধি, নিয়মাদি যে সকল সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে তাহাদের শ্রৌতসূত্র বলা হয় এবং গৃহস্থের করণীয় সংস্কার ও যাগাদি যাহাতে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ আছে তাহাদের গৃহ্যসূত্র বলে। হোম, ইষ্টি, পশু ও সোম চতুর্বিধ প্রকৃতি যাগের ও তাহাদের 'অঙ্গ' যাগের বিধান শ্রৌতসূত্রে দৃষ্ট হয়। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণ-মাস, অশ্বমেধ, ও সর্ববিধ পশুযাগ, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাবতীয় শ্রৌত যাগ এই চারিপ্রকার প্রকৃতি-যাগের অন্তর্গত। গৃহস্থের করণীয় পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং গর্ভাধান হইতে প্রেতকৃত্য অবধি সর্ববিধ সংস্কারের বিধান গৃহ্যসূত্রে নিহিত আছে। ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদ-স্বাধ্যায়,

নৃযজ্ঞ বা অতিথিসেবা, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ এবং ভূতযজ্ঞ এই পাঁচটিকে পঞ্চমহাযজ্ঞ বলে।

প্রত্যেক বেদের পৃথক্ পৃথক্ কল্পসূত্র অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র আছে। গৃহ্যসূত্রের সমতুল্য তৃতীয় প্রকারের আর এক সূত্রসাহিত্য কল্পসূত্রের অন্তর্ভুক্তরূপে পরিগণিত হয়। তাহার নাম ধর্মসূত্র। ধর্মসূত্রে ধর্মসম্বন্ধীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয়বিধ বিধিনিষেধাদি লিপিবদ্ধ আছে। চতুর্বর্ণ ও চারি আশ্রম সংক্রান্ত বিধি নিয়ম ধর্মসূত্রকারগণ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

চারিবেদের যতগুলি শাখা ছিল ততগুলি শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ও ধর্মসূত্র ছিল। 'বেদের শাখা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা দেখাইয়াছি সুপ্রাচীনকালে চারিবেদের শাখার সমষ্টি সংখ্যা একহাজার তিনশত মত ছিল কিন্তু তাহার অধিকাংশই পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। প্রতিশাখার পৃথক্ পৃথক্ শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্রাদি ছিল; সুতরাং শাখাও যেরূপ অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে, তত্তৎশাখানিষ্ঠ শ্রৌতসূত্র প্রভৃতিও তদ্রূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সকল শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র পাওয়া যায় নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল।

ঋগ্বেদ
- (i) শ্রৌতসূত্র ;—আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন।
- (ii) গৃহ্যসূত্র ;—আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন,
- (iii) ধর্মসূত্র ;—বসিষ্ঠ (?)

সামবেদ
- (i) শ্রৌতসূত্র ;—লাট্যায়ন বা মর্শক অথবা আর্ষেয়কল্প, দ্রাহ্যায়ন, জৈমিনীয়,
- (ii) গৃহ্যসূত্র ;—দ্রাহ্যায়ন, গোভিল, জৈমিনীয় খাদির,
- (iii) ধর্মসূত্র ;—গৌতম,

কৃষ্ণযজুর্বেদ
- (i) শ্রৌতসূত্র ;—বৌধায়ন, আপস্তম্ব, মানব, সত্যাষাঢ় বা হিরণ্যকেশী, বৈখানস,
- (ii) গৃহ্যসূত্র ;—বৌধায়ন, আপস্তম্ব, মানব, হিরণ্যকেশী, ভারদ্বাজ, বারাহ, কাঠক, লৌগাক্ষি, বৈখানস, বাধুল,
- (iii) ধর্মসূত্র ;—মানব, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী বৈখানস।

শুক্লযজুর্বেদ
- (i) শ্রৌতসূত্র ;—কাত্যায়ন,
- (ii) গৃহ্যসূত্র ;—পারস্কর বা বাজসনেয়ি,
- (iii) ধর্মসূত্র ;—শঙ্খলিখিত,

অথর্ববেদ { (i) শ্রৌতসূত্র ;—বৈতান,
(ii) গৃহ্যসূত্র ;—কৌশিক,
(iii) ধর্মসূত্র ;—পঠিনাসী

এইগুলি ব্যতীত ঋগ্‌বেদের পরশুরাম কল্পসূত্র, কৃষ্ণযজুর্বেদের বাধূলসূত্র ও আপস্তম্বপরিভাষাসূত্র এবং সামবেদের আর্ষেয় কল্পসূত্র মুদ্রিত হইয়াছে। বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র ঋগ্‌বেদীয় কিনা ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশের মতে ইহা ঋগ্‌বেদেরই ধর্মসূত্র। বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রের টীকাকার গোবিন্দ-স্বামীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

কল্পসূত্রের অন্তর্গত এই তিন প্রকার সূত্র গ্রন্থ ব্যতীত চতুর্থ প্রকারের আর এক সূত্র সাহিত্য দৃষ্ট হয়, তাহার নাম শুল্বসূত্র। বিবিধ প্রকারের যজ্ঞবেদী প্রভৃতি নির্মাণকালে ভূমি পরিমাপ এবং বৃত্তাকার, অর্দ্ধবৃত্তাকার, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণাকৃতি প্রভৃতি বিবিধ আকার নির্দ্ধারণ জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা হইত তাহা শুল্বসূত্রে লিপিবদ্ধ আছে। 'শুল্ব' শব্দের অর্থ পরিমাপজন্য ব্যবহৃত রজ্জু খণ্ড। বৈদিকযুগে আর্য্যগণের জ্যামিতিশাস্ত্রজ্ঞানের নিদর্শনরূপে ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে শুল্বসূত্রের স্থান গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা গেল, কল্প নামক বেদাঙ্গ বলিতে শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র বোধ্য। সকল বেদের কল্পের চারিপ্রকার সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় না ; কোনও কোনও বেদের পাওয়া যায় ; যেমন কৃষ্ণযজুর্বেদের চারিপ্রকার সূত্রসাহিত্য পাওয়া যায়। যথা,—বৌধায়ন রচিত শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্বসূত্র এবং আপস্তম্ব রচিত এই চারি প্রকার সূত্রগ্রন্থ। শুক্ল যজুর্বেদের কাত্যায়ন শুল্বসূত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যাগনিরত আর্যদের, ধর্মসূত্রে, ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতিনিষ্ঠ নাগরিক (Citizens) আর্যদের এবং গৃহ্যসূত্রে গার্হস্থ্যাশ্রমবাসী আর্যদের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, বিধি নিয়ম প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে এই তিন প্রকারের সূত্রসাহিত্য বা এককথায় সমগ্র কল্পসূত্রসাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জীবনযাত্রার ইতিহাসের অমূল্য ও অপরিহার্য আকর।

নিরুক্ত ;—ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা যাস্ক নামক ঋষিকর্তৃক রচিত। নির্ নিঃশেষরূপে পদসমূহ যাহাতে উক্ত হইয়াছে তাহাকে নিরুক্ত বলা হয়। নিরুক্তের তিনটি ভাগের নাম যথাক্রমে—নৈঘণ্টুক কাণ্ড, নৈগম কাণ্ড এবং দৈবত কাণ্ড। অনুক্রমণিকাভাষ্যে এই তিনটি বিভাগের উল্লেখ আছে,—

'আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।
তৃতীয়ং দৈবতঞ্চেতি সমাম্নায়স্ত্রিধা স্থিতঃ॥'

এই তিনটি বিভাগকে নিরুক্তের তিনটি কাণ্ড বলা হয়। প্রতি কাণ্ডের কয়েকটি করিয়া অধ্যায় আছে। নৈঘণ্টুক কাণ্ডের পাঁচটি অধ্যায়, নৈগম কাণ্ডের ছয়টি অধ্যায় এবং দৈবত কাণ্ডের ছয়টি অধ্যায়, সর্বসমেত এই সপ্তদশ অধ্যায় নিরুক্ত গ্রন্থে আছে।

নৈঘণ্টুক কাণ্ড বা নিঘণ্টু:—প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের নাম নৈঘণ্টুক কাণ্ড বা সংক্ষেপে নিঘণ্টু। ইহাকে শব্দার্থ কাণ্ড বলা যায়। সমানার্থক বা পর্যায় শব্দের উপদেশ এই কাণ্ডে আছে।

একই অর্থ নির্দেশকারী অর্থাৎ সমানার্থক পর্যায় শব্দরাশির উপদেশ যে গ্রন্থে আছে তাহার নাম নিঘণ্টু। অমরকোষ, বৈজয়ন্তী, হলায়ুধ প্রভৃতি কোষ গ্রন্থে এই ভাবেই নিঘণ্টু শব্দটি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সমানার্থক শব্দ ও অনেকার্থক শব্দ পৃথকরূপে নিঘণ্টুতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিঘণ্টুর প্রথম কাণ্ডে যে সকল পর্যায়শব্দে (Synonyms) সমাবেশ হইয়াছে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইতেছে। পৃথিবীবাচক একুশটি শব্দের তালিকা আছে, যথা, গো, গ্মা, জ্‌মা, ক্ষ্মা, ক্ষা, ক্ষমা, ক্ষোণী, ক্ষিতি, অবনি, উর্বী, পৃথ্বী, মহী, রিপ, অদিতি, ইলা, নিঋতি, ভূ, ভূমি, পূষা এবং গাতু। এইরূপ স্বর্ণের পনেরটি পর্যায়শব্দ, অন্তরিক্ষের ষোলটি, রাত্রির তেইশটি নাম, দিবসের বারটি, উষার ষোলটি নাম,—এইরূপ বহুবিষয়ের পর্য্যায়শব্দ বেদে যেরূপ আছে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষ্যপদের ন্যায় ক্রিয়াপদের সমানার্থক পর্যায়েরও সমাবেশ হইয়াছে। যথা গমনার্থক ধাতুর 'একশত বাইশটি' পর্যায় আছে। পর্যায়শব্দ ব্যতীত নিঘণ্টুর চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বেদে প্রযুক্ত কতকগুলি শব্দের তালিকা দৃষ্ট হয়।

কিংবদন্তী অনুযায়ী যাস্কাচার্য নিঘণ্টু এবং নিরুক্ত উভয় অংশের গ্রন্থকার এবং উভয় অংশের সম্মিলিত নাম নিরুক্ত। কিন্তু স্কোল্‌ড্‌ (Skold), ডাঃ লক্ষ্মণস্বরূপ প্রভৃতি যে সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষী আজীবন নিরুক্ত সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন ও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের মতে এবং অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে যাস্ক নৈগম ও দৈবত কাণ্ডদ্বয়ের গ্রন্থকার; তিনি নিঘণ্টুর গ্রন্থকার নহেন। যাস্ক নিজেও ইহা প্রকারান্তরে বলিয়া গিয়াছেন। নিঘণ্টুর শব্দ তালিকা সমাপ্ত হইয়া নৈঘণ্টুক কাণ্ডের প্রারম্ভেই যাস্ক বলিতেছেন,—'সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ স ব্যাখ্যাতব্যস্তামিমং সমাম্নায়ং নিঘণ্টব

ইত্যাচক্ষতে'—অর্থাৎ 'শব্দের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন; সেই সমাম্নায় বা শব্দতালিকাকে নিঘণ্টু বলা হয়।' যাস্কের পূর্বেই 'নিঘণ্টু' নামক পাঁচটি অধ্যায় অন্য ঋষি কর্তৃক রচিত হইয়াছে এবং তাহার ব্যাখ্যার নাম নিরুক্ত, তাহা যাস্কবিরচিত। এই নিঘণ্টু যে পরবর্তীকালের অমরকোষ, বৈজয়ন্তী হলায়ুধ, মেদিনীকোষ, প্রভৃতি কোষগ্রন্থের (Lexicography) উৎস তদবিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। নৈঘণ্টুককাণ্ডে যাস্ক নাম, আখ্যাত, নিপাত, শব্দনিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যাকরণনিষ্ঠ বিবিধ আলোচনা করিয়াছেন।

নৈগম কাণ্ড;—'নিগম' শব্দের অর্থ বেদ। যাস্ক স্থানে স্থানে বেদ অর্থে নিগমশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। যথা 'ইত্যপি নিগমো ভবতি' কথাটি কয়েকবারই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার অর্থ 'বেদে এইরূপ আছে।' অতএব বেদে যে সকল শব্দের প্রয়োগ আছে তাহার অধিকাংশ নৈগম নামক দ্বিতীয় কাণ্ডে নির্ণীত হইয়াছে। সেই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি (Etymology) ও অর্থ, দৃষ্টান্ত ও মন্ত্রের বা মন্ত্রাংশের উদ্ধৃতিসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিঘণ্টুমধ্যে একার্থবাচক অনেক শব্দের (Synonyms) যেমন উল্লেখ আছে তেমনই অনেকার্থবাচক একশব্দের (Homonyms) তালিকাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাস্ক নৈঘণ্টুক কাণ্ডে প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলির এবং নৈগমকাণ্ডের প্রারম্ভে দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ আলোচনা করিয়াছেন। সেই শব্দটির প্রয়োগ দর্শনার্থ বেদমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেবল সেই শব্দগুলি নহে, উদ্ধৃত বেদমন্ত্রে অন্যান্য যে সকল শব্দ আছে তাহাদেরও ব্যুৎপত্তি এবং অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। নিঘণ্টুর শব্দতালিকায় 'জহা' শব্দটি আছে, অর্থ 'জঘান' অর্থাৎ বধ করিয়াছিল। এই শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নৈগম কাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে যাস্ক একটি বেদমন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন,—

'কো নু মর্যা অমিথিতঃ সখা সখায়মব্রবীৎ।
জহা কো অস্মদীষতে।'

এই মন্ত্রের কেবল 'জহা' পদটি নহে, মর্যা, অমিথিতঃ ঈষতে প্রভৃতি শব্দেরও ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার কালে রচিত নিরুক্তের এই নৈগমকাণ্ড যে ইদানীন্তন ভাষাতত্ত্বের (philology) প্রথম নিদর্শন এই সত্য কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সকল দেশের সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বৎসমাজ স্ফুট কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

দৈবত কাণ্ড ;—নিরুক্তের তৃতীয় কাণ্ডের নাম দৈবতকাণ্ড। এই কাণ্ডে যাস্ক দেবতাতত্ত্বের বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকভেদে দেবতাদের তিনটি শ্রেণী করিয়া প্রতি দেবতাদের নিবাসস্থান, বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও কার্য, রূপের বর্ণনা, কোন্ দেবতার মন্ত্র কোন্ ছন্দে রচিত ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। সমস্ত নিরুক্ত গ্রন্থটি বিশেষ করিয়া দৈবত কাণ্ডটি অধ্যয়ন করিলে বৈদিকযুগের ঋষির ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও অদ্ভুত গবেষণা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতাদের মধ্যে অগ্নি পৃথিবীতে বিরাজ করেন এবং আমাদের নিকটতম, সূর্য দ্যুলোকে বিরাজ করেন এবং দূরতম। এই অগ্নি ও সূর্যের মধ্যে সকল দেবতা সন্নিহিত। ভূলোকের প্রধান দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষ লোকের প্রধান দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুলোকের বা ব্যোমের প্রধান দেবতা সূর্য বা আদিত্য। এই দেবতাত্রয় পরস্পর স্বতন্ত্র নহে, তাহারা একই মহান্ আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ বিশেষ। যাস্ক বলিতেছেন,—'দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে ; একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি' (দৈবত কাণ্ড ৭-৪) 'দেবতাদের একআত্মা বহুরূপে (বহুনামে) কীর্ত্তিত হয় ; একই আত্মার প্রত্যঙ্গস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা।' দেবতাগণের আকার আছে কিনা, তাঁহার সাকার না নিরাকার তাহাও যাস্ক বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে কোন কোন মন্ত্রে সাকাররূপে বর্ণনা,—কোনও কোনও স্থলে নিরাকার বর্ণনা,—আবার মন্ত্রবিশেষে উভয় প্রকার বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

বেদোক্ত দেবতাগণ প্রাকৃতিক এক একটি প্রপঞ্চ মাত্র (Natural Phenomenon) যেমন মরুৎ ঝঞ্ঝার প্রতীক, রুদ্র বজ্রের প্রতীক, মিত্র দিবাকালীন সূর্য, বরুণ নিশাকালীন সূর্য, 'অপাং নপাৎ' বিদ্যুতের প্রতীক ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন এই জাতীয় ব্যাখ্যা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণই সর্বপ্রথম করিয়াছেন এবং কেহ কেহ এই ব্যাখ্যাকে অসঙ্গতও বলিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য বিদ্বৎকুলের জন্মের দ্বিসহস্রবর্ষপূর্বে যাস্কাচার্য বৈদিক দেবতা ও অসুরের এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। দৈবত কাণ্ডে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্র নামক অসুরের নিধনবার্তা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন,—

'তৎ কো বৃত্রঃ ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ। অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবোকর্মণো বর্ষকর্ম জায়তে। তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি' অর্থাৎ—'কে এই বৃত্র ? আমরা নিরুক্তকারগণ বলি এই বৃত্র মেঘ ছাড়া আর কিছুই নহে। ঐতিহাসিকগণ বলেন ত্বষ্টা নামক অসুরের পুত্র এই বৃত্র। (আমরা মেঘ বলি কারণ) বজ্র বিদ্যুৎ ও জলের সংমিশ্রণে বৃষ্টি

হয়। বজ্রের হুংকার, বিদ্যুতের শাণিত ঝলক ও জলের বর্ষণ সব মিশিয়া যুদ্ধের মতন দেখায় তজ্জন্য ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতেছেন এইভাবে রূপক বর্ণনা করা হইয়াছে।'

বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখও নিরুক্ত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। অন্তরীক্ষের বিদ্যুৎজনিত অগ্নি এবং পার্থিব অগ্নির পার্থক্য দেখাইতে গিয়া—যাস্ক বলিয়াছেন, যে বিদ্যুৎজনিত অগ্নি—'উদকেন্ধনঃ শরীরোপশমনঃ' (নি ৭-২৩) অর্থাৎ বিদ্যুৎ অগ্নি জল হইতে জাত এবং যখন সেই বিদ্যুৎ পৃথিবীতে কোন স্থূল বস্তুর (শরীরের) উপর পতিত হয় তখন নির্বাপিত হয় কিন্তু পার্থিব অগ্নির ধর্ম ঠিক ইহার বিপরীত; তাহা 'উদকোপশমনঃ শরীর-দীপ্তিঃ' অর্থাৎ পার্থিব অগ্নি কাষ্ঠাদি (শরীর) ভূত-প্রপঞ্চকে আশ্রয় করিয়া দীপ্ত হয় কিন্তু জল পড়িলেই নির্বাপিত হয়। Convex lense-এর উল্লেখও দেবতাকাণ্ডে অগ্নির স্বরূপ আলোচনায় দৃষ্ট হয়। 'ঐরূপ মণি (কাচমণি) সূর্যের প্রতিমুখে ধরিয়া রাখিলে সূর্যরশ্মি তাহার মাধ্যমে তীক্ষ্ণীকৃত হইয়া শুষ্ক গোময়াদির উপর পড়িয়া তাহা প্রজ্বলিত করে' (৭-২৩); তদানীন্তন সৌরবিজ্ঞানের উল্লেখও পাওয়া যায়। একস্থানে সূর্য ও চন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—'অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে··· আদিত্যোঽস্য দীপ্তির্ভবতি।' অর্থাৎ 'সূর্যেরই তেজের একাংশ চন্দ্রমাকে প্রদীপ্ত করে। চন্দ্রের যে দীপ্তি তাহা প্রকৃতপক্ষে সূর্যেরই দীপ্তি।'

ব্যাকরণ

বেদ বুঝিবার জন্য ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গের প্রয়োজন যে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। যেমন কোন দেশের বা জাতির সাহিত্য ও ভাষা অনুশীলন করিতে হইলে প্রথমেই সেই ভাষার ব্যাকরণের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক ও অপরিহার্য তদ্রূপ বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে তাহার ব্যাকরণের জ্ঞান প্রথমেই আয়ত্ত করিতে হইবে। প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি ভাষার বিভিন্ন ব্যাকরণঘটিত বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে কখনও কেহ সেই ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না, অতএব সেই ভাষায় রচিত গ্রন্থাদিও তাহার দুরায়ত্ত হইবে। বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে অনেকে ব্যাকরণকেই প্রধান বলিয়াছেন; 'ষড়ঙ্গেষু পুনর্ব্যাকরণং প্রধানম্।' এই একই কারণে ব্যাকরণকে বেদের মুখ বলা হইয়াছে; 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।' 'ব্যাকরণং বৈ মুখং বেদানাম্।' প্রধানকে আয়ত্ত

করিতে পারিলে প্রধানের অঙ্গগুলি সহজেই আয়ত্ত হয় কিন্তু প্রধানকে উপেক্ষা করিয়া অঙ্গগুলি আয়ত্ত করার জন্য যত্ন করিলে তাহা সফল হয় না। প্রধানকে আয়ত্ত করার যত্ন করিতে প্রয়াস পাইলে সফল হওয়া যায় ; 'প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান ভবতি।'

'ব্যাকরণ' শব্দের অর্থ ব্যাকৃত করা, খুলিয়া দেওয়া, ছাড়াইয়া দেওয়া। যাহাকে খুলিয়া দেওয়া হয় নাই, যাহা অখণ্ড রহিয়াছে তাহাকে 'অব্যাকৃত' বলে এবং যাহাকে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে অখণ্ডরূপটি ভাঙ্গিয়া খণ্ড করা হইয়াছে তাহাকে 'ব্যাকৃত' বলে। যথা,—'রামঃ' পদটি অব্যাকৃত, যখন ইহাকে বুঝাইবার জন্য এই অখণ্ডরূপটি প্রকৃতি প্রত্যয় ভাঙ্গিয়া 'রাম সু্' (প্রথমা একবচন) রূপে বুঝান হইল তখন ব্যাকৃত হইল ; যাহার সাহায্যে ব্যাকৃত করা হয় তাহা ব্যাকরণ।

কৃষ্ণযজুর্বেদে বলা আছে, অখণ্ড অব্যাকৃত শব্দকে ইন্দ্র ব্যাকৃত করিয়াছেন। 'বাগ্ বৈ পরাচ্যব্যাকৃতা আসীৎ, তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুরু, ইতি' (৬-৪-৭-৩), অর্থাৎ প্রথমে বাক্ অপ্রত্যক্ষ ও অখণ্ড অব্যাকৃত ছিল ; দেবতাগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, 'আপনি এই অখণ্ড অব্যাকৃত বাককে ব্যাকৃত করুন।' 'তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে' (৬-৪-৭-৩) ইন্দ্র সেই অব্যাকৃত বাকের অখণ্ড শব্দের মধ্যভাগ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে ব্যাকৃত করিলেন ; তজ্জন্য ইহাকে ব্যাকৃতা বাক্ বলা হয়। ভর্তৃহরি স্বরচিত 'বাক্যপদীয়' নামক ব্যাকরণদর্শন বিষয়ক শব্দশাস্ত্রের উত্তম কোটির গ্রন্থে বলিয়াছেন যে অখণ্ড পরমব্রহ্ম যেমন নামরূপে বিবর্ত্তিত অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড প্রপঞ্চ যেমন অখণ্ডপরমাত্মার বিবর্ত্ত তদ্রূপ অখণ্ড অনাহত নাদের বিবর্ত্ত এই অর্থযুক্ত খণ্ড খণ্ড ব্যাকৃত শব্দরাজি।

তিনি ব্যাকরণকে অপবর্গের দ্বার অর্থাৎ মোক্ষলাভের সাধন বলিয়াছেন এবং বিদ্যাস্থানের মধ্যে অতি পবিত্র বাঙ্‌মলের বা শব্দদোষের চিকিৎসকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

'তদ্দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্‌মলানাং চিকিৎসিতম্।
সর্ববিদ্যাপবিত্রোঽয়মধিবিদ্যং প্রকাশতে॥'

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণাদি, মোক্ষমূলক ধর্মগ্রন্থ, অধ্যয়ন ও উপলব্ধিজন্য ব্যাকরণশাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য, অতএব পরম্পরাক্রমে ব্যাকরণ শাস্ত্রও মোক্ষপ্রাপক।

বেদাঙ্গরূপে বর্ত্তমানে পাণিনি রচিত ব্যাকরণই পাওয়া যায়। ব্যাসদেব

রচিত 'ব্যাকরণার্ণব' বা মহেশ্বর রচিত 'মাহেশ' প্রভৃতি পাণিনির পূর্বে বিরচিত কয়েকটি অতি প্রাচীন ব্যাকরণের নাম কিংবদন্তীতে জানা যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সকল ব্যাকরণ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় নাই। পাণিনি ব্যতীত কলাপ, মুগ্ধবোধ, সারস্বত, রত্নমালা, প্রভৃতি ব্যাকরণে বৈদিক বা বেদশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের আলোচনা নাই ; একমাত্র পাণিনির ব্যাকরণেই বৈদিক ব্যাকরণের আলোচনা দৃষ্ট হয়। বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণঘটিত সূত্র পাণিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাণিনির সূত্ররাশির উপর পরবর্ত্তীকালে বররুচি বার্ত্তিক রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং মহর্ষি পতঞ্জলি খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিশদ ও বিশাল ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। পতঞ্জলির ভাষ্যকে গাম্ভীর্য ও বিশালতার জন্য মহাভাষ্য বলা হয়। ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য বররুচি একটি বার্ত্তিকে বলিয়াছেন,—

'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্' অর্থাৎ রক্ষা, উহ, আগম, লঘুত্ব ও অসন্দেহ এই পাঁচটির জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। মহামতি পতঞ্জলি মহাভাষ্যের পস্পশা নামক বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভূমিকায় এই বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই পাঁচটি প্রয়োজন দৃষ্টান্তসহ প্রাঞ্জলভাবে নিম্নলিখিত প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন ;—

রক্ষা ;—বেদের রক্ষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন। 'রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম' (মহাভাষ্যম্ ১-১-১)। প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, লোপ আগম বর্ণের বিকার, তদ্ধিত, প্রভৃতি যে না জানে সে বেদ অধ্যয়ন করিতে বা বুঝিতে পারিবে না।

উহ ;—যাহা স্পষ্ট ভাষায় কথিত হয় নাই, যাহা মনে মনে উহ অর্থাৎ বিচার করিয়া ঠিক্ করিয়া লইতে হয় তাহাকে উহ বলে। যাহা উহ্য (understood) তাহা নিজে বিচার করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। বেদের মন্ত্রের পদগুলিতে কোনও একটি লিঙ্গ, কোনও একটি বচন ও পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। লিঙ্গভেদে, বচনভেদে ও পুরুষভেদে সেই সেই পদের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে তাহা বেদে উক্ত হয় নাই। যজ্ঞে বিনিয়োগ কালে যখন কোনও মন্ত্রের পদের রূপান্তর সাধনের প্রয়োজন হয় তখন নিজেই তাহা মনে বিতর্ক বা বিচার (উহ) করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকিলে কেহ মন্ত্রগত পদের রূপান্তর করিতে পারিবে না। মূল যজ্ঞকে প্রকৃতি যাগ বলে এবং তাহার সহকারী যাগকে বিকৃতিযাগ বা

অঙ্গযাগ বলে। এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহার কোনও কোনও পদ প্রকৃতি যাগে একরূপ, বিকৃতি যাগে অন্য রূপ ধারণ করে। লিঙ্গের বা বচনের পরিবর্তন ঘটে যেমন কোনও একটি প্রকৃতি যাগে একটি পশু আহুতির প্রয়োজন হয়। সেই পশুকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হয়,—'অন্বেনং মাতা মন্যতামনুপিতানুভ্রাতা' ইত্যাদি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬-৬; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩-৬-৬-১) অর্থাৎ এই পশুর মাতা, পিতা ও ভ্রাতা এই পশুটিকে বধ করার অনুমতি দিন। বিকৃতিযাগে কখনও দুইটি পশু, কখনও বহু পশুর প্রয়োজন হয়। দুইটি পশু হইলে প্রকৃতিযাগে উচ্চারিত মন্ত্রের 'এনম্' (ইহাকে) পদটিকে দ্বিবচনান্তরূপে বিকৃতিযাগে পাঠ করিতে হইবে এবং মন্ত্রটি 'অন্বেনৌ মাতা মন্যতামনুপিতা অনুভ্রাতা' এইরূপ দাঁড়াইবে। বহু পশু হইলে 'এনম্' পদটির বহুবচনের রূপ প্রয়োগ করিতে হইবে, যথা—'অন্বেনান্ মাতা মন্যতামনুপিতা অনুভ্রাতা।' কেবল 'এনম্' শব্দটির বিকৃতি যাগে কোথাও দ্বিবচন কোথাও বহুবচন রূপ হইতেছে কিন্তু মাতৃ বা পিতৃ শব্দ একবচনান্ত রহিয়া যাইতেছে, তাহাদের বিপরিণাম বা রূপান্তর হইতেছে না কারণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ঐ স্থলে স্পষ্ট নির্দেশ আছে 'ন মাতা বর্দ্ধতে ন পিতা'; মাতৃ বা পিতৃ শব্দের বৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বিবচন বা বহুবচন হইবে না। যাহার ব্যাকরণের জ্ঞান নাই সে মন্ত্রগত পদের এইরূপ দ্বিবচন, বহুবচন, প্রভৃতি রূপান্তর করিতে পারিবে না। এই বিপরিণাম বা রূপান্তর করাকে উহ বলে; এতজ্জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন।

আগম;—আগমের জন্যও ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। কোনও কারণ বা প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক বাধ্যতামূলকরূপে ব্রাহ্মণের ছয়টি অঙ্গ সহ বেদ অধ্যয়ন করিতে ও জানিতে হইবে,—'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ'। ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণের প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রধানকে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলে তাহার অঙ্গগুলিও সুখায়ত্ত হয়।

লঘু;—লঘু অর্থাৎ সংক্ষেপ। সংক্ষেপে সহজ উপায়ে ভাষার জ্ঞান আহরণের জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। পূর্ব পূর্ব যুগে যখন মানুষের পরমায়ু সহস্র সহস্র বৎসর ছিল তখন অতি বিস্তৃত ভাবে শব্দশাস্ত্রের অধ্যয়ন সম্ভব ছিল। কথিত আছে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট দেবরাজ ইন্দ্র দিব্য সহস্রবর্ষ ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মানুষের ষাটহাজার বৎসর দেবতাদের মাত্র একবর্ষ কালরূপে গণ্য; তাহাকে দিব্য বর্ষ বা দিব্য একবর্ষ

বলে। এই দিব্য বর্ষ সহস্র অর্থাৎ দেবতাদের একহাজার বৎসর ধরিয়া বৃহস্পতি প্রতিপদের শব্দশাস্ত্র বিশদ্ রূপে ইন্দ্রকে উপদেশ করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতির ন্যায় সর্বশাস্ত্রনিষ্ণাত আচার্য ও ইন্দ্রের ন্যায় কুশাগ্রবুদ্ধি শিষ্যের জন্যই যদি দিব্য বর্ষসহস্রের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে শতায়ু বা স্বল্পায়ু কলিযুগের মানবের পক্ষে বিশাল শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার চিন্তা করাও বাতুলতামাত্র। এই জন্যই প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি পাণিনি শব্দ শাস্ত্রের গাম্ভীর্য, অতিবিস্তার, এবং কলির মানবের স্বল্পায়ুকাল চিন্তা করিয়া অতি সংক্ষেপে শব্দশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এই লঘুতা বা সংক্ষেপের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন।

অসন্দেহ—অসন্দেহার্থ বা সন্দেহনিরসন জন্যও ব্যাকরণের জ্ঞান প্রয়োজন। দীর্ঘ সমাসবদ্ধপদে যখন অনেকগুলি বিশেষ্য ও একটি বিশেষণ প্রযুক্ত হয়; বিশেষণটি কোন বিশেষ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে অনেক সময় সন্দেহ জাগে। যথা, অগ্নি ও বরুণ দেবতার উদ্দিষ্ট যাগে বন্ধ্যা গাভী বলিদান প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—'স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেত' অর্থাৎ অগ্নি ও বরুণ দেবতার উদ্দেশে স্থূল পৃষতী—অনড্বাহী বলি দিবে। 'পৃষতী' শব্দের অর্থ চিত্রিত, চিত্রমৃগের ন্যায় ফুট্‌কী ফুট্‌কী চিহ্নযুক্ত, অনড্বাহী বন্ধ্যাগাভী। 'স্থূল' শব্দটি পৃষতীর বিশেষণ অথবা অনড্বাহীর বিশেষণ এই বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগে—। ফুট্‌কীচিহ্নগুলি স্থূল অথবা গাভীটিই স্থূল—বক্তার তাৎপর্য কি সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় না। ব্যাকরণে বেদের স্বরের প্রয়োগের উপদেশ আছে এবং সেই স্বরপ্রয়োগের জ্ঞান যাহার আছে সে সহজেই অর্থ ধরিতে পারিবে। যদি 'স্থূলপৃষতী' পদটির অন্তে উদাত্তস্বর থাকে তবে কর্মধারয় সমাস হইবে, 'স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ' অর্থাৎ গাভীটি স্থূল এবং চিত্রিত এই অর্থ হইবে। যদি সমাসঘটক পদগুলির পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হয় তাহা হইলে বহুব্রীহি সমাস হইবে এবং ব্যাসবাক্য দাঁড়াইবে 'স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ' অর্থাৎ যাহার গায়ের ফুট্‌কীচিহ্নগুলি বড় বড়। অতএব দেখা গেল ব্যাকরণের জ্ঞান যাদের আছে সে অর্থ ধরিতে পারিবে; অবৈয়াকরণ পারিবে না। এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে লৌকিক সংস্কৃতে স্বরের প্রয়োগ লুপ্ত হওয়ায় বৈদিক সংস্কৃতের ন্যায় অর্থ সুস্পষ্ট হয় না, সন্দেহ থাকিয়া যায়। যেমন—'সুন্দরশিশুনয়নং পশ্য', সুন্দর শিশুনয়ন দেখ এই সমাসে 'সুন্দর' শব্দটি শিশুর বিশেষণ অথবা নয়নের বিশেষণ বলা কঠিন। বক্তার তাৎপর্য জানিতে পারিলে বা প্রকৃত স্থল (context) জানিলে বলিতে

পারা যায় ; কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে প্রকৃতস্থল না দেখিয়া বক্তার তাৎপর্য না জানিয়াও শব্দটির উচ্চারণ মাত্র স্বরাঘাত শ্রবণে অর্থ নির্ণয় করা যায়।

ব্যাকরণশাস্ত্রের এই পাঁচটি মুখ্য প্রয়োজন ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনের কথাও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি উল্লেখ করিয়াছেন। শিষ্ট ব্যক্তির কখনো ম্লেচ্ছভাষা বা অপশব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে। বিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণ কখনও দেবভাষাকে অশুদ্ধভাবে ম্লেচ্ছদের ন্যায় উচ্চারণ করিবেন না, অপভাষা ব্যবহার করিবেন না—'ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ' যাহা অপশব্দ তাহাই ম্লেচ্ছ। 'ম্লেচ্ছো হ বা যদপশব্দঃ।' এই ম্লেচ্ছভাষা বা অপভাষা পরিহার জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান আবশ্যক। লোকসমাজে সাধুশব্দ অপেক্ষা অপশব্দ বা অপভ্রংশের প্রচলন বেশী। যেমন 'গো' শব্দটি সাধু এবং গাবী, গোণী গোতা, গোপোতলিকা প্রভৃতি প্রচলিত শব্দ 'গো' শব্দের অপভ্রংশ বা অপশব্দ। ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকিলে কোন্‌টি সাধু শব্দ বা শুদ্ধ পদ এবং কোনটি অপশব্দ তাহা জানা দুষ্কর।

যে কোনও ব্রাহ্মণ বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত হইবার অধিকারী নহেন। যে ব্রাহ্মণ বৈদিক বাক্যের পদ, অক্ষর, বর্ণ ও স্বর বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ তিনি শ্রৌত যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন। 'যো বা ইমাং পদশঃ, স্বরশোঽক্ষরশো বর্ণশো বাচং বিদধতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি' (মহাভাষ্যম্)। আর্ত্বিজীন অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত। পদ, অক্ষর ও বর্ণ তিনটি শব্দই প্রয়োগ করা হইয়াছে। পদ বলিতে words, অক্ষর বলিতে syllable, এবং বর্ণ বলিতে letter বোঝায়। যেমন 'অগ্নি' বলিতে একটি পদ বুঝায় কিন্তু দুইটি অক্ষর ও চারিটি বর্ণ বোঝায়। দুইটি অক্ষর যথা 'অ' এবং 'গ্নি', চারিটি বর্ণ হইতেছে 'অগ্‌ন্‌ই।'

ছন্দ :—বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইলে ছন্দের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। চতুর্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ ; ঋক্, সাম্ ও অথর্ব সংহিতার প্রায় মন্ত্রই ছন্দে নিবদ্ধ, কেবল যজুর্বেদে গদ্যময় মন্ত্রও দৃষ্ট হয়। লৌকিক ছন্দের ন্যায় বৈদিক ছন্দ গণের দ্বারা লঘু গুরু বর্ণ নির্ণয় দ্বারা স্থির করিতে হয় না। অর্থাৎ বেদের ছন্দ 'গণছন্দ' নহে, তাহা 'অক্ষর ছন্দ' ; অক্ষর গণনা করিয়া ছন্দ নির্ণয় করিতে হয়। সাতটি ছন্দ বেদে দৃষ্ট হয়,—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। এই ছন্দসকলের লক্ষণ ও উদাহরণ এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে 'ছন্দ' উপশীর্ষক অংশে বিশদ্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বেদের সাতটি ছন্দকে বেদরূপী পরম পুরুষের সাতটি হস্তরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কেহ কেহ যজ্ঞরূপী পুরুষের সাতটি হাত বলিয়াছেন। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্র (৪-৫৮-৩),—

'চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োঽস্য পাদা—
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ ॥'

যজ্ঞরূপী বিশাল দেবতা মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন ; তাঁহার চারটি শৃঙ্গ, তিনটি পা, দুইটি মাথা, সাতটি হাত, তিনটি বন্ধনরজ্জু, তিনি বৃষভ ও শব্দকারী। হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা চারিজন পুরোহিতের কর্ম যজ্ঞের চারিটি শৃঙ্গ ; প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয়সবন সোমরসের এই ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার আহুতি তাঁর তিনটি পা। যজমান ও যজমানপত্নী তাঁর দুইটি মাথা। গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ তাঁর সপ্তহস্ত। ঋক্‌, সাম ও যজুঃ এই বেদত্রয় তাঁর তিনটি বন্ধন। তিনি যজমানের কাম্যবস্তু বর্ষণ করেন, দান করেন বলিয়া তিনি বৃষভ। যজ্ঞে উচ্চারিত শস্ত্র ও স্তোত্র মন্ত্ররাজি তাঁহার নির্ঘোষ। গানরহিত মন্ত্র পাঠকে শস্ত্র এবং গানপাঠকে স্তোত্র বলে। পিঙ্গলঋষিবিরচিত ছন্দঃ সূত্রকেই বেদাঙ্গ বলিয়া ধরা হয়।

জ্যোতিষ,—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যথাযথ কাল নির্দ্ধারণ জন্য জ্যোতিষের জ্ঞান আবশ্যক। রাশি, নক্ষত্র, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, সংবৎসর প্রভৃতির জ্ঞান না থাকিলে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব। প্রত্যেক যজ্ঞের প্রত্যেক শ্রৌত ও গৃহ্যকর্মের বিশিষ্ট কাল, তিথি ঋতু প্রভৃতির বিধান আছে। 'গবাময়ন' নামক সূত্র (দীর্ঘকালব্যাপীযজ্ঞ) একবৎসরে শেষ হয়। ৩৬১ দিন ব্যাপী এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। 'অভিপ্লবষড়হ' 'পৃষ্ঠ্য ষড়হ' প্রভৃতি যজ্ঞ ছয়দিনে সম্পাদ্য। দ্বাদশাহ নামক যাগ বারদিনে সম্পন্ন হয়। অতএব সংবৎসর, দিন, মাস, পক্ষ প্রভৃতির জ্ঞান না থাকিলে এ সকল যাগের অনুষ্ঠান অসম্ভব।

আবার কোনও কোনও বৈদিকক্রিয়া ঋতুবিশেষে করিতে হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের নির্দেশ,—বসন্ত ঋতুতে ব্রাহ্মণ অগ্নি আধান অর্থাৎ স্থাপন করিবে, গ্রীষ্মঋতুতে ক্ষত্রিয় অগ্নি আধান করিবে ও শরৎকালে বৈশ্য অগ্নি আধান করিবে (১-১-২-৬-৭)। গার্হপত্য অগ্নি স্থাপনকে অগ্নির আধান বলা হইয়াছে। অন্যত্র নির্দেশ আছে ;—'বসন্তে কপিঞ্জলান্ আলভেত', বসন্ত কালে কপিঞ্জল

অর্থাৎ তিত্তিরপক্ষী বধ করিয়া যজ্ঞে আহুতি দিবে। ঋতুর জ্ঞান যাহার নাই তাহার পক্ষে এই সকল শ্রৌত কার্যের অনুষ্ঠান কদাচ সম্ভবপর নহে। কতক-গুলি যজ্ঞের জন্য তিথির জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। দর্শপূর্ণমাস নামক ইষ্টি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে করিতে হয়। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে বলা আছে, 'ফাল্গুনীপৌর্ণমাসে দীক্ষেরন্' (৫-৯-১-৭) অর্থাৎ ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমাতে দীক্ষা দিবে।

এ সকল যাগের জন্য তিথির জ্ঞান অপরিহার্য। কোন কোন যাগের জন্য নক্ষত্রের জ্ঞানও প্রয়োজন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণমতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ব্যতীত বহু বেদমন্ত্রের প্রকৃত অর্থবোধের জন্যও মাস, তিথি, কাল, বৎসর ঋতু নক্ষত্রের জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন।

নবম পরিচ্ছেদ

দেবতা

পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ আলোচনাকালে সাধারণ ভাবে দেবতার আলোচনা করা হইয়াছে। বেদে বহু দেব-দেবীর নাম দৃষ্ট হয়। বৈদিক সাহিত্যে প্রধানতঃ দুইটি গ্রন্থে বেদের দেবতাতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে, আচার্য শৌনক রচিত 'বৃহদ্দেবতা' নামক গ্রন্থে এবং যাস্কঋষি বিরচিত প্রখ্যাত 'নিরুক্ত' গ্রন্থের দৈবতকাণ্ডে। বেদের প্রতি মন্ত্র এক এক দেবতার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব প্রতি মন্ত্রের সম্যক্‌জ্ঞানের জন্য দেবতার জ্ঞান অপরিহার্য। বৃহদ্দেবতা-প্রবচন,—

'বেদিতব্যং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নতঃ।
দৈবতজ্ঞো হি মন্ত্রানাং তদর্থমবগচ্ছতি॥'

অর্থাৎ বেদের প্রতি মন্ত্রে দেবতার জ্ঞান অতি যত্ন সহকারে অর্জন করা আবশ্যক কারণ দেবতার জ্ঞান জন্মিলে মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়।

বেদে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য, বিষ্ণু, সোম, বরুণ, পূষন্, মরুৎ, রুদ্র, সবিতা, অর্যমা, অপাং নপাৎ, অশ্বিন, আদিত্য, দ্যৌ, ঋভু, যম, মিত্র প্রভৃতি বহু দেবতার নাম, এবং বাক, উষা, অদিতি, রাত্রি, পৃথিবী, সরস্বতী, শ্রী, ধিষনা, প্রভৃতি দেবীর নাম পাওয়া যায়। কয়েকজন দেবতার নাম দ্বন্দ্বসমাসবদ্ধ যুগলরূপে সর্বদা কীর্তিত যথা,— মিত্রাবরুণৌ,

ইন্দ্রাগ্নী, সূর্যাচন্দ্রমসৌ, দ্যাবাপৃথিবী, অগ্নীষোমৌ প্রভৃতি। অশ্বিন দেবতা সর্বদা যুগল বা যমজরূপে কল্পিত, তজ্জন্য 'অশ্বিনৌ' দ্বিবচনান্ত প্রয়োগ-দৃষ্ট হয়। প্রাচীন রোমের ক্যাষ্টর (Castor) ও পোলুক্স্ (Pollux) যুগলের ন্যায় অশ্বিদেবতা যুগলরূপে কল্পিত। 'বিশ্বেদেবাঃ' সর্বদা বহুবচনে ব্যবহৃত হয় কারণ ইহা গোষ্ঠীবাচক, বহুদেবতাবাচক।

নিরুক্তকার যাস্ক বেদের দেবতামণ্ডলীকে দেবতার স্থানভেদে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা ভূলোকের দেবতাগণ, অন্তরীক্ষলোকের দেবতাগণ এবং দ্যুলোকের দেবতাবৃন্দ। অগ্নি, অপ্ (জল) পৃথিবী ও সোম ভূলোকের অন্তর্গত। ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ, অপাং নপাৎ (বিদ্যুৎ), পর্জন্য প্রভৃতি অন্তরীক্ষলোকবাসী এবং সূর্য, মিত্র, বরুণ, দ্যুঃ, পূষা, সবিতা, আদিত্য, অশ্বি-যুগল, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দ্যুলোকের অন্তর্গত। এই তিনটি দলের মধ্যে এক একজন দেবতা প্রধান এবং সেই দলের অন্যান্য দেবতাগণ তাহারই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। ভূলোকের দেবতাবৃন্দের মধ্যে অগ্নি মুখ্য দেবতা, অন্তরীক্ষলোকের ইন্দ্র বা বায়ু মুখ্য দেবতা এবং দ্যুলোকের প্রধান দেবতা সূর্য। যাস্ক বলিতেছেন,—'তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবী-স্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বাঽন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ'। নিরুক্ত মতে আসল তিনজনই মাত্র মূল বা মুখ্য দেবতা যথা ভূলোকে অগ্নি অন্তরীক্ষ-লোকে ইন্দ্র (ইন্দ্রের নাম বায়ু) দ্যুলোকে সূর্য।' এই তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ লইয়া সেই সেই গোষ্ঠীর অপরাপর দেবতাগণের নামকরণ হইয়াছে। অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন কার্য ও বিশেষণ লইয়া বৈশ্বানর, জাতবেদা, নারাশংস, সুসমিদ্ধ ও তনূনপাৎ প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে। তদ্রূপ বায়ু হইতে মাতরিশ্বা, রুদ্র, ইন্দ্র, অপাং নপাৎ, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং সূর্য হইতে আদিত্য, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, পূষা, ভগ, উষা, অশ্বিযুগল, সবিতা প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। নিরুক্তকার যে সমস্ত দেবতাকে এই অগ্নি, বায়ু ও সূর্য তিনটি দেবতাতে পরিণত করিয়াছেন ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে, ঋকবেদের মন্ত্রে এইরূপে দেবতা বিচারের সমর্থন দৃষ্ট হয়।

নিরুক্তকারের মতে দেবতাদের তিনটি বিভাগ বা মণ্ডলী

ঋক্‌মন্ত্রে নিরুক্তকারের এই ত্রিবিধ বিভাগের সমর্থন

'সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতোঽন্তরিক্ষাদগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ' (১০—১৫৮—১)
'সূর্য আমাদের দ্যুলোকের উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন, বায়ু আমাদের

অন্তরীক্ষলোকের উপদ্রব হইতে এবং অগ্নি আমাদের পার্থিব উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন।' ঋকবেদের এই মন্ত্রে তিন লোকের সকল দেবতার উল্লেখ না করিয়া এই তিনজন দেবতার উল্লেখ করায় তাঁদের মুখ্যত্ব সুপ্রতিপন্ন হইতেছে। দেবতাগণের পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকরূপ নিবাসস্থল তিনটি 'ভূ', 'ভুব' ও 'স্বঃ' নামক তিনটি ব্যাহৃতিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদিকগ্রন্থে সাধারণতঃ দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ (৩৩) বলিয়া ধরা হইয়াছে, তন্মধ্যে একাদশ দেবতা ভূলোকের, একাদশ অন্তরীক্ষলোকের ও একাদশ দ্যুলোকবাসী। শতপথ ব্রাহ্মণেও তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে; কিন্তু ঋগ্বেদে তেত্রিশ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়; এমন কি ঋক সংহিতার দুইটি মন্ত্রে (৩-৯-৯ এবং ১০-৫২-৬) তিন হাজার তিনশত উনচল্লিশজন (৩৩৩৯) দেবতার সংখ্যা আছে। পৌরাণিক যুগে এই সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছিল।

অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই মুখ্য দেবতাত্রয়ের মধ্যে অগ্নি আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী (অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ) এবং সূর্য সর্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী (সূর্যো দেবানাং পরমঃ) এবং অন্যান্য সকল দেবতা এই দুই দেবতার অন্তর্ভুক্ত।

সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখা যায় উপরিউক্ত মুখ্য দেবতা তিনটিও প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান এক পরমাত্মার তিনপ্রকার অভিব্যক্তি মাত্র; অর্থাৎ সকল দেবতারই মূলে রহিয়াছেন এক পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম। তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। দেবতাবিচারকালে নিরুক্তে যাস্কের উক্তি,—দেবতাগণের এক আত্মা বহুরূপে অর্থাৎ বহুদেবতা রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

'দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে', (নিরুক্ত ৭—৪)।

উপরিউক্ত তিনটি মুখ্য দেবতা এক সর্বব্যাপী পরমাত্মার তিনটি বিকাশমাত্র

যেমন একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই দেহেরই ভিন্ন ভিন্ন অংশ এবং অঙ্গাঙ্গিরূপে সম্বদ্ধ তদ্রূপ 'সকল দেবদেবী সেই একআত্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ।' 'একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।' বেদের সংহিতা গ্রন্থেও দেবতাগণের স্বরূপ সম্বন্ধে এই তত্ত্ব স্পষ্ট ভাষায় উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত বেদমন্ত্রগুলি এই তত্ত্বের সমর্থক। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ' (ঋগ্বেদ ১-১৬৪-৪৬) সেই এক শাশ্বত সত্তাকে বিপ্রগণ অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহুপ্রকারে অভিহিত করেন।

'একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি' (ঋগ্বেদ ১০-১১৪-৫) 'সেই এক সৎকে ঋষিগণ বহুরূপে ভাবনা করেন।' ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্নতম (৫৫) সূক্তের

প্রতি ঋকের অন্তিম পাদে—'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্' বাক্যটি শ্রুত হয়। ইহার অর্থ,—'তুমিই সকল দেবতার প্রাণদাতা মহান্ সত্তা।' জন্দ্ আবেস্তায় যেমন দেবতার অর্থে 'অহুর' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তদ্রূপ বেদেও বহু মন্ত্রে দেবতা অর্থে 'অসুর' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; ব্যাখ্যা করা হইয়াছে প্রাণদাতা। 'অসু' শব্দের অর্থ প্রাণ। অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি ইতি অসুরঃ। যিনি প্রাণদান করেন অর্থাৎ পরমাত্মা। ঋগ্‌বেদের অপর এক মন্ত্রে বলা হইয়াছে, —'একং বৈ ইদং বি বভূব সর্বম্' 'এই একই (পরমাত্মা) সকল রূপ ধারণ করিয়াছেন।' নিত্য সত্য পরমাত্মা হইতে দেবতাগণের উৎপত্তি শুক্ল যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে,—

'এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ' (শুক্ল যজুঃ)

'এই এক পরমাত্মাই সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইনিই সকল দেবতার রূপ ধারণ করিয়াছেন।' মূলতঃ দেবতাগণ পরমাত্মস্বরূপ।

বেদে বর্ণিত প্রতি দেবতা এক একটি পার্থিব বস্তুর বা পার্থিব প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতীক। এক একটি পার্থিব পদার্থের চৈতন্যসত্তা বা অধিষ্ঠাতা এক একটি দেবতা। দৃশ্য পার্থিব অগ্নির চৈতন্যময় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন অগ্নি। চক্ষুর্গ্রাহ্য সূর্যের অধিষ্ঠাতা সূর্যদেব বা সবিতা বা আদিত্যদেব। এইরূপ পার্থিব পবনের দেবতারূপ বায়ু। মরুৎ দেবতার বাহ্য প্রতীক ঝড় ঝঞ্ঝাবাত। রুদ্রদেবতা হইলেন বজ্র ; এইজন্য তিনি ভীষণ ও সংহারক ; তাঁহার ভীষণধ্বনি হইল অশনিনির্ঘোষ। তাঁহাকে 'ঘোর' (ভীষণ) ও 'ঘোরতর' (ভীষণতররূপে) বর্ণনা করা হইয়াছে। বজ্রকে জীবলোকে সকলেই ভয় করে এবং শিরে বজ্রপাত হইলে অনিবার্য মৃত্যু ; তজ্জন্যই রুদ্রের মন্ত্রে সর্বদাই জনগণের ত্রাস সঞ্চারের কথা উক্ত হইয়াছে এবং তাঁহাকে সংহারক ভীষণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদে রুদ্রের এই ভীষণ রূপই আমরা সর্বদা দেখিতে পাই ; তাহার শিব বা শংকর মূর্তি ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায় না। শুক্ল যজুর্বেদে রুদ্রের যুগপৎ ভীষণরূপ ও কল্যাণরূপ শিবরূপ রুদ্রাধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে ; 'ঘোর' ও 'ঘোরতর' যেমন বলা হইয়াছে তেমনই আবার একই অধ্যায়ে 'শিব' ও 'শিবতর' বলা হইয়াছে। দুইটি বিপরীত ধারণার সমন্বয় হইয়াছে যজুর্বেদে। 'অপাং নপাৎ' দেবতার বাহ্য প্রতীক বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের বর্ণ সুবর্ণময় বলিয়া 'অপাং নপাৎ' দেবতাকে হিরণ্যবর্ণ, 'হিরণ্যহস্ত' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। পর্জন্যদেবের প্রতীক হইল মেঘ। মিত্র,

প্রতি দেবতা এক একটি পার্থিব প্রকৃত পদার্থের প্রতীক বা অধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যসত্তা

বরুণ, সবিতা, ভগ, পূষা, অর্যমা, আদিত্য, উষা প্রভৃতি দেবতাগণ পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্তনগতিপথে সূর্যের গগনে অবস্থানের স্থানভেদে এক একটি নাম মাত্র ; পরে ইহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

এইরূপ 'জাতবেদা' 'বৈশ্বানর' প্রভৃতি অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। দেবতাগণ পার্থিব বস্তুর চিন্ময়রূপ এবং এক একটি পার্থিব বস্তু এক এক দেবতার বাহ্য প্রতীক—ইহা অনেকে আধুনিক বা পাশ্চাত্ত্য মত বলিয়া মনে করেন কিন্তু ইহা আধুনিকমত নহে, কেবল পাশ্চাত্ত্যমতও নহে। বৈদিকযুগেই এই মত প্রচলিত ছিল এবং প্রসিদ্ধ বেদাঙ্গ নিরুক্ত তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। নিরুক্তে যাস্ক দেবতা-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আলোচনা করিয়াছেন এবং নিজের অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছেন।

আলোচ্য বিষয়ে যাস্কের ও যাস্কের পূর্বাচার্য নিরুক্তকারগণের মত

বেদে ইন্দ্রদেবতার সূক্তে ইন্দ্র বৃত্র নামক অসুরকে বজ্র দ্বারা বধ করিয়াছেন, একথা বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে। এই ইন্দ্র এবং বৃত্র কে,—বৃত্র সত্যই কোন অসুর না অন্য কিছু ইহা যাস্ক নিরুক্তে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি নিরুক্তকারদের ও ঐতিহাসিকদের পরস্পর-বিরুদ্ধ মত উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—'তৎ কো বৃত্রঃ ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ। অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্মণো বর্ষকর্মজায়তে তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবতি। অহিবত্তু খলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণবাদাংশ্চ' (নিরুক্ত)। 'কে এই বৃত্র ? নিরুক্তকারদের মতে বৃত্র মেঘ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। মেঘই বৃত্র। ঐতিহাসিকগণ বলেন ত্বষ্টা নামক ব্যক্তির পুত্র বৃত্র একজন অসুর। (প্রকৃত পক্ষে বৃত্র মেঘই)। মেঘের জল ও বিদ্যুতের সংমিশ্রণে বৃষ্টি হয়, (বজ্রপাত হয়) ; তজ্জন্যই বজ্র ও ঝঞ্ঝারূপী ইন্দ্র মেঘরূপী বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন এই ভাবে কল্পনা করা হইয়াছে এবং এই জন্যই মন্ত্রে ও ব্রাহ্মণে বৃত্রকে অসুররূপে কল্পনা করা হইয়াছে।' যাস্ক ইতিহাস বলিতে ব্রাহ্মণগ্রন্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বেদের মন্ত্রে বহুবার উক্ত হইয়াছে যে বৃত্র সমস্ত জল স্বীয় উদরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে এবং ইন্দ্র বজ্র দ্বারা আঘাত করিলে তখন তাহার দেহ বিদীর্ণ হইয়া জলধারা পৃথিবীর বুকে বর্ষিত হয়। ইহার অর্থ মেঘের উপর বজ্রপাত হইলে বৃষ্টি হয়। বেদের মন্ত্রে প্রাকৃতিক উপসর্গের এইরূপ বহু বর্ণনা পুরাণে আখ্যায়িকার রূপ ধারণ করিয়াছে। পুরাণে বিষ্ণুর বামনাবতারে তিনবার পদক্ষেপে—ত্রিভুবনব্যাপ্ত করিয়া বলিকে পরাভূত করার বৃত্তান্ত আছে। এই বৃত্তান্তের উৎস ঋগ্বেদের বিষ্ণুমন্ত্রে রহিয়াছে। মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের নাম—বেদে বিষ্ণু। সূর্য যখন মধ্যাহ্নে

আমাদের মস্তকের ঠিক উপরে গগনমধ্যে প্রকাশমান তখন বিষ্ণু। মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড আকারে ক্ষুদ্র ; গগনমার্গে সূর্যের প্রতিদিন যতগুলি রূপ দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে ঠিক মধ্যাহ্নে মধ্যগগনে তাঁর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আকৃতি দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র আকৃতি অর্থাৎ বামন রূপ। তখন আকারে ক্ষুদ্রতম হইলেও তেজে প্রখরতম। তদ্রূপ বিষ্ণু বামনাবতারে বাহ্যতঃ খর্বরূপ ধারণ করিলেও শক্তিতে অদ্বিতীয় ও অলৌকিক। ঋগ্বেদের একটি বিষ্ণু সূক্তের মন্ত্র,—

'ইদং বিষ্ণুঃ বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্'। বিষ্ণুর অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সূর্যের এই ত্রিপাদ বিহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যাস্ক তাঁহার পূর্বাচার্য শাকপূণি, ঊর্ণনাভ, প্রভৃতির মতের উল্লেখ করিয়াছেন। ঊর্ণনাভ সূর্যের এই তিনপদক্ষেপ এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; প্রথম পদক্ষেপ উদয়কালে উদয়াচলে ; দ্বিতীয় পদক্ষেপ মধ্যাহ্নে গগনের মধ্যভাগে যখন সূর্য বিরাজ করেন ; তৃতীয় পদক্ষেপ অস্তাচলে ; তৎপর পুনরায় প্রভাতে উদয়গিরিতে প্রথম পদক্ষেপ। এইভাবে তিনটি পদক্ষেপে সূর্য সমগ্র ভুবন আবৃত্ত করেন অশ্বি-দেবতা যুগল সম্বন্ধেও বৈদিক যুগে এইরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত উল্লেখে যাস্কের উক্তি,—

বিষ্ণুর বামনাবতারের বীজ

এই 'অশ্বিনৌ' নামক দেবতা যুগল কে? কেহ বলেন ইহারা দ্যাবা পৃথিবী, কেহ কেহ বলেন ইহারা দিবা ও রাত্রি, আবার অপর একদল বলেন ইহারা সূর্য ও চন্দ্রের যুগল। এই তিনটি মতই ভিন্ন ভিন্ন নিরুক্তকারের মত। ঐতিহাসিকগণ বলেন পুণ্যশীল দুইজন নৃপতি স্বর্গে এই যুগলদেবতা হইয়া আছেন।' পুরাণে শিবকে কপর্দ্দী ও নীলকণ্ঠরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কপর্দ্দী অর্থাৎ জটাধারী। এই বর্ণনার উৎস শুক্ল যজুর্বেদে রুদ্রাধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। তথায় দুইটি মন্ত্রে (১৬।৬, ৭) অস্তগামী লোহিতবর্ণ ও সহস্রকিরণমালাবিশোভিত আদিত্যরূপে রুদ্রের বর্ণনা করা হইয়াছে। রুদ্রকে সম্পূর্ণ লোহিতবর্ণ, কেবল 'গ্রীবাদেশে নীলবর্ণ এবং সহস্ররশ্মিযুক্ত বলা হইয়াছে। তিনি যখন এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্যে পশ্চিম গগনে বিরাজ করেন তখন উদকার্থিনী রমণীগণ এবং গোপবালকবৃন্দ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে (১৬-৭)। এই বর্ণনা রুদ্র অথবা শিবের সঙ্গে মিলে না এবং বিনা আয়াসে বুঝিতে পারা যায়। এই সকল মন্ত্রে রুদ্রকে আদিত্যেরই একটি মূর্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শুক্ল যজুঃ সংহিতার খ্যাতনামা ভাষ্যকার উবট ও মহীধর দুইজনেই এই অংশের ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'আদিত্যরূপেণাত্র রুদ্র স্তূয়তে' অর্থাৎ

শুক্ল যজুর্বেদে আদিত্য রূপে রুদ্রের বর্ণনা

এখানে আদিত্যরূপে রুদ্রের স্তুতি করা হইয়াছে। অস্তগামী বা উদয়াচলে অধিষ্ঠিত সূর্যের সহস্র সহস্র কিরণমালা রুদ্রের জটাজালরূপে কল্পিত। অস্ত-গমনকালে সূর্যের রক্তিমবর্ণ সর্বজনবিদিত এবং ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় ঐ দিগন্তবিস্তৃত রক্তিমবর্ণের মধ্যে ঠিক সূর্যবিম্বের মধ্যভাগ ঈষৎ নীলবর্ণে রঞ্জিত ; তজ্জন্যই 'নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ' বলা হইয়াছে।

সকল দেবতার মূলরূপ অগ্নি ইহা যাস্কের মত এবং এই মতের সমর্থনে তিনি ব্রাহ্মণগ্রন্থের 'অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ' বচন তুলিয়াছেন। পার্থিব অগ্নিই অন্তরীক্ষে ইন্দ্ররূপে, বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে সূর্যরূপে প্রকটিত। দ্যুলোকের সকল দেবতা সূর্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ এবং অন্তরীক্ষলোকের সকল দেবতা ইন্দ্রেরই বিভিন্ন প্রকাশ ; অতএব যেহেতু ইন্দ্র ও সূর্য অগ্নিরই রূপভেদ মাত্র, ত্রিলোকের সকল দেবতাই অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। অগ্নির তেজই অন্তরীক্ষে বিদ্যুতে এবং দ্যুলোকে আদিত্যে প্রকাশিত। এই মতের সমর্থনে যাস্ক ঋগ্বেদের—

যাস্কের মতে সকল দেবতার মূল রূপ অগ্নি

'তমূ অকৃণ্বন ত্রেধা ভুবে' (১০-৮৮-১০) মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই অগ্নিকে তিনরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন,—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক এই তিনস্থানভেদে। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থেও এই মতের সমর্থন দৃষ্ট হয়।

'ইহাগ্নিভূতস্তু ঋষিভির্লোকে স্তুতিভিরীড়িতঃ।
জাতবেদা স্তুতো মধ্যে, স্তুতো বৈশ্বানরো দিবি ॥'

'এই পৃথিবীতে যাহাকে অগ্নিরূপে ঋষিগণ স্তুতি করিয়াছেন, তাহাকেই অন্তরীক্ষে জাতবেদারূপে এবং দ্যুলোকে বৈশ্বানররূপে স্তুতি করিয়াছেন।' কাত্যায়ন যাস্কের এই মত সমর্থন করেন নাই। তিনি স্বরচিত 'সর্বানুক্রমণী' গ্রন্থে বলিয়াছেন বৈদিক সকল দেবতার মূলরূপ সূর্য বা আদিত্য। সকল দেবতার ধারণার উৎপত্তির বীজ সূর্যের লক্ষণে এবং বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি উক্ত গ্রন্থে এই মত অতি স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাষায় কয়েকবার ব্যক্ত করিয়াছেন। 'এক এব মহানাত্মা বেদে স্তূয়তে, স সূর্য ইতি ব্যাচক্ষতে।' 'এক মহান আত্মারই স্তুতি বেদে (বিভিন্ন দেবতার স্তুতিতে) করা হইয়াছে, তাঁহার নাম সূর্য।' 'একৈব দেবতা স্তূয়তে আদিত্য ইতি।' বেদে প্রকৃত পক্ষে একজন দেবতারই স্তুতি করা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন আদিত্য। আদিত্যের এক একটি কার্য বা গুণ লইয়া এক এক দেবতার নামকরণ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ব-

কাত্যায়নের মতে সকল দেবতা আদিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র

বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বেদের অধ্যাপক মহারাষ্ট্রদেশীয় স্বনামধন্য বিদ্বান মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী মহোদয় কাত্যায়নের এই মতের সমর্থক। তাঁহার নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে বেদ অধ্যয়নের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল এবং ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার সহিত বেদ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছি। তিনি সর্বদাই এই মত সমর্থন করিতেন এবং বেদের মন্ত্রের আদিত্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইতেন। ইন্দ্র এবং বৃত্রের আখ্যায়িকাও তিনি যথাক্রমে সূর্য ও পৃথিবীর আবর্তনের সম্বন্ধ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। মিত্র, বরুণ, সবিতা, অশ্বিন, ঊষা, ভগ, সূর্য, বিষ্ণু প্রভৃতি আদিত্যের এক একটি অবস্থার নামমাত্র। দিবাভাগে আদিত্যের নাম 'সূর্য', রাত্রিবেলাতেও আদিত্য বিরাজ করেন, আমরা দেখিতে পাই না; তখন তাঁহার নাম 'বরুণ'। রাত্রের শেষাংশে যখন আকাশের অন্ধকার কাটিয়া যায় কিন্তু পৃথিবীতে অন্ধকার থাকে তখন আদিত্যের নাম 'সবিতা'। যখন পৃথিবীর অন্ধকারও ঘুচিয়া যায় তখন তাঁহার নাম 'অশ্বিন'। সূর্যোদয়ের পূর্বে দিঙ্‌মণ্ডল যখন রক্তিমাভ হইয়া উঠে তখন আদিত্যের নাম 'ঊষা'। উদিতমাত্র সূর্যবিম্বের নাম 'ভগ'। তৎপরের অবস্থার নাম 'সূর্য'। মধ্যাহ্নকালে আদিত্য যখন গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে বিরাজ করেন তখন তাঁহার নাম হয় 'বিষ্ণু'। এই-ভাবে দ্বাদশ আদিত্যকে প্রতিদিন গগনমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে সূর্যের অবস্থানের দ্বাদশটি নামমাত্র বলিয়া নিরুক্তকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরাণে দ্বাদশ মাসে আদিত্যের দ্বাদশ নামে দ্বাদশ আদিত্য হইয়াছে বলা আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে বিশেষ করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—আদিত্য অস্ত গমনকালে অগ্নিতে তাঁহার নিজ তেজ নিহিত করিয়া যান। 'আদিত্যো বা অস্তং গচ্ছন্ অগ্নৌ অনুপ্রবিশন্তি' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)। অতএব অগ্নিও আদিত্যেরই রূপবিশেষ।

গগনমণ্ডলে অবস্থানের ভিন্ন ভিন্ন সময় ধরিয়া সূর্যের এক একটি নাম হইয়াছে

যাস্কের অগ্নিই সকল দেবতা এবং কাত্যায়নের সূর্যই সকল দেবতা এই মত দুইটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও ইহাদের সমন্বয় যাস্ক করিয়া গিয়াছেন। দেবতা বিচার কালে তিনি বলিয়াছেন মনুষ্যের বেলায় পিতা হইতেই পুত্রের উৎপত্তি হয়, পুত্র হইতে পিতার উৎপত্তি হইতে পারে না—কিন্তু অলৌকিক ঐশ্বর্যশালী দেবতাগণের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না—তাঁহার 'ইতরেতরজন্মা'

যাস্ক ও কাত্যায়নের মতের সমন্বয়

ও 'ইতরেতরপ্রকৃতি' অর্থাৎ মিথঃ পরস্পর হইতে জাত। উদাহরণ প্রসঙ্গে তিনি শ্রুতিবচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, বেদে অগ্নি হইতে সূর্য জন্মগ্রহণ করে এ কথাও যেমন বলা আছে তেমনই সূর্য হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয় এই কথাও বলা আছে। 'অগ্নের্বা আদিত্যো জায়তে' শ্রুতি বচনে অগ্নি হইতে আদিত্যের উৎপত্তির কথা বলা আছে। আবার সূর্যও অগ্নি উৎপাদন করেন। কেবল শ্রুতিবচন নহে, যাস্ক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রমাণে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যখন সূর্যরশ্মি কাচ বা মণির ভিতর দিয়া শুষ্ক পত্র বা তৃণের উপর পতিত হয় তখন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এক্ষেত্রে সূর্যই অগ্নির জনক। এই প্রমাণটি তিনি দিয়াছেন। কেবল অগ্নি ও সূর্য নহে, অন্যান্য দেবতাগণও পরস্পরসম্ভূত। শ্রুতিবচনে আমরা দেখিতে পাই অদিতি হইতে দক্ষ উৎপন্ন হইয়াছেন; আবার দক্ষ হইতেও অদিতি উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব সূর্য ও অগ্নি যখন পরস্পর হইতে উৎপন্ন তখন যাস্ক ও কাত্যায়নের মতের আর বিরোধ রহিল না। দেবতাগণ পরস্পর হইতে উৎপন্ন ইহা স্বীকার করিলে উহাদের বিশেষ রূপ অতিক্রম করিয়া—একটি সামান্য মহাসত্তা আছে ইহাও প্রমাণিত হইল। দেবতাগণের বিশেষ বিশেষ নাম ও রূপের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা পরস্পর ভিন্ন এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যে অনুস্যূত মহাসামান্য বা মহাসত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা অভিন্ন; যেমন মৃত্তিকা হইতে নির্মিত ঘট, শরাব, স্থালী প্রভৃতি বিভিন্ন মৃৎপাত্র পরস্পর ভিন্ন কিন্তু তাহাদের মহাসত্তা মৃত্তিকা বা মৃন্ময়ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা অভিন্ন। দেবতাগণের এই সর্বসাধারণ মহাসত্তাই পরমাত্মা এবং মূলতঃ দেবতাগণ পরমাত্মস্বরূপ, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

দেবতারা পরস্পরজন্মা

দেবতাগণ সাকার না নিরাকার, শরীরী অথবা অশরীরী—ইহা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের ও ভিন্ন ভিন্ন নিরুক্তকারের ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। বৈদিকযুগেই এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল এবং নিরুক্তে দৈবতকাণ্ডে (৭-৮) যাস্ক সে সকল মতের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পূর্বাচার্যগণের দুইপ্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ মত আলোচনাপূর্বক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। সাকার ও নিরাকার অথবা শরীরী ও অশরীরী অর্থে যাস্ক 'পুরুষবিধ' এবং 'অপুরুষবিধ' শব্দ দুইটি প্রয়োগ করিয়াছেন। 'পুরুষবিধ' অর্থাৎ শরীরধারী পুরুষের মতন শরীর ও কর্মাদি, এবং 'অপুরুষবিধ' অর্থাৎ ইহার বিপরীত।

দেবতাগণ সাকার অথবা নিরাকার তৎবিষয়ক আলোচনা

দেবতারা পুরুষবিধ বা শরীরী এই মত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা স্বমতস্থাপন ও পরমতখণ্ডনার্থ নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,—

(১) ঋষিগণ মন্ত্রে দেবতা সকলকে শরীরধারী চেতনসত্তা রূপে স্তুতি করিয়াছেন। দেবতার শরীর বা পুরুষের ন্যায় কর্মাদি না থাকিলে সেই সকল স্তুতি উন্মাদ প্রলাপের ন্যায় নিরর্থক হইয়া পড়িবে ও মন্ত্র অর্থহীন হইবে। ঋগ্বেদে বহু সংবাদসূক্ত আছে; সংবাদ অর্থাৎ পরস্পর আলাপ, কথোপকথন; যেমন যম-যমী সংবাদ (১০-১০), সরমাপণি সংবাদ, উর্বশী ও পুরুরবা সংবাদ (১০-৯৫), সূর্যসূক্ত (১০-৮৫) প্রভৃতি। এই সকল সূক্তে যমের সহিত যমীর সংলাপ, সরমার সহিত পণির, পুরুরবার সহিত উর্বশীর সংলাপ এবং সূর্যসূক্তে সূর্যার বিবাহে বহু দেবতার আহ্বানাদি দৃষ্ট হয়। দেবতাদের শরীর ও চৈতন্য না থাকিলে পরস্পর আলাপ, প্রণয়, বিবাহাদি অসম্ভব।

দেবতারা শরীরধারী এই মতের স্বপক্ষে যুক্তিরাজি

(২) বেদের মন্ত্রে মনুষ্যের ন্যায় দেবতাদের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণাদির উল্লেখ আছে, অতএব তাঁহারা শরীরধারী সবিতার হিরণ্যহস্ত, ইন্দ্রের বজ্রপাণি ও খড়্গের ন্যায় নাসিকা, আদিত্যের উজ্জ্বলমুখ, মিত্রের চক্ষু, বিষ্ণুর পদদেশ প্রভৃতির উল্লেখ সেই সেই দেবতার মন্ত্রে শ্রুত হয়।

(৩) বেদে দেবতাগণের অশ্ব, রথ, বজ্র, গৃহ, পত্নী, দুর্গ প্রভৃতির উল্লেখ থাকায় তাঁহারা পুরুষবৎ শরীর-ধারী হইতে বাধ্য নচেৎ এ সকল কথা নিরর্থক। ইন্দ্রের ও সূর্যের অশ্বের কথা, ত্বষ্টার বজ্রনির্মাণের ও ইন্দ্রের বজ্রপ্রয়োগের, অগ্নি—ইন্দ্র—সবিতাদি দেবতার রথের কথা মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতির পত্নী যথাক্রমে অগ্নায়ী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, প্রভৃতির বর্ণনাও বেদে আছে।

(৪) যেহেতু বেদে চেতন শরীরী পুরুষের ন্যায় কর্মাদি দেবতার বৃত্তান্তে পাওয়া যায় অতএব দেবতারা 'পুরুষবিধ' অর্থাৎ শরীরী—। ইন্দ্র সোমপান করেন, যুদ্ধ করেন, বৃত্রকে বধ করেন, অশ্বচালনা করেন, অগ্নি যজ্ঞের হবি ভক্ষণ করেন, মরুৎগণ বংশীবাদন করেন, রুদ্র ভীষণ গর্জন করেন, বিষ্ণু বিশাল চক্ষুদ্বারা সমগ্র জগৎ নিরীক্ষণ করেন ইত্যাদি বর্ণনা ও বৃত্তান্ত বেদে দৃষ্ট হয়।

উপরি উক্ত যুক্তিচতুষ্টয়প্রয়োগে দেবতাগণের পুরুষবিধত্ব বা সাকারত্ব প্রমাণ করিতে একপক্ষ চেষ্টা করিয়াছেন। অপর পক্ষ এই সকল যুক্তি

খণ্ডন করিয়া—দেবতাদের নিরাকারত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা নিম্নে প্রদত্ত যুক্তি জাল বিস্তার করিয়াছেন :—

দেবতাদের নিরাকারত্বের পক্ষে যুক্তিরাজি

(১) অগ্নি, বায়ু, সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি বেদোক্ত যে সকল দেবতা আমরা—নিত্য দর্শন করি তাঁহাদের পুরুষবৎ শরীর নাই। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে দেবতাদের শরীর স্বীকার করা যায় না।

(২) স্তুতি করা হইয়াছে বলিয়াই যে দেবতাগণ চেতন ও শরীরী ইহা যুক্তিযুক্ত কারণ নহে কারণ বেদে অচেতন পদার্থ অক্ষ (পাশা), ওষধি (যে সকল বৃক্ষ বা গুল্ম ফল পাকিলে মরিয়া যায়), প্রস্তর, উলূখলমুষল (উদূখলমুষল) প্রভৃতিকেও চেতনবৎ স্তুতি করা হইয়াছে।

(৩) শরীরী পুরুষের কর্মাদি দেবতাগণে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা 'পুরুষবিধ' একথাও মানিতে পারা যায় না কারণ বেদে অচেতন পদার্থে পুরুষবৎ কর্মাদি আরোপ করিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। যথা, সোমরসনিষ্কাসন, জন্য যে প্রস্তরগুলি ব্যবহৃত হয় তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, 'অভিক্রন্দতি হরিতেভিরাসভিঃ' অর্থাৎ তাহারা (প্রস্তর-খণ্ডসকল) 'হরিদবর্ণ মুখে শব্দ করিতেছে'। আর একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'হোতুশ্চিৎ পূর্বং হবিরদ্যমাশতে' অর্থাৎ প্রস্তররাজি হোতার পূর্বেই যজ্ঞের হবি ভক্ষণ করে।

(৪) অশ্ব, রথ, প্রভৃতি চেতন ও শরীরী পুরুষভোগ্য দ্রব্যাদির প্রয়োগ দেখিলেই তাহাকে পুরুষবৎ চৈতন্যময় সাকার সত্তা বলা যায় না—কারণ অচেতন 'অপুরুষবিধ' পদার্থের ক্ষেত্রেও এই সকল প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন, 'সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনম্' মন্ত্রে অচেতন নদীর রথ যোজনার কথা বলা হইয়াছে, এই সকল স্তুতির স্বার্থে তাৎপর্য নাই।

যাস্ককথিত উপরি উক্ত পরস্পরবিরুদ্ধ মত দুইটি শুধু বৈদিক যুগে নহে বৈদিকোত্তর যুগেও প্রচলিত ছিল। দর্শনের যুগে আমরা দেখিতে পাই জৈমিনী-পূর্ব-মীমাংসা দর্শনে দেবতাদের আকার ও চেতন পুরুষবৎ ব্যবহার স্বীকার করেন নাই। এই দর্শনের মতে মন্ত্রের অতিরিক্ত দেবতার পৃথক

জৈমিনির মত—মন্ত্রময়ী দেবতা

কোনও রূপ নাই। 'মন্ত্রময়ী দেবতা'। যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডে যখন কোনও বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হয় তখন সেই মন্ত্ররূপে দেবতার আবির্ভাব হয়। মন্ত্রব্যতীত দেবতার পৃথক্ কোনও সত্তা, বিগ্রহ বা রূপ নাই। দেবতারা পুরুষরূপী বা বিগ্রহযুক্ত

নহেন। এই মত স্থাপনে যে সকল যুক্তি আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি পূর্বমীমাংসায় সেই সকল যুক্তি ব্যতীত আরও দুই একটি যুক্তি দৃষ্ট হয়। দেবতার শরীর থাকিলে একই কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বহু যজ্ঞে তাঁহাদের যুগপৎ আবির্ভাব অসম্ভব কিন্তু 'মন্ত্রময়ী দেবতা' এই মত স্বীকারে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রের রূপে তাঁহাদের যুগপৎ সকল যজ্ঞে উপস্থিতি সম্ভব। পাণিনিব্যাকরণদর্শনের ইহাই মত মনে হয় কারণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একস্থানে বলিয়াছেন,—'এক ইন্দ্রশব্দঃ ক্রতুশতে প্রাদুর্ভূতঃ' অর্থাৎ 'এক ইন্দ্র শব্দ যুগপৎ একশত যজ্ঞে আবির্ভূত হয়।' একশত শব্দটি অসংখ্য অর্থে এস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব-মীমাংসাদর্শনে আরও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি দেবতার রূপ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কোনও ঘটে যখন দেবতার আহ্বান করা হয় তখন মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ঘটে দেবতার রূপের বা বিগ্রহের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘটটি ভাঙ্গিয়া যাওয়া উচিত কারণ ক্ষুদ্র ঘটে দেবতার শরীরের সংকুলান হইতে পারে না; কিন্তু ঘট ভাঙ্গিয়া যায় না। অতএব দেবতার মন্ত্রাতিরিক্ত পৃথক রূপ নাই। উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনে বেদব্যাস পূর্ব মীমাংসার এই মত স্বীকার করেন নাই। তিনি ব্রহ্ম-সূত্রের 'জ্যোতিষি ভাবাচ্চ' (১-৩-৩২) সূত্রে জৈমিনির মত পূর্বপক্ষরূপে স্থাপন করিয়া 'ভাবং তু বাদরায়ণো হস্তি হি' (১-৩-৩৩) সূত্রে জৈমিনির মত খণ্ডন করিয়া দেবতাদের পুরুষবৎ শরীরধারণ ও ব্যবহার সম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীশংকরাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বেদব্যাসের মত সমর্থন করিয়াছেন এবং শ্রুতি স্মৃতি হইতে প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। দেবতাদের ঐশ্বর্যযোগে ইচ্ছামত শরীরধারণ সম্ভব। তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিহেতু যুগপৎ বহুস্থানে আবির্ভাবও সম্ভব। 'ইন্দ্র মেষের রূপ ধারণ করিয়া কান্বায়ণ মেধাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন', 'অধ্বর্যু সবিতা দেবের ডানহাত ছেদন করিয়াছিলেন,' 'ইন্দ্র অশ্বারোহণ করিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছিলেন' প্রভৃতি শ্রুতিবচন এবং 'আদিত্য পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া কুন্তীর নিকট গিয়াছিলেন', ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, পবন প্রভৃতি দেবতাগণ যুগপৎ রাজা নলের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, 'পৃথিবী গাভীর রূপ ধারণ করিয়া ভগবান নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন' ইত্যাদি স্মৃতি পুরাণাদিবচন দেবতাগণের শরীরধারণের প্রমাণ।

বেদান্ত দর্শনে জৈমিনির মতের খণ্ডন ও দেবতারা আকার ধারণ করিতে পারেন এই মত স্থাপন

নিরুক্তে যাস্কাচার্য এই পরস্পর-বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের সমন্বয় করিয়া স্বকীয়

সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। দেবতারা সাকার ও নিরাকার,—তাঁহার ভাষায় 'পুরুষবিধ এবং অপুরুষবিধ' উভয়ই, স্বরূপতঃ পুরুষবিধ, শরীরধারী কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মে শরীর লইয়া উপস্থিত হয়েন না। তাঁহাদের স্ব-স্বরূপ 'পুরুষবিধ' কিন্তু কর্মরূপ অপুরুষবিধ। যথা যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা যজ্ঞপুরুষ স্বরূপে পুরুষরূপী কিন্তু সেই রূপ যজমানের প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। যজ্ঞে কর্ম কালে যাগকর্মের সহিত যজ্ঞপুরুষ একাত্ম হইয়া থাকেন এবং সেই কর্মময় অপুরুষবিধ রূপ যজমান দেখিতে পায়, এই তত্ত্ব অগ্নি, ইন্দ্র, [illegible]াদি প্রতি দেবতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বরূপবিচারে তাঁহারা বিগ্রহযুক্ত, রূপবান কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মকালে সসীম শক্তি মানবগণের নিকট তাঁহারা অশরীরী থাকেন, তখন সেই সেই শ্রৌত কর্মই তাঁদের রূপ। অতএব দেবতাগণ নিত্য উভয় প্রকার। যদিও যাস্ক এই সমন্বয় তাঁহার নিজস্ব মত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই তথাপি তিনি নিজস্ব পৃথক আর কোনও সিদ্ধান্ত না দেওয়ায় ইহাই তাঁহার নিজস্ব মত বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

যাস্কের মত, দেবতারা সাকার এবং নিরাকার উভয়বিধ

আজানদেব এবং কর্মদেব নামে দেবতাদের দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে। যে সকল দেবদেবীগণের দেবত্ব স্বতঃসিদ্ধ 'আজানসিদ্ধ', দেবত্ব লাভ করিবার জন্য যাঁহাদের কোনও পুণ্যকর্মাদি বা তপস্যা করিতে হয় নাই তাঁহাদের আজানদেবতা অর্থাৎ জন্মরহিত স্বতঃসিদ্ধ দেবতা বলা হয়; আর যাঁহারা পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, পুণ্যকর্ম বা তপস্যার বলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের 'কর্মদেবতা' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, সোম, রুদ্র, মরুৎ, বিষ্ণু, উষা, বাক্ প্রভৃতি দেবদেবীগণ 'আজান দেবতা'; তাঁহাদের দেবত্ব স্বতঃসিদ্ধ। 'ঋভু' নামক দেবগণ এবং অশ্বি-দেবতাযুগল কর্মদেবতা কারণ তাঁহারা প্রথমে দেবতা ছিলেন না। পুণ্যকর্মের বলে তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। অঙ্গিরা সুধন্বা নামক এক পুত্র ছিল। সেই সুধন্বার 'ঋভু' বিভ্বা ও বাজ নামে তিন পুত্র হইয়াছিল। এই তিন পুত্রের সমষ্টিগত নাম 'ঋভু'; বেদে 'ঋভু' দেবতা বলিতে এই তিন জনই বোধ্য; এই জন্যই ঋভু শব্দ বহু সময় বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহারা মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু পুণ্যকর্মবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছিল। সায়নাচার্য বলেন ঋভুগণ সূর্যরশ্মি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন না। অশ্বি-দেবতাযুগল বিবস্বান্ ও সরণ্যুর

দেবতাদের দুইটি বিভাগ, আজানদেব ও কর্মদেব

বেদোক্ত কয়েকজন মুখ্য দেবতার স্বরূপ ও কার্যাবলীর আলোচনা

পুত্রদ্বয়। ঋগ্বেদের কোনও কোনও সূক্তের (৫-৭৫-৩ ; ১-৬৬-২ প্রভৃতি) মতে তাহারা রুদ্র ও সিন্ধুর যুগল তনয়। তাহারাও ঋভুগণের মত প্রথমে মানুষ ছিল এবং পুণ্যকর্মবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছিল।

বেদে প্রাপ্ত দেবতামণ্ডলীর মুখ্য কয়েকজন দেবতার স্বরূপ ও চরিত নিম্নে বিবৃত হইল :—

ইন্দ্র

ইন্দ্র :—বেদের দেবতামণ্ডলীর মধ্যে ইন্দ্র অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গুরুত্বে, মহিমায়, শৌর্যে, বীর্যে এবং সূক্তসংখ্যায় ইন্দ্র অদ্বিতীয়। ঋগ্‌বেদের প্রায় চারিভাগের একভাগ অর্থাৎ দুইশতের অধিক সূক্তে ইন্দ্রের আবাহন করা হইয়াছে। তাঁর রূপের বর্ণনাও মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ঋষিগণ তাঁহার চারু ওষ্ঠাধর, সুস্পষ্ট চিবুক, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক আর্যগণের আকৃতি কিরূপ ছিল তাহা বহু গবেষক ইন্দ্রের আকৃতির বর্ণনা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কপিশবর্ণের অশ্বগণ তাঁহার উজ্জ্বল রথ টানিয়া লইয়া যায়। ইন্দ্র মহাবীর এবং যুদ্ধে অজেয়। তাঁহার জনক জননীও বীর ছিলেন। ত্বষ্টা তাঁহার জন্য এক হাজার তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট সুবর্ণ বজ্র নির্মাণ করিয়া দিয়াছে ; সেই বজ্রদ্বারা তিনি অসুর বধ করেন। কোনও কোনও স্থলে এই বজ্রকে লৌহনির্মিতও বলা হইয়াছে। সম্বর, অহি, বৃত্র, অর্বুদ, বিশ্বরূপ প্রভৃতি অসুরদের ইন্দ্র বধ করেন। বৃত্র জলরোধ করিয়া রাখে, ইন্দ্র তাহাকে বধ করিয়া জলরাশি মুক্ত করেন এবং পৃথিবীর উপর বারিধারা পতিত হয়। ইন্দ্র অশ্বে আরোহণ করেন এবং নদী পার হইবার সময় দৃঢ় নৌকায় আরোহণ করেন। তাঁহার বহু দুর্গ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি লৌহময়, কতকগুলি প্রস্তর নির্মিত। নিরানব্বইটি (৯৯) দুর্গের উল্লেখ আছে। এই সকল শত্রুর বা দস্যুর অভেদ্য। ইন্দ্র বৈদিক আর্যগণের অতিপ্রিয় দেবতা এবং জাতীয় আদর্শ স্বরূপ। দেবতাগণের অধিপতিরূপে তাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে। 'ইন্দ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ ('ইদি ধাতু পরমৈশ্বর্যে') পরমেশ্বর অর্থাৎ যিনি সকলের অধিপতি। ইন্দ্র সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং শাসক। স্থাবর ও জঙ্গম, চেতন ও অচেতন সকল পদার্থই তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইন্দ্র সোমরস পান করেন। তাঁহার মহানন্দে সোমরসপানের বিবরণ সর্বত্রই সূক্তে কীর্তিত হইয়াছে। তাঁহার পত্নীর নাম ইন্দ্রাণী ; ইন্দ্রাণী নানাবর্ণযুক্ত উষ্ণীষ পরিধান করেন। শচীর নামও পাওয়া যায়। ইন্দ্রাণীই শচী। ইন্দ্রের একটি নাম শতক্রতু। 'ক্রতু' শব্দের যজ্ঞ অর্থ ব্যতীত 'কর্ম'ও একটি অর্থ। ইন্দ্র যুদ্ধ জয়, অসুরবধ,

দাস ও দস্যুগণের পরাভব, জলনিষ্কাসন প্রভৃতি বহু কর্ম করেন। শতক্রতু অর্থাৎ অনন্তকর্মকর্তা। এখানে 'শত' শব্দ অসংখ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণে 'শতক্রতু' শব্দের শতযজ্ঞ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। যাহা কিছু বলবীর্যের কর্ম সবই ইন্দ্রের কর্ম; 'যা চ কা চ বলকৃতিঃ ইন্দ্রকর্মৈব তৎ'। বৃত্রের বধকর্তা বলিয়া—ইন্দ্রের একটি নাম 'বৃত্রঘ্ন'। এই একই অর্থে জরথুশ্‌ত্রধর্মের 'জেন্দ আবস্তা' গ্রন্থে 'বেরেথ্রঘ্ন' শব্দ পাওয়া যায়। দাস জাতি ও দস্যুগণকেও ইন্দ্র শাস্তিদান করেন। 'দস্যু' শব্দে অনার্যজাতির ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কেবল অলোকসামান্য শারীরিক বলই যে ইন্দ্রের আছে তাহা নহে, অদ্ভুত মানসিক শক্তিতে তিনি বলীয়ান।

উপাসকদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং তাহাদিগকে প্রভূত ধনদান করেন। এইজন্য তাঁহার একটি আখ্যা 'মঘবন' অর্থাৎ ধনদাতা।

যুদ্ধকালে উভয় পক্ষের যোদ্ধৃবৃন্দ যোদ্ধার আদর্শরূপে ইন্দ্রকে বিজয়ার্থ আহ্বান করেন এবং তাঁহার কৃপাব্যতীত জয়লাভ অসম্ভব। তিনি পার্থিব রাজগণকেও প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতির বিরুদ্ধে সহায়তা করেন। সুদাস নামক রাজা তাঁহার সাহায্য লাভে বিপক্ষকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রের সকল সূক্তই ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দে গ্রথিত। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ, অন্তরীক্ষলোক, মাধ্যন্দিন সোমসবন, গ্রীষ্মঋতু, সোমপান, বীরত্বপূর্ণ কর্ম, অসুরবধ প্রভৃতির সহিত ইন্দ্রের নিত্য সম্বন্ধ।

ইন্দ্রের অসুরবধ, যুদ্ধাদি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা এবং কোন্‌ প্রাকৃতিক উপসর্গের প্রতীক ইন্দ্র ইহা লইয়া বিদ্বৎসমাজে নানামত প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন ইন্দ্র কর্তৃক অসুর ও দস্যুবধের প্রকৃত অর্থ হইল বৈদিক যুগে—আর্যগণ কর্তৃক অনার্য বা আদিবাসিগণের ক্রমশঃ পরাজয়, আর্য সভ্যতার ক্রমবিস্তার। অপর একদল বলেন ইন্দ্র সূর্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; ইন্দ্র কর্তৃক অসুরনাশ অর্থাৎ সূর্যের উদয়ে অন্ধকার বিনাশ। কেহ কেহ আবার অসুর বলিতে মেঘ এবং ইন্দ্র বলিতে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বায়ুর সমাবেশ বুঝিয়াছেন।

<u>বরুণ</u> :—ঋগ্‌বেদে দ্বাদশটি সূক্তে বরুণ দেবতার আবাহন করা হইয়াছে। বেদের দেবতামণ্ডলীর মধ্যে বরুণ গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবিত স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ঋগ্বেদের মুখ্য দেববৃন্দের তিনি একজন। মিত্র নামক দেবতার ইনি সহচর এবং তজ্জন্য 'মিত্রাবরুণৌ' দেবতা দ্বন্দ্বসমাসে উভয়ের উল্লেখ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। সূর্যের দুইটি ভিন্নরূপ মিত্র ও বরুণ। দিবাভাগের সূর্যের

নাম মিত্র এবং রাত্রিকালীন সূর্যের নাম বরুণ। 'বৃ' ধাতু হইতে 'বরুণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরুক্ত গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'আবৃণোতি সতঃ পদার্থান্ ইতি বরুণঃ' অর্থাৎ যিনি সমস্ত পদার্থকে (অন্ধকারে) আবৃত করেন। সূর্য যে কখনও অস্ত যায় না—রাত্রিকালেও যে সূর্য বিরাজ করে ইহা বৈদিক আর্যগণের সুবিদিত ছিল এবং ঐতরেয়, কৌষীতকি ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বেদে বরুণকে বিশেষ ভাবে নৈতিক জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলার রক্ষক অধিপতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহারই নিয়ন্ত্রণে ও শাসনে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি স্বীয় কক্ষপথে আবর্তন করিতেছে, বিশ্বের 'ঋত' বা নিয়ম শৃঙ্খলা তিনি রক্ষা করেন; এইজন্য তাঁহাকে 'ধৃতব্রত', 'ধর্মপতি' প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্; তাঁহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, সর্বত্রগামী। ঊর্ধ্বে বিহঙ্গকুল যতদূর গমন করে, দিক্চক্রবালে সমুদ্রের পোত যেখানে গমন করে সবই তিনি দেখিতে পান ও জানিতে পারেন। রাত্রে মনুষ্যগণ চৌর্য, ব্যভিচারাদি যাহা কিছু পাপ-কার্য করে সবই তিনি জানিতে পারেন; তাঁহার দৃষ্টি কেহ এড়াইতে পারে না। এইজন্য বরুণকে সকলে ভয় করে ও পাপ হইতে অব্যাহতিজন্য স্তুতি করে। তিনি সদয় হইলে মানব নিজের পাপ ও বংশগত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তাঁহাকে সম্রাট্ বলা হইয়াছে; এই সংজ্ঞায় নরলোক ও সুরলোকে তাঁর আধিপত্য প্রমাণিত। তাঁহার বহু চর আছে; চরগণকে 'স্পিশ' ও 'স্পশ' বলে; লাতীন (Latin) 'Spicio' ও ইংরাজী 'Spy' (স্পাই) একার্থবাচক শব্দ। বরুণের 'সম্রাট্' উপাধি এবং চর প্রভৃতি হইতে ঋগ্‌বেদীয় যুগে আর্যগণের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুন্দর চিত্র সহজেই অনুমান করা যায়। দেবগণের মধ্যে তাঁহাকে সম্রাট্ বলায় বৈদিক দেবগণের মধ্যে যে এক পরমেশ্বরের সত্তা নিহিত এই তত্ত্বেরও উপলব্ধি হয়। বরুণের একটি বিশেষণ 'অসুর' প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এই 'অসুর' শব্দের অর্থ 'অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি' যিনি প্রাণ দান করেন। এই অর্থেই 'অসুর' শব্দ মাজদীয় ধর্মগ্রন্থে 'অহুর' (অহুর মাজদা) শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বরুণ পাশ দ্বারা পাপীকে বন্ধন করেন। পুরাণে বরুণ জলের দেবতা; বেদে বরুণের উপরে উক্ত অনুরূপ চিত্র পাই। বেদে বরুণের জলের সঙ্গে মাত্র এইটুকু সম্বন্ধ আছে,—তিনি জলদান করেন এবং উদরী রোগ হইতে মুক্তি দিতে পারেন। উদরে জল সঞ্চার হইলে উদরীরোগ জন্মে। প্রাচীন গ্রীসদেশের দেবতাতত্ত্বে উরেনস (Uranos) নামে জলদেবতার সহিত বেদের

বরুণের তুলনা করা হয়। বরুণের প্রথম 'ব'কারটি অন্তস্থ 'ব' তজ্জন্য উভয়ের নামের উচ্চারণেও সাদৃশ্য আছে।

অগ্নি :—ইন্দ্রের পরেই গুরুত্বে অগ্নির স্থান। ঋক্‌সংহিতায় প্রায় দুইশত সূক্তে অগ্নির আবাহন ও স্তুতি করা হইয়াছে। শরীরধারী পুরুষের ন্যায় অগ্নির বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার আনন ও পৃষ্ঠ দেশ ঘৃতবর্ণ, কেশরাশি স্ফুলিঙ্গবর্ণ, শ্মশ্রু পিঙ্গল এবং দন্তপংক্তি সুবর্ণ ভাস্বর ; চিবুক সুগঠিত ও উন্নত। অগ্নি দেবতাদের মধ্যে আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটতম ('অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ')। দেবতারা সাক্ষাৎ ভাবে যজ্ঞের হবি আস্বাদন করেন না ; অগ্নির মুখ দিয়া আস্বাদন করেন। এই জন্যই অগ্নিকে দেবতাদের মুখ বলা হইয়াছে ; 'অগ্নির্বৈ মুখং দেবনাম্' এবং এই জন্যই যজ্ঞে হোমকুণ্ডে আহুতি দিবার সময় অগ্নির লেলিহান শিখার অগ্রভাগে আহুতি দিতে হয় ; তাহাই অগ্নির জিহ্বা। বৈদিক আর্যগণ গৃহে 'গার্হপত্য অগ্নি' রক্ষা করিতেন। অগ্নিকে এইজন্য 'গৃহপতি' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। অগ্নির

অগ্নি

রথ বিদ্যুতের ন্যায় হিরণ্য বর্ণের এবং অতি উজ্জ্বল। কয়েকটি রক্তবর্ণের এবং কয়েকটি কপিশবর্ণের অশ্ব তাঁহার রথ টানিয়া লইয়া যায়। সেই রথে তিনি যজ্ঞে আহূত অন্যান্য দেবদেবীগণকে যজ্ঞস্থলে বহন করিয়া লইয়া আসেন। তিনি দেবতাদের প্রতিনিধিরূপে যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করেন এবং পুরোবর্তী হইয়া দেবতাগণকে আনয়ন করেন বলিয়া তাঁহাকে দেবগণের 'পুরোহিত' বলা হইয়াছে। হোতা, অধ্বর্যু, পুরোহিত, ব্রহ্মন্ বিভিন্ন পুরোহিত বাচক চারিটি সংজ্ঞাই অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্র যেমন মহাযোদ্ধা অগ্নি তদ্রূপ পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অগ্নি উপাসকগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। অগ্নি দ্যুলোকে, অন্তরীক্ষলোকে ও ভূলোকে সর্বত্রই বিরাজ করেন। তিনি দ্যুলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং মাতরিশ্বা তাঁহাকে পৃথিবীতে লইয়া আসিয়াছিল। গ্রীক্ পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায় প্রমিথিউস্ (Prometheus) স্বর্গ হইতে মর্ত্যে অগ্নি লইয়া আসিয়াছিলেন ; প্রমিথিউস্‌কে গ্রীক্ মাতরিশ্বা বলা চলে। অগ্নিপূজা বা অগ্নিতত্ত্ব (fire cult) অতি প্রাচীন এবং ভারতবর্ষ, পারস্য (জরথুশ্‌ত্র ধর্মের দেশ), মিশর, গ্রীস ও রোমদেশে প্রাচীন কালে ইহা প্রচলিত ছিল। বেদের অগ্নির একটি নাম 'প্রমন্থ', গ্রীক্ প্রমিথিউস্ নামের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। আবার অগ্নিবাচক লাতিন 'ইগ্‌নিস্' (Ignis) এবং স্লাভোনিক ভাষার 'অগ্নি' (Ogni)

শব্দের সহিত সংস্কৃত 'অগ্নি' শব্দের উচ্চারণের ও অর্থের আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তই অগ্নির সূক্ত; এতদ্দ্বারাও অগ্নির প্রাধান্য প্রমাণিত।

দুইটি অরণিকাষ্ঠ পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া যজ্ঞের অগ্নি উৎপাদন করা হইত। ইহাকে 'অগ্নিমন্থন' বলা হইত। এইজন্য অরণিকাষ্ঠদ্বয়কে অগ্নির পার্থিব জনক জননী বলা হইয়াছে। অগ্নিদেবতার সকল সূক্তই গায়ত্রীছন্দোবদ্ধ।

অশ্বিনৌ বা অশ্বিদেবতা যুগল :—ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও বরুণ দেবতার পরেই গুরুত্বে ও মহিমায় অশ্বিদেবতার স্থান। এই দেবতা সর্বদা যমজরূপে কীর্তিত। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল (অশ্ব+ইন্=অশ্বিন্) যাহার অশ্ব আছে। 'অশ্বিন্' শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে 'অশ্বিনৌ'; যুগল বা যমজ বলিয়া দ্বিবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। গৌরবে বহুবচনও স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহারা বিবস্বান্ ও সরণ্যুর যমজ পুত্র একথাও বলা আছে; আবার ঋক্‌সংহিতার দুইটি ঋকে (৫-৭৫-৩ এবং ১-৪৬-২) তাঁহাদিগকে রুদ্র ও সিন্ধুর সন্তান বলা হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমে মানুষ ছিলেন,—দুইজন পুণ্যশীল রাজা, পুণ্যবলে পরে দেবত্ব লাভ করেন। এতজ্জন্য অশ্বিযুগলকে 'কর্মদেব' বলা হয়, তাঁহারা 'আজানদেব' নহেন। কর্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। সূর্যের কন্যা সূর্যা অশ্বিদ্বয়কে স্বয়ম্বর সভায় পতিরূপে বরণ করে। অশ্বিদের রথে সূর্যা গমন করেন।

অশ্বিযুগল

অশ্বিযুগল সোমরস ও মধুপান করেন, বিশেষ করিয়া মধুপান তাঁহাদের অতি প্রিয়। সূর্যা এবং উষা তাঁহাদের সহিত সোম পান করেন। তাঁহাদের রথের বর্ণ মধুর ন্যায় এবং রথটি মধুতে পরিপূর্ণ, রথটির তিনটি চক্র এবং রথটি কখনও অশ্ব, কখনও বৃহদাকার বিহঙ্গ, কখনও পক্ষযুক্ত অশ্ব এবং কখনও গর্দভ আকর্ষণ করে। অশ্বিদের আর একটি নাম 'নাসত্য'। তাঁহারা সুগন্ধি উজ্জ্বল পদ্মফুলের মালায় শোভিত হইয়া রথে গমন করেন। সমুদ্রগমনের বর্ণনাও কয়েকটি সূক্তে আছে এবং একশত দাঁড় দ্বারা চালিত ('শতারিত্রং নাবম্') তাঁহাদের সামুদ্রিক যানের উল্লেখ আছে। বিপদাপন্ন উপাসকগণকে এবং জনগণকে অলৌকিক শক্তি বলে রক্ষা করার বহু কাহিনী এই দেবতাদের সহিত বিজড়িত। জনগণকে সাহায্য দান ও বিপদ হইতে আর্তকে ত্রাণ করা তাঁহাদের একটি মুখ্য কর্ম। উদ্ধারের বহু কাহিনীর মধ্যে ভুজ্যু রাজার কাহিনী প্রসিদ্ধ। সুদূর সমুদ্রে ভুজ্যুরাজার পোত ভগ্ন হইয়া জলমগ্ন হয়।

তিনি মনে প্রাণে অশ্বিদেবতাযুগলকে স্মরণ ও স্তুতি করিতে থাকেন এবং তাঁহারা ভুজ্যুর প্রাণ রক্ষা করেন।

স্বর্গের ভিষক্ রূপে তাঁহাদের বর্ণনা সর্বত্র দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বিচক্ষণ চিকিৎসক। তাঁহাদের চিকিৎসায় অন্ধগণ দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পায়, পীড়িতগণ সুস্থ হয়, আহতগণ আরোগ্যলাভ করে।

অশ্বিদেবতার কাল সম্বন্ধে যাস্ক বলেন—সূর্যোদয়ের পূর্বে যখন আকাশ ও পৃথিবী অন্ধকার মুক্ত হয় এবং দিগন্তে অরুণ আভা ফুটিয়া উঠে সেই সময় অশ্বিদেবতার কাল। এই দেবতাযুগল কে এই বিষয়ে তাঁহার পূর্বাচার্যদের মত যাস্ক উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন অশ্বি যুগল দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রতীক। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা রাত্রি ও প্রভাতের সন্ধিক্ষণ এই উভয় সন্ধ্যাবোধক এবং এইজন্য দ্বন্দ্বরূপে কল্পিত।

রুদ্র ;—ঋক্‌বেদে রুদ্রদেবতার মাত্র তিনটি সূক্ত দৃষ্ট হয়। এতদ্‌ব্যতীত আর একটি সূক্তের একাংশে এবং অপর একটি সূক্তে সোম দেবতার সঙ্গে তাঁহার আবাহন করা হইয়াছে। রুদ্র বজ্রের দ্যোতক, বজ্রপাত, অশনিনির্ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য প্রাকৃতিক প্রতীক। ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত্যার দেবতা মরুদ্‌গণ রুদ্রের পুত্র রূপে উক্ত হইয়াছে। রুদ্রের ব্যক্তিত্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁহার রূপের বিবিধ বর্ণনা বেদে দৃষ্ট হয়। তাঁহার বলিষ্ঠ বাহু, সুগঠিত ওষ্ঠাধর, আদিত্যবৎ ভাস্বর দেহকান্তি, সুবর্ণনির্মিত অলংকার, কনকনিভ জটাকলাপের প্রশংসায় সূক্ত তিনটি মুখরিত। তিনি রথে বিচরণ করেন এবং ধনুর্বাণ ও ভীষণ বজ্র-আয়ুধে ভূষিত। ‘রুদ্র’ নামের উপযোগী তাঁহার ভীতিসঞ্চারক কার্যকলাপ। তিনি ক্রূরকর্মা ভীমদর্শন ও সংহারক। ঋগ্বেদে রুদ্রের এই সংহারক ভীষণ রূপই পাওয়া যায়, শিবরূপ

রুদ্র

দৃষ্ট হয় না। জীবলোকে সকলেই তাঁহাকে ভয় করে এবং তাঁর চরণে কাতর আকুতি জানায় যে তিনি যেন উপাসকের পুত্র, পৌত্র, গো, অশ্ব প্রভৃতি বিনাশ না করেন ; ‘মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ’ (ঋগ্‌বেদ ১-৮-৬ এবং শুক্ল যজুর্বেদ ১৬-১৬) অর্থাৎ,—‘হে রুদ্র ! আমাদের পুত্র, পৌত্র, আমাদের জীবন ও আমাদের গো, অশ্বাদি পশুকে তুমি হিংসা করিও না।’ রুদ্রের ক্রোধ তাঁহার বজ্রের মতনই অতি ভীষণ। তিনি অত্যন্ত শক্তিমান, ক্ষিপ্রগামী, যুদ্ধে অজেয়, তেজে অধৃষ্য এবং ক্ষমতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি প্রাচীন হইয়াও চির যুবা। দেব ও মনুষ্যগণের সকল আচরণ তিনি দেখিতে পান। তাঁহাকে বিশ্বের ‘ঈশান’ বা ঈশ্বর সংজ্ঞাও দেওয়া হইয়াছে।

রুদ্রের ভীষণ রূপের বর্ণনার প্রাচুর্য ঋগ্‌বেদে দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু কয়েকটি কল্যাণ রূপেরও উল্লেখ আছে। তিনি বৈদ্যরাজ, ভিষক্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভিষক্‌; 'ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি' (২-৩৩-৪)। একটি ঋকে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন,—'শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ (২-৩৩-২) অর্থাৎ 'হে রুদ্র! আমি যেন তোমার প্রদত্ত ঔষধের বলে একশত শীতকাল (বৎসর) বাঁচিয়া থাকি।' রুদ্রের এই ভিষক্‌রূপে ব্যাধি আরোগ্য করার বর্ণনায় আমরা তাঁহার রুদ্র রূপের মধ্যেও কল্যাণরূপের আভাস পাই। এই কল্যাণ বা শিবরূপ পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে শুক্ল যজুর্বেদের বিখ্যাত রুদ্রাধ্যায়ে। তথায় রুদ্রকে যেমন 'ঘোর', 'ঘোরতর' (ভীষণতর) বলা হইয়াছে তদ্রূপ 'শিব' 'শিবতর'-ও বলা হইয়াছে এবং রুদ্রকে শিব, শংকর ময়স্কর, শম্ভব, ময়োভব প্রভৃতি কল্যাণবাচক সংজ্ঞায় স্তুত করা হইয়াছে। রুদ্রকে মনুষ্যের রক্ষক, অশ্বের রক্ষক, গোজাতির রক্ষক, কুক্কুরের রক্ষক এবং ব্যাধ, শবরাদি অনার্য জাতির রক্ষক রূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

'রুদ্র' শব্দের নির্বচন বা ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে, এই দেবতা জন্মিয়াই ভীষণ রোদন করিয়াছিলেন তজ্জন্য রুদ্র নাম হইয়াছে; 'স জাত এবারোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্‌।' পণ্ডিতগণ ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—রুদ্রের জন্মমাত্র ভীষণ রোদনের অর্থ হইল বজ্রের জন্মমাত্র অর্থাৎ বজ্রপাত মাত্র ভীষণ নির্ঘোষ। যখনই বজ্রপাত হয় তখনই ভীষণ শব্দ হয়। রুদ্রই বজ্র তজ্জন্য রুদ্রের জন্মমাত্র ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হয়। পুরাণে রুদ্রের রুদ্‌ ধাতুটিকে নিজন্ত রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—'যিনি সকলকে অন্তিম-কালে রোদন করান।' সায়নাচার্য এই পৌরাণিক ব্যাখ্যাই অবলম্বন করিয়াছেন। সায়নের কাল চতুর্দশ শতাব্দী (খৃষ্টাব্দ); তখন পুরাণের পূর্ণ প্রভাব; তজ্জন্য তাঁহার বেদের বহু স্থানের ব্যাখ্যা পৌরাণিক কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত।

কোন্‌ প্রাকৃতিক উপসর্গ রুদ্রের প্রতীক ইহা লইয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। মেক্‌ডোনেল (Macdonell) মনে করেন বিদ্যুৎসহ ঝড় ঝঞ্ঝাই রুদ্রের প্রতীক। তাঁহার ছাত্র কীথ (Keith) বলেন ঝড় ও বজ্রই রুদ্রের বাহ্যরূপ। লুই রেণু (Louis Renou) এই মত স্বীকার করেন নাই এবং কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যান্তরও দেন নাই। ঋগ্‌বেদের রুদ্রসূক্ত অবহিতভাবে পাঠ করিলে রুদ্রের পার্থিব প্রতীক যে বজ্র সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না।

লোমেল (Lommel) প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত রুদ্রদেবতা অনার্যগণ হইতে আর্যগণ লইয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন। শুক্ল যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্র অনার্যগণের রক্ষকরূপে কীর্তিত হইয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে কতিপয় অনার্যজাতির উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু ঋগ্‌বেদের রুদ্র সূক্তে কোনও অনার্যজাতির প্রসঙ্গ নাই এবং অনার্যগণের নিকট হইতে ধার করার কোনও প্রমাণ নাই। খ্যাতনামা পণ্ডিত অটো (Otto) এবং হাউয়ার্ (Hauer) বলেন ঋগবেদের রুদ্র সম্পূর্ণ আর্যদেবতা। সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ অধ্যয়নে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে আর্য অনার্য উভয় ধর্মে রুদ্র দেবতার উপাসনা, পূজা প্রচলিত ছিল ; পরবর্তিকালে উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটে।

মরুৎ—ঋগ্‌বেদে 'মরুৎ' নামক দেবতাবৃন্দ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহাদের উদ্দেশে তেত্রিশটি সূক্ত দৃষ্ট হয় ; তদ্ব্যতীত ইন্দ্রের সহিত একযোগে আহূত সাতটি সূক্ত, অগ্নির সঙ্গে একটি ও পূষার সঙ্গে একটি সূক্ত পাওয়া যায়। মরুৎ বলিতে একজন দেবতা নহে, একদল দেবতা বুঝায়, তজ্জন্য সর্বদা বহুবচনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কয়জন দেবতা মিলিয়া মরুৎসমষ্টি গঠিত তাহার সংখ্যা ঋগ্‌বেদের এক এক মন্ত্রে এক এক প্রকার পাওয়া যায়। একটি ঋকে (৮-২৮-২) সাতজন, একটি ঋকে (৫-৫২-১৭) উনপঞ্চাশ জন, আবার (৮-৯৬-৮) এক মন্ত্রে তেষট্টি জন মরুতের উল্লেখ আমরা পাই। সাধারণতঃ ঋগ্‌বেদের যুগে এই সংখ্যা সাত ছিল বলিয়াই বিদ্বদ্‌বর্গ মনে করেন এবং পৌরাণিক যুগে ইহা সাত গুণ সাত অর্থাৎ উনপঞ্চাশে দাঁড়ায়। রুদ্রদেবতার ঔরসে পৃশ্নির গর্ভে মরুদ্‌গণের জন্ম হইয়াছিল। পৃশ্নি শব্দের সাধারণ অর্থ চিত্রিত (Spotted, dappled) ; এস্থলে পৃশ্নি বলিতে ধূসর, কৃষ্ণ, নীল প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত মেঘ বোধ্য। অন্তরীক্ষলোকের উদরে বায়ু মরুদ্‌গণকে সৃষ্টি করেন। মরুদ্‌গণের বাহ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতীক হইল ঝঞ্ঝা বাত্যা। বজ্র, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি ও ভীমপ্রভঞ্জনের সহিত তাঁহাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

মরুদ্‌গণ

মরুদ্‌দেবতাগণ উজ্জ্বল বেশভূষাশোভিত, স্বর্ণবর্ণ এবং অতি তেজস্বী। তাঁহারা পুষ্পমাল্য, সুবর্ণ উত্তরীয়, স্বর্ণালংকার এবং হিরণ্ময় উষ্ণীষ ধারণ করেন। বেগবান চিত্রিত অশ্বকর্তৃক বাহিত সুবর্ণমণ্ডিত রথে তাঁহারা গমন করেন ; সেই রথ হইতে বিদ্যুৎপ্রভা বিচ্ছুরিত হয়। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এই দেবগণের হস্তে বল্লম, তীর, ধনুক বিরাজ করে। তাঁহাদের গর্জন অশনির নির্ঘোষে শ্রুত হয় এবং সেই ভীষণ শব্দে দ্যুলোক, ভূলোক ত্রাসে কম্পিত হয়। ভীষণ

বেগে ত্রিভুবনে তাঁহারা গমন করেন, বিশাল বৃক্ষরাজি উৎপাটিত এবং অরণ্যানী উন্মথিত করেন। দেবলোকের গায়করূপে মরুদ্‌গণের বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহারা গান করেন এবং বংশীবাদন করেন। এই গান ও বংশীধ্বনি ঝঞ্ঝার সময় প্রভঞ্জনের বিবিধ শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইন্দ্র এবং এই দেববৃন্দ উভয়েই অন্তরীক্ষলোকবাসী বলিয়া ইন্দ্রের সহিত মরুদ্‌বৃন্দের সদা সাহচর্য ঋগ্‌বেদে কীর্তিত হইয়াছে। তাঁহারা ইন্দ্রের বন্ধু ও সখা, এবং ইন্দ্রের শক্তি বর্ধন করেন।

বৈদিকোত্তর যুগে 'মরুৎ' শব্দ বায়ুর একটি নামে পরিণত হয়, ঝঞ্ঝাবাত্যার বৈদিকযুগের বিশেষ রূপটি বিলুপ্ত হয়। ভিকাণ্ডার (Wikander) মনে করেন মরুদ্‌গণ বৈদিকযুগের যুদ্ধপ্রিয় অর্ধসভ্য একদল মানবের প্রতীক মাত্র ; আবার হিলেব্রান্‌ট (Hillebrandt) মরুদ্‌গণকে মৃত পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় ব্যাখ্যাই ভিত্তিহীন এবং ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। ম্যাক্‌ডোনেল এই দেবগণকে 'Storm-Gods' অর্থাৎ ঝঞ্ঝার অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়াছেন এবং এই ব্যাখ্যাই সমীচীন।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে বৃহস্পতি, বায়ু, সূর্য, অপাং নপাৎ, বিষ্ণু, উষা, বাক্‌, পর্জন্য প্রভৃতি আরও কয়েকজন দেবতার আলোচনা করা হইয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

যজ্ঞ ও পুরোহিত

পুরোহিত

যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ষোলজন পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে মূল পুরোহিত চারিজন যথা, ঋগ্‌বেদীয় পুরোহিতের নাম হোতা, সামবেদীয় পুরোহিতের নাম উদ্‌গাতা, যজুর্বেদীয় পুরোহিতের নাম অধ্বর্যু এবং ঋক্‌-সাম-যজু ত্রিবেদবিৎ পুরোহিতের নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত পুরোহিত বা ঋত্বিক। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রধান পুরোহিত এবং যজ্ঞ কর্মে যদি কোনরূপ বিকলতা বা বৈগুণ্য ঘটে তার জন্য তিনিই দায়ী। সমগ্র যজ্ঞকর্মটি তিনি পরিচালনা করেন। প্রত্যেক পুরোহিতের তিনজন করিয়া সহকারী পুরোহিত আছেন। মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ—এই তিনজন

পুরোহিত হোতার সহকারী। প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য এই তিনজন উদ্গাতার সহকারী। প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা এই তিনজন অধ্বর্যুর সহকারী এবং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নীধ্র ও পোতা এই তিনজন ব্রহ্মার সহকারী। এই ষোলজন পুরোহিত ব্যতীত কৌষীতকিব্রাহ্মণমতে সদস্য নামে অপর একজন পুরোহিত আছেন; তাঁহাকে লইয়া পুরোহিতের সংখ্যা সর্বসমেত সপ্তদশ। অন্য একদলের মতে যেহেতু যজমানকেও বহু মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ও বহুপ্রকারের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তিনিও পুরোহিত পদবাচ্য এবং তাঁহাকে লইয়া পুরোহিতের সংখ্যা সপ্তদশ হয়। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে পুরোহিতগণের নাম শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ আছে।

'অধ্বর্যুং প্রতিপ্রস্থাতারং নেষ্টারমুন্নেতারমিত্যধ্বর্যূন্
ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনমগ্নীধ্রং পোতারমিতি ব্রহ্মণঃ।
হোতারং মৈত্রাবরুণমরচ্ছাবাকং গ্রাবস্তুতমিতি হোতৄন্,
উদ্গাতারং প্রস্তোতারং প্রতিহর্ত্তারং সুব্রহ্মণ্যমিতি উদ্গাতৄন্।
সদস্যং সপ্তদশং কৌষীতকিনঃ সমামনন্তি ॥'

ঋগ্বেদীয় পুরোহিত হোতা ঋক্সংহিতার মন্ত্রব্যাহরণে দেবতাগণকে আহ্বান করেন। সামবেদজ্ঞ পুরোহিত উদ্গাতা সামগান গাহিয়া দেবতাগণের স্তুতি করেন। উদ্গাতা নামটির মধ্যেই গায়কের ইঙ্গিত রহিয়াছে। যজুর্বেদবিৎ অধ্বর্যু যজ্ঞের সকল কর্ম সম্পাদন করেন। অধ্বর্যু নামটি 'অধ্বর' বা 'যজ্ঞ' হইতে আসিয়াছে। নিরুক্তকার যাস্ক 'অধ্বর্যু' শব্দটির নির্বচন এই ভাবে দেখাইয়াছেন—'অধ্বর্যু অধ্বরযু অধ্বরং যুনক্তি অধ্বরস্য নেতা' অর্থাৎ তাঁহাকেই অধ্বর্যু বলা হয় যিনি অধ্বরকে যজ্ঞকে যুক্ত করেন রূপায়িত করেন এবং যজ্ঞের সকল কর্ম সম্পাদন করেন। যজ্ঞের বেদী-নির্মাণ, হোমকুণ্ড নির্মাণ পুরোডাশাদি হব্যদ্রব্য পাক, আহুতি প্রদান প্রভৃতি সমস্তই অধ্বর্যুর সম্পাদন করিতে হয়। তজ্জন্য যজ্ঞনিষ্পাদনে যজুর্বেদীয় পুরোহিতের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মা ত্রিবেদবিৎ। তিনি ঋক্ সাম যজুঃ ত্রিবেদজ্ঞ তজ্জন্য তিন বেদের ভিন্ন ভিন্ন পুরোহিতদের ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারেন ও সর্ববিষয় চালনা করিতে পারেন।

প্রত্যেক যজ্ঞে এত জন অর্থাৎ ষোলজন পুরোহিতের আবশ্যক হয় না। বিভিন্ন যজ্ঞের বর্ণনাকালে কোন যজ্ঞে কয়জন পুরোহিতের প্রয়োজন তাহা আমরা উল্লেখ করিব।

যজ্ঞ

যজ্ঞের পাঁচটি প্রকার দৃষ্ট হয় যথা—হোম, ইষ্টি, পশু, সোম ও সত্র। প্রত্যেক বৈদিক যাগ প্রকৃতি ও বিকৃতি ভেদে দ্বিবিধ। প্রকৃতি যাগকে প্রধান যাগও বলা হয়। এক একটি প্রকৃতি যাগের বহু বিকৃতি বা রূপান্তর দৃষ্ট হয়। এক জাতীয় যাগের মূল রূপটিকে প্রকৃতি বা প্রধান বলে। সেই প্রকৃতিযাগকে আদর্শ (Model) রাখিয়া বিকৃতি যাগগুলি অনুষ্ঠিত হয়। বিকৃতি যাগের আর একটি নাম অঙ্গযাগ। প্রকৃতি যাগ অঙ্গী বা মূল যাগ এবং বিকৃতি তাহার অঙ্গ। পাঁচ প্রকার বৈদিক যাগের প্রকৃতি দেখান হইতেছে। হোমের প্রকৃতি অগ্নিহোত্র, ইষ্টির প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস, পশুযাগের প্রকৃতি দৈক্ষ প্রাজাপত্য পশু, সোমযাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম এবং সত্র জাতীয় যাগের প্রকৃতি গবাময়ন। অবশ্য সত্র সোমযাগেরই অন্তর্ভুক্ত কিন্তু দীর্ঘকাল সাধ্য ভিন্ন জাতীয় যাগ বলিয়া পৃথক উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন আমরা সংক্ষেপে পাঁচটি যাগের বর্ণনা দিব।

হোম :—হোম যাগকে দর্বীহোমও বলা হয়। এই যাগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গৃহস্থের অগ্নিকুণ্ডে দুগ্ধ, দধি, পুরোডাশ, প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হয়। সূর্য ও অগ্নি এই যাগের দেবতা। প্রাতে সূর্যকে উদ্দেশ করিয়া ও সন্ধ্যায় অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্রপাঠ ও আহুতি দিতে হয়। ইহাকে দর্বীহোমও বলা হয় কারণ দর্বী বা হাতা সাহায্যে আহুতি হোমকুণ্ডে অর্পণ করা হয়। হোমজাতীয় যাগের প্রকৃতি হইল অগ্নিহোত্র। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রিবর্ণের প্রত্যহ অগ্নিহোত্র যাগ করিতে হইত। ব্রাহ্মণের জন্য ইহা বাধ্যতামূলক ছিল এবং নিজে অনুষ্ঠান করিতে হইত, পুরোহিত দ্বারা করাইবার বিধি ছিল না। অন্য দুই বর্ণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরোহিত দ্বারা করাইত। ব্রাহ্মণের যাবজ্জীবন সস্ত্রীক অগ্নিহোত্র যাগ প্রত্যহ করিতে হইত।

'ব্রাহ্মণোঽহরহঃঅগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' ব্রাহ্মণ প্রত্যহ অগ্নিহোত্র হোম করিবে। শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তি (১২-৪-১-১) 'এতদ্বৈ জরামর্যং সত্রং জরয়াহ্বেবাস্মাৎ মুচ্যতে মৃত্যুনা বা' অর্থাৎ এই অগ্নিহোত্রকে জরামর্য সত্র বলা হয় কারণ জরা বা মৃত্যু ব্যতীত এই যাগের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান হইতে ব্রাহ্মণের অব্যাহতি নাই। ব্রাহ্মণের ইহা নিত্যকর্ম। অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যে ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে বহু অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। আমরা যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র তখন শ্রদ্ধেয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক আনীত

দুজন স্বনামধন্য অধ্যাপক সংস্কৃতবিভাগে অধ্যাপনা করিতেন, মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ; প্রথম জন মহারাষ্ট্রী ও দ্বিতীয় জন মাদ্রাজী ছিলেন। উভয়েই অগ্নিহোত্রী ছিলেন ; প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় হোম করিতেন। প্রাতে অগ্নিহোত্র হোম সারিয়া তৎপর দৈনন্দিন সাংসারিক কর্মাদি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে আসিতে হইত, তাঁহাদের উভয়ের অধ্যাপনার সময় মধ্যাহ্নে ১২টা হইতে স্যার আশুতোষ করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে অগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত না হয়। এই দুইজন অধ্যাপকের মধ্যে অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী উদার মতাবলম্বী ছিলেন ; তিনি আমাকে তাঁহার অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান দেখিতে দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া ঐ হোম সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছিল। এই যাগে প্রাতে সূর্যের উদ্দেশে ও সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। একই মন্ত্র দুই বেলা পাঠ করা হয়, কেবল প্রাতে 'সূর্যঃ জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ সূর্যঃ' ও সন্ধ্যায় সূর্যের পরিবর্তে অগ্নিশব্দ যুক্ত করিয়া 'অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ' বলিতে হয়। সন্ধ্যায় সূর্য তাঁহার তেজ অগ্নিতে নিহিত করিয়া অস্ত যান তজ্জন্য সূর্যের স্থলে অগ্নি পাঠ বিহিত। প্রাতের আহুতি সূর্যোদয়ের পূর্বে অথবা পরে কখন দেওয়া উচিত এবং সায়ন্তন আহুতি সূর্যাস্তের পূর্বে বা পরে কখন দেওয়া কর্তব্য ইহা লইয়া ব্রাহ্মণগ্রন্থে বহু বিতর্কের অবতারণা দৃষ্ট হয়। একদলের মতে প্রাতে উদয়ের পূর্বে হোম কর্তব্য ; তাঁহারা বলেন উদয়ের পূর্বে হোম না করিলে আদিত্য সেই আহুতি গ্রহণ করেন না। সেই আহুতি শূকরে গ্রহণ করে। অপর একদল বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন সূর্যের উদয়ই হয় নাই, আদিত্য বিম্ব দৃষ্টিগোচর হয় নাই অতএব কাহাকে আহুতি দিবে ; উদয়ের পূর্বে আহুতি দিলে সে আহুতি নিষ্ফল। এইরূপ সায়ন্তনে একদলের মতে সূর্যাস্তের পূর্বে অপরদলের মতে সূর্যাস্তের পরে আহুতি প্রদান বিধেয়। শ্রৌতসূত্রে এই বিবাদ বিতর্কের মীমাংসা করা হইয়াছে। বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা অনুযায়ী আহুতির সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা বহ্বৃচ ও ছন্দোমশাখার দ্বিজাতিগণ সূর্যোদয়ের পূর্বে হোম করিবেন ; তজ্জন্য তাঁহাদের 'অনুদিতহোমী' বলা হয়। আবার কঠ, তৈত্তিরীয় ও মৈত্রায়নী শাখার ব্রাহ্মণগণ উদয়ের পরে হোম করিবেন, তজ্জন্য তাঁহাদের "উদিত হোমী" বলা হইয়া থাকে। অনুদিতহোমী বা উদিতহোমী উভয়দলেরই কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বেই গার্হপত্য অগ্নি হইতে অগ্নিচয়ন করিয়া আনিয়া অগ্নিহোত্রের হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করিতে হইবে।

অগ্নিহোত্রের প্রধান আহুতিদ্রব্য দুধ, তজ্জন্য একটি পৃথক গাভী যজমানের পালন করিতে হয়। তাহাকে অগ্নিহোত্রী গাভী বলে। যজুর্বেদীমধ্যে একটি মৃৎপাত্রে দুধ গরম করা হয় এবং "অগ্নিহোত্রহবনী" নামক হাতার সাহায্যে আহবনীয় অগ্নিতে দুধের আহুতি দিতে হয়। প্রাতে দুইটি প্রধান আহুতি প্রথমটি সূর্যের ও দ্বিতীয়টি প্রজাপতির উদ্দেশে এবং সন্ধ্যায় দুইটি প্রধান আহুতি ; একটি অগ্নির অপরটি প্রজাপতির উদ্দিষ্ট। 'অগ্নিহোত্র' যাগ প্রথম যেদিন আরম্ভ হয় সেদিন প্রথম যাগটি সন্ধ্যায় করিতে হয় ; সন্ধ্যায় অগ্নি-দেবতার প্রাধান্য। এই জন্যই যাগটির 'সূর্যহোত্র' নাম না হইয়া 'অগ্নিহোত্র' নাম হইয়াছে। আপস্তম্ব তাঁহার শ্রৌতসূত্রে (৬-১৩-১ হইতে ৬-১৩-৯) এই এই তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণের এই যাগ নিজে করিতে হইবে ; পুরোহিত দ্বারা করান চলিবে না। যদি ব্রাহ্মণ যজমান অসুস্থতাজন্য অক্ষম হইয়া পড়েন সেক্ষেত্রে পুত্র বা পুত্রাভাবে পুরোহিত নিয়োগ বিহিত ; কিন্তু পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন নিজে করিতেই হইবে অসুস্থতাসত্ত্বেও, অন্যের দ্বারা সেই দুই দিন করান চলিবে না। অবিবাহিতের অগ্নিহোত্রে অধিকার নাই। বিবাহিত কিন্তু বিপত্নীক এইরূপ ব্যক্তিরও অধিকার নাই কারণ গৃহস্থের সর্বদাই পত্নীসহ অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করণীয়। বিপত্নীক হইলে অগ্নিহোত্র জন্য পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে হইবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা আছে যদি পত্নী বিগত হইলে যজমান পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে শ্রদ্ধাকে পত্নী কল্পনা করিয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবেন।

ইষ্টি ;—ইষ্টি জাতীয় যাগের প্রকৃতি বা প্রধান যাগের নাম দর্শপৌর্ণমাস। 'দর্শ' কথাটির অর্থ 'সূর্যেন্দুসঙ্গমঃ' অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গম অর্থাৎ অমাবস্যা। 'পৌর্ণমাসী' অর্থাৎ পূর্ণিমা। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এই যজ্ঞ করিতে হয়। অবিবাহিতও নহে বিপত্নীকও নহে এইরূপ আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য এই যাগের অধিকারী। 'আহিতাগ্নি' শব্দের অর্থ যাহার গার্হপত্য অগ্নি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অমাবস্যায় দুই দিন ও পূর্ণিমায় দুই দিন এই ইষ্টির অনুষ্ঠান করিতে হয়। পূর্ণিমার ক্ষেত্রে পূর্ণিমার দিন প্রাতঃ হইতে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ও পরদিবস অর্থাৎ প্রতিপদ দিবস মধ্যাহ্নে শেষ হয়। অমাবস্যাতেও এইভাবে অনুষ্ঠান বিহিত। এই যাগের যেদিন প্রথম অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে সেই দিনটি পূর্ণিমা হওয়া চাই। অমাবস্যাতে প্রথম আরম্ভ হইতে পারিবে না। এই যাগের জন্য চারিজন পুরোহিত প্রয়োজন,—হোতা,

অধ্বর্যু, অগ্নীধ্র এবং ব্রহ্মা। পুরোহিতদিগের মধ্যে তর তম ভেদ নাই। সোম যাগে ব্রহ্মা অন্যান্য পুরোহিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সকলেই তাঁহাকে সম্মান করেন; তিনি যজ্ঞের পরিচালক কিন্তু ইষ্টি যাগে চারিজন পুরোহিতেরই সমান অধিকার ও সম্মান। যদিও বিবিধ আনুষঙ্গিক গৌন আহুতি ও দেবতার নাম ইষ্টিতে শ্রুত হয় তথাপি তিনটি আহুতিই মুখ্য। প্রথম আহুতিতে অগ্নি দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ অর্পিত হয়। দ্বিতীয় আহুতিকে উপাংশুযাজ বলা হয়; তাহা বিষ্ণু, প্রজাপতি, অগ্নি ও সোম এই চারি দেবতার একজনকে নিবেদন করা হয়। তৃতীয় আহুতিতে অগ্নি ও সোম যুগ্ম দেবতাকে পুরোডাশ দেওয়া বিধেয়। অমাবস্যার ক্ষেত্রে পুরোডাশনিষ্ঠ প্রথম আহুতি অগ্নি দেবতার উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আহুতির দেবতা ইন্দ্র এবং যথাক্রমে দধি ও দুগ্ধ হব্যদ্রব্য। যজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অবশ্য কর্তব্য প্রযাজ অনুযাজ ও পত্নীসংযাজ নামক অনুষ্ঠানগুলি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় অনুষ্ঠেয়। ইষ্টি যজ্ঞের সমাপ্তি সময়ে অগ্নিস্বিষ্টকৃৎ নামক আহুতি অগ্নিদেবতাকে অর্পণ করিতে হয়। ইহার পর পুরোহিতগণ যজ্ঞের আহুতি অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করেন, তাহাকে ঈড়াভক্ষণ বলে। দুগ্ধ, দধি, পুরোডাশ সকল হব্যদ্রব্যের আহুতি অনন্তর অবশিষ্ট অংশমিশ্রণে এই ঈড়া প্রস্তুত হয়। অনুযাজ ও পত্নীসংযাজ অনন্তর যজমানের প্রতীক কুশনির্মিত একটি মূর্তি যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ কুশমূর্তিকে "কুশপ্রস্তর" বলে। যখন মূর্তিটি অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হয় তখন যজমান মনে করেন তাঁহার পার্থিব নশ্বর শরীর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যজ্ঞের মাধ্যমে তাঁহার আত্মা বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। এই অনুধ্যান যজমানকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি মনে করেন তিনি বিষ্ণু দেবতার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন এবং "বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্' মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যজ্ঞক্ষেত্রে তিনপদ গমন করেন। এই দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি নিত্য বা কাম্য দুইরূপ হইতে পারে। যাঁহারা যাবজ্জীবন অবিচ্ছেদে প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় ইহার অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে ইহা নিত্য। যাঁহারা নিয়মিত ইহার অনুষ্ঠান করেন না, কোনও কামনা সিদ্ধির জন্য কদাচিৎ অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে ইহা কাম্য ইষ্টি। কাম্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধান্য অথবা যব দ্বারা পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয়, গোধূমের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

শতপথ ব্রাহ্মণের মতে দর্শপূর্ণমাস সকল যজ্ঞের প্রকৃতি। এই ব্রাহ্মণের প্রথমেই এই ইষ্টির আলোচনা দৃষ্ট হয়। বহু প্রকারের ইষ্টি যাগ আছে।

যথা, পুত্রলাভের জন্য 'পুত্রেষ্টি', অনাবৃষ্টির সময়ে বৃষ্টি আনয়ন জন্য 'কারীরি ইষ্টি'; ক্ষেত্রের প্রথম শস্য বা গাছের প্রথম ফল দেবতাকে অর্পণ জন্য 'আগ্রায়ণ ইষ্টি' প্রভৃতি। সকল ইষ্টিরই প্রকৃতি বা আদর্শ দর্শপূর্ণমাস।

পশুযাগ;—দৈক্ষ বা প্রাজাপত্যপশু সকল পশুযাগের প্রকৃতি। ইহাকে নিরূঢ় পশুবন্ধও বলা হয়। আহিতাগ্নি ত্রৈবর্ণিক পুরুষ পশুযাগের অধিকারী। প্রতি বৎসর এই যাগ একবার করিয়া করিতে হইবে। প্রয়োজনে বৎসরে দুইবার বা ছয়বার পর্যন্ত করা চলে। যদি মাত্র একবার করা হয় তাহা হইলে প্রতি বর্ষাকালে অনুষ্ঠেয়। বৎসরে দুইবার করিলে একটি সূর্যের উত্তরায়ণ কালে অপরটি দক্ষিণায়ন কালে করিতে হইবে। ছয়বার করিলে ছয় ঋতুর প্রতি ঋতুতে এক একটি যাগ বিধেয়।

এই যাগের আহুতিদ্রব্য পশু তজ্জন্য ইহাকে পশুযাগ বলে। একটি ছাগ আহুতি দিতে হয়। ছাগের সকল অঙ্গ আহুতি দিতে হয় না; হৃদযন্ত্র, মেদ প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হয়। পশুযাগের দেবতা প্রজাপতি, সূর্য অথবা ইন্দ্র, এবং অগ্নি। ছয়জন পুরোহিত প্রয়োজন—অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, হোতা, মৈত্রাবরুণ, অগ্নীৎ ও ব্রহ্মা। ইষ্টিজাতীয় যাগে অনুবাক্যা ও যাজ্যা উভয়বিধ মন্ত্রই হোতা ব্যাহরণ করিয়া থাকেন কিন্তু পশুযাগে হোতা কেবল যাজ্যা মন্ত্র উচ্চারণ করেন, মৈত্রাবরুণ নামক ঋগ্‌বেদীয় পুরোহিত অনুবাক্যা উচ্চারণ করেন। প্রৈষমন্ত্ররাজিও মৈত্রাবরুণের পাঠ্য।

পশুযাগে আহুতির পশুবন্ধন জন্য যূপকাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। পলাশ, খদির, বিল্ব অথবা রোহিতক চারিজাতীয় বৃক্ষের কাঠ যূপ নির্মাণে বিহিত। এক একজাতীয় কাঠের যূপে এক একটি বিশিষ্ট ঐহিক ও পারত্রিক ফল লাভ হয়। যজ্ঞবেদীর পূর্বতম প্রান্তে যূপ বসাইতে হয়। সাধারণতঃ জাতদন্ত খঞ্জত্বকানত্বাদিদোষরহিত পুংছাগই বলির দ্রব্যরূপে বিহিত। মন্ত্রপূত ছাগটিকে পুরোহিত প্লক্ষবৃক্ষের শাখা দ্বারা স্পর্শ করিয়া,—'অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টমুপাকরোমি' মন্ত্র পাঠ করেন। এই কর্মটিকে উপাকরণ বলে। বলির পশুটিকে শ্বাসরোধ করিয়া বধ করা হয়। এই ভাবে বধ করাকে 'সংজ্ঞপন' বলে। নিহত পশুটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শমিতা নামক পুরোহিত ব্যবচ্ছেদ করেন। যজ্ঞস্থলের উত্তরপূর্ব দিকে পশুর সংজ্ঞপন ও ব্যবচ্ছেদাদি জন্য 'শামিত্র' নামে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। পশুর বসা অর্থাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের মেদ অধ্বর্যু নামক পুরোহিত আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দান করেন। একটি মৃৎপাত্রে পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শামিত্র প্রদেশে—'শামিত্র' নামক বহ্নিকুণ্ডে পাক করা হয়। পাককার্য

চলিতে থাকা অবস্থায় একটি পুরোডাশ যাগে আহুতি দেওয়া হয়। একমাত্র প্রতিপ্রস্থাতা নামক পুরোহিত ব্যতীত যজমানসহ অন্যান্য সকল পুরোহিত অর্পিত পুরোডাশের অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করেন। ইষ্টিযাগের আলোচনায় উক্ত হইয়াছে এই কর্মকে ঈড়াভক্ষণ বলে। এই অনুষ্ঠানের পর মৃৎপাত্র হইতে পশুর সিদ্ধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহির করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অধ্বর্যু আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দেন। মৃৎপাত্রে পশুমাংসের বসা নামক যে জলীয় অংশ বা রস সঞ্চিত হয় তাহাও আহুতি দেন। এই অনুষ্ঠানের পর একাদশটি অনুযাজ ও পত্নীসংযাজ অনুষ্ঠিত হয়।

পশুযাগে পশুর সংজ্ঞপন বা শ্বাসরোধে হত্যাকে বধ বলিয়া মনে করা হয় না। বৈদিক বিধি অনুযায়ী ইহা বধ নহে, পাপও নহে। যজ্ঞে কোন পশুকে আহুতি দিলে সেই পশু নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া যে দেবতার উদ্দেশে তাহাকে আহুতি দেওয়া হয় সেই দেবতার সহিত পশুর আত্মা সাযুজ্য লাভ করে। যজ্ঞের মাধ্যমে সহজেই পশুর এই দৈবী রূপান্তর ঘটে। পশুকে লক্ষ্য করিয়া এই মর্মে ঋক্ সংহিতার একটি ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'ন বা উ এতন্ ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবা—
ইদেসি পথিভিঃ সুগেভিঃ'

অর্থাৎ 'হে পশু, তুমি মৃত্যুলোকে গমন করিতেছ না বা তোমাকে হিংসা করা হইতেছে না, সহজগম্য পথে তুমি দেবতার কাছে যাইতেছ।' মনু ও এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—'যজ্ঞে বধোঽবধঃ' যজ্ঞে বধ অবধের অর্থাৎ বধ না করার সমতুল্য ; পশুকে বধ করা হয় না, দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

পুরোডাশের ঈড়াভক্ষণের ন্যায় পশুযাগে আহুতি-অবশিষ্ট পশু-মাংসের ও বিধি-দৃষ্ট হয়। এই পশুমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে দুইটি বিপরীত মত আছে। একদল বলেন পশু যজমানের প্রতীক। পশুর মাধ্যমে যজমান নিজেকে আহুতি দিয়া দেবত্ব লাভ করেন। অতএব পশুমাংস ভক্ষণ করিলে তাহা যজমানের স্বীয় মাংস ভক্ষণতুল্য হইবে, অতএব ইহা নিষিদ্ধ। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২-৬-৩) এই মতের সমালোচনা ও খণ্ডন করা হইয়াছে। অগ্নি এবং সোম দেবতাদ্বয়ের সাহায্যে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন এইজন্য অগ্নি ও সোম ইন্দ্রের নিকট একটি পশু বরস্বরূপ চাহেন ও ইন্দ্র প্রার্থিত বর দান করেন। যজ্ঞে ইন্দ্রের ঐ বর প্রদানের পরিপূর্তি স্বরূপ অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে পশুবলি দেওয়া হয় ; যজমানের

প্রতীকরূপে পশুবলি দেওয়া হয় না। অতএব পুরোহিতগণের আহুতি অবশিষ্ট পশুমাংস ভক্ষণ দোষাবহ নহে, নিষিদ্ধও নহে। অদ্যাপি দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে পশুযাগে পুরোহিতগণ আহুতি অবশিষ্ট পশুমাংস ভক্ষণ (প্রসাদ গ্রহণ) করিয়া থাকেন।

সোমযাগ ;—সকল সোম যাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম ইহাকে জ্যোতিষ্টোমও বলে। এই যাগে সোমলতার রসই মুখ্য আহুতি দ্রব্য। এই জাতীয় যাগে যে বারটি স্তোত্র গীত তাহার শেষ স্তোত্রটির নাম অগ্নিষ্টোম। যেহেতু অগ্নিষ্টোম নামক সামগানে যজ্ঞ সমাপ্ত হয় তজ্জন্য যজ্ঞটিকেও অগ্নিষ্টোম আখ্যা দেওয়া হয়। বহু ব্রাহ্মণগ্রন্থে সোমযাগের বিবৃতি দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশেষ ভাবে অগ্নিষ্টোমের আলোচনা ও বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই ব্রাহ্মণের চল্লিশটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ষোলটি অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোমে ঋগ্‌বেদীয় পুরোহিতের কর্তব্য বিহিত হইয়াছে।

প্রতিবৎসর বসন্ত ঋতুতে ত্রৈবর্ণিক যজমান সপত্নীক এই যাগের অনুষ্ঠান করিবেন। সোমরসই প্রধান আহুতি। দুর্গম্য বহু দূর দেশ হইতে সোমলতা সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করা হইত। সোম বর্তমান যুগে অপ্রাপ্য বিধায় তৎপরিবর্তে অনুকল্পরূপে 'পূতিকা' নামক লতার বিধান দৃষ্ট হয়। বৈদিকযুগেই সোম দুষ্প্রাপ্য ছিল। শতপথব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে,—'যদি সোম পাওয়া না যায় পূতিকা দ্বারা যজ্ঞ করিবে।' এই যাগে ষোল জন পুরোহিত অর্থাৎ সকল পুরোহিতের প্রয়োজন। যজমানকে লইয়া পুরোহিতের সংখ্যা সপ্তদশ। কোনও কোনও বৈদিকগ্রন্থ মতে 'সদস্য' নামক পুরোহিত সপ্তদশ সংখ্যার পরিপূরক। যজ্ঞের প্রথমদিবসেই যজমান পুরোহিতদের অভিনন্দন জানান ও দক্ষিণার প্রতিশ্রুতি দিয়া যজ্ঞে নিযুক্ত করেন। ইহাকে 'ঋত্বিক বরণ' বলে। তদনন্তর দীক্ষণীয়েষ্টির অনুষ্ঠান হয়। যজমান ও তৎপত্নী যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েন ও দীক্ষার মাধ্যমে নবজন্ম (আধ্যাত্মিক জন্ম) হয়। দ্বিতীয় দিবসে প্রাতে প্রায়ণীয়েষ্টির অনুষ্ঠান বিহিত। প্রায়ণীয় অর্থাৎ যে ইষ্টিদ্বারা যজ্ঞের আরম্ভ হয়। পথ্যাস্বস্তি, অগ্নি, সোম, সবিতা ও অদিতি এই পাঁচজন দেবতার আবাহন করা হয় প্রায়ণীয়েষ্টিতে। অদিতির জন্য পুরোডাশ এবং অন্য চারিজন দেবতার জন্য গলিত ঘৃত বা আজ্য আহুতি বিহিত। যাজ্ঞিক-পরিভাষায় গলিত অবস্থায় ঘৃতকে 'আজ্য' বলে এবং ঘনীভূত অবস্থার নাম ঘৃত। 'হবির্বিলীনমাজ্যং স্যাদ্ ঘনীভূতং ঘৃতং বিদুঃ।' প্রায়ণীয়েষ্টি অনন্তর সোমলতা ক্রয়ের অনুষ্ঠান

দৃষ্ট হয়। ইহাকে সোমক্রয় বলে। দশটি দ্রব্যের বিনিময়ে একজন শূদ্রের নিকট হইতে সোমলতা ক্রয় করা হয়। সেই দশটি দ্রব্য হইল—একবৎসর বয়স্ক বাছুর, সুবর্ণ, একটি ছাগী, একটি দুগ্ধবতী গাভী ও তাহার বৎস, একটি ষণ্ড, শকট বহনের যোগ্য একটি বলদ, একটি এঁড়ে ও একটি বাছুর এবং বস্ত্র। সোম দেবতাদের রাজা এবং ব্রাহ্মণদের রাজা। তজ্জন্য রাজকীয় সম্মানের সহিত সোমকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পুরোহিতগণ কর্তৃক চালিত ও দুইটি বলদবাহিত শকটে সোমকে যজ্ঞস্থলে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। রাজা সোম যজমানের সম্মানিত অতিথি। তজ্জন্য 'আতিথ্যেষ্টি' নামক একটি ইষ্টির অনুষ্ঠান এইস্থলে বিহিত। এই ইষ্টিতে নয়টি মৃৎকপালে বিষ্ণু-দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ অর্পণ করা হয়। আতিথ্যেষ্টির পর প্রবর্গ্য নামক অনুষ্ঠান ও তদনন্তর 'উপসৎ-ইষ্টির' অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রাচীনবংশ অথবা প্রাগ্‌বংশ নামক একটি মহাবেদী তৃতীয় দিবসে যজ্ঞস্থলের পূর্বদিকে নির্মিত হয়। চতুর্থ দিবসে নিরূঢ় পশুবন্ধ যাগের প্রক্রিয়া অনুযায়ী অগ্নি ও সোম-দেবতার উদ্দেশে একটি পশুযাগ বিহিত। এই দিনে অর্থাৎ চতুর্থ দিবসে সোমকে দক্ষিণদিগস্থ হবির্ধানবেদীতে লইয়া যাওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান হবির্ধানপ্রণয়নম্ নামে অভিহিত। মাধ্যন্দিনসবনে পশুমাংস ও পুরোডাশের আহুতি নির্দিষ্ট এবং সায়ন্তন বা তৃতীয় সবনে পশুর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আহুতি দেওয়া হয়। এতদনন্তর পত্নীসংযাজ অনুষ্ঠিত হয়। অন্তিমদিবসে অর্থাৎ পঞ্চমদিবসে প্রকৃত অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠিত হয় এবং পূর্ববর্তী চারিদিনের অনুষ্ঠানাবলী এই অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠানের ভূমিকা স্বরূপ। পঞ্চমদিনে সোমরস নিষ্কাশন করিতে হয়; ইহাকে সোমাভিষব বা সোমসবন বলে। পুরোহিতগণ এইদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্বক পূতসলিলে অবগাহন করিয়া সোমসবনের ব্যবস্থা করেন। বিহঙ্গকাকলী আরম্ভের পূর্বে হোতা প্রাতরনুবাক পাঠ করেন। একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর সোমলতা স্থাপন করিয়া তদুপরি 'বসতীবরী' নামক জল সিঞ্চন করিতে হয়। অপর একটি প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা সোমলতা থেঁতলাইয়া রস বাহির করা হয়। 'গ্রহ নামক পাত্রে নিষ্কাশিত সোমরস রাখা হয় এবং মেষলোম অথবা ছাগচর্মনির্মিত 'দশাপবিত্র' নামক ছাঁকনীর সাহায্যে ছাঁকিয়া লইতে হয়। দ্রোণকলস নামক পাত্রে বিশুদ্ধরস রাখা হয়। প্রত্যহ তিনবার সোমরস নিষ্কাশন বিহিত, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়; যথাক্রমে এই তিন সবনের নাম প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন, ও তৃতীয়সবন। আহুতি-অবশিষ্ট সোমরস যজমান ও পুরোহিতগণ চমস নামক চামচের বা

হাতার সাহায্যে পান করেন। মাধ্যন্দিনসবনের পর পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দেওয়া হয়। গরু, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, ছাগল, মেষ, তিল, মসূর ও মাস, ধান ও যবের দক্ষিণা দেওয়া হয়। তৃতীয় সোমসবনের পর অবভৃথ স্নানের অনুষ্ঠান হয়। ইহা অবভৃথ ইষ্টি নামে অভিহিত। যজমানসহ সকল পুরোহিত অবভৃথস্নান জন্য জলাশয়ে গমন করেন। এই অবভৃথ ইষ্টিই অগ্নিষ্টোমের অন্তিম অনুষ্ঠান। বরুণ এবং অগ্নি এই ইষ্টির দেবতা। চারিটি প্রযাজ ও দুইটি অনুযাজের অনুষ্ঠান বিহিত। বরুণের উদ্দেশে একটি পুরোডাশ অর্পণ করা হয়। অবভৃথ ইষ্টিতে সকল আহুতি জলে দেওয়া হয়, অগ্নিতে দেওয়া হয় না। যজমান অবগাহনরত পুরোহিতগণের মস্তকে জলসিঞ্চন করেন। দীক্ষণীয়েষ্টির সময় যজমান ও তৎপত্নী যে বস্ত্র এই পাঁচদিন পরিধান করিয়াছিলেন তাহা অবভৃথস্নানের পর পরিত্যাগ করিয়া উন্নেতা নামক পুরোহিত প্রদত্ত নববস্ত্র পরিধান করেন। জলাশয় হইতে যজ্ঞস্থলে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক যজমান উদয়নীয় নামক শেষ ইষ্টি অনুষ্ঠান করেন। প্রায়নীয় ইষ্টির পুরোনুবাক্যা উদয়নীয় ইষ্টিতে যাজ্যা হয় এবং প্রায়নীয়র যাজ্যা উদয়নীয়ে পুরোনুবাক্যা রূপে পঠিত হয়। উদয়নীয়ে দুগ্ধ, মধু, দধি, শর্করা প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তুত চরু আহুতি দেওয়া হয়।

সত্র ;—সত্রের প্রকৃতি হইল 'গবাময়ন' নামক যজ্ঞ। গবাময়ন সোম-যাগেরই অন্তর্ভুক্ত এবং সেই হিসাবে গবাময়নের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম। তাহা হইলে সত্রের বা গবাময়নের পৃথক্ শ্রেণীবিন্যাস ও আলোচনা কেন করা হয়। কারণ এই ; যজ্ঞের জাতি হিসাবে গবাময়ন সোমযাগের অন্তর্গত কিন্তু যজ্ঞের কালের দিক দিয়া বিচার করিলে গবাময়ন ও তদীয়বিকৃতি সকল সত্রের একটি নিজস্ব বিশিষ্ট রূপ আছে তজ্জন্যই পৃথক শ্রেণীবিন্যাস করিয়া গিয়াছেন। যে যজ্ঞ একদিনেই সম্পন্ন হয় সূত্রকারগণ তাহাকে 'একাহ' যাগ বলে। যে সকল যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে একদিনের বেশী সময় অথচ দ্বাদশদিনের কম সময় লাগে তাহাদিগকে 'অহীন' যজ্ঞ বলে। আবার যে সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বাদশদিনের অধিককাল ব্যাপী সেগুলি 'সত্র' নামে অভিহিত। যজ্ঞের স্বরূপ অনুযায়ী কোনও সত্রের অনুষ্ঠানকাল একবর্ষব্যাপী, কোনটির অনুষ্ঠান কাল দশবর্ষব্যাপী, কোনটির যজ্ঞকাল একশত বৎসর, কোনটির আবার এক সহস্র বৎসর। সামবেদের পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে বিবিধ সত্রের যজ্ঞকাল ও অনুষ্ঠানস্বরূপ লিপিবদ্ধ আছে। গবাময়ন যাগ সম্পন্ন করিতে ৩৬১ (তিনশত একষট্টি) দিন লাগে—অর্থাৎ একটি সংবৎসর। তজ্জন্য গবাময়ন সত্রের

অন্তর্ভুক্ত। এই সত্রটির অনুষ্ঠান কাল তিন ভাগে ভাগ করা চলে,—প্রথমার্ধে ১৮০ (একশত আশী) দিন, দ্বিতীয়ার্ধে ১৮০ দিন এবং উভয়ার্ধের মধ্যে 'বিষুব' নামক একটি দিন, সর্বসমেত ৩৬১ দিন। নিম্নে বুঝিবার সুবিধাজন্য গবাময়নের অন্তর্গত বিভিন্ন যাগ ও অনুষ্ঠান-কালের একটি তালিকা দেওয়া হইল ;—

যাগের নাম	অনুষ্ঠান কাল ; দিন সংখ্যা		
অতিরাত্র	১		প্রথম ছয়মাস
চতুর্বিংশস্তোমযুক্তউকৃথ্য	১	পাঁচবার আবৃত্তি ৩০ × ৫ =১৫০	
৪টি অভিপ্লবষড়ই (৪ × ৬)	২৪		
১টি পৃষ্ঠ্য ষড়হ (১ × ৬)	৬		
৩টি অভিপ্লবষড়হ (৩ × ৬)	১৮		
১টি পৃষ্ঠ্য ষড়হ (১ × ৬)	৬		
অভিজিৎ	১		
৩টি স্বরসাম	৩		
মোট	১৮০ দিন		

যাগের নাম	দিন সংখ্যা	
বিষুব দিবস (ইহাকে একবিংশাহও বলা হয়)	১	শেষ ছয়মাস
তিনটি স্বরসাম	৩	
বিশ্বজিৎ	১	
১টি পৃষ্ঠ্য ষড়হ	৬	
৩টি অভিপ্লবষড়হ	১৮	
১টি পৃষ্ঠ্য ও ৪টি অভিপ্লব ষড়হ=৩০ দিন (চার বার আবৃত্তি)	১২০	
৩টি অভিপ্লবষড়হ	১৮	
১টি গোষ্টোম ও ১টি আয়ুষ্টোম	২	
দশরাত্র	১০	
মহাব্রত	১	
অতিরাত্র	১	
মোট	১৮০ দিন	

সর্বসমেত—১৮০ + ১ + ১৮০=৩৬১ দিন

উপরে প্রদত্ত তালিকা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে শেষ ১৮০ দিনের

অনুষ্ঠানে প্রথম ১৮০ দিনের অনুষ্ঠানের বিপরীত ক্রম অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রথমার্ধ বা প্রথম ছয় মাসের অনুষ্ঠান সূচীর প্রথম দিনে অতিরাত্র এবং অন্তিমদিনে স্বরসাম বিহিত কিন্তু শেষার্ধে বা শেষ ছয়মাসের অনুষ্ঠানসূচীর প্রথম দিনে স্বরসাম ও অন্তিমদিনে অতিরাত্র বিহিত। প্রথমার্ধের বিপরীতক্রম শেষার্ধে অনুসৃত হওয়ায় ইহাকে দর্পণের প্রতিবিম্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে যেহেতু দর্পণে প্রতিবিম্ব বিম্বের বিপরীতক্রমে প্রতিফলিত হয়।

অনুষ্ঠান তালিকায় দুই প্রকার ষড়হের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, অভিপ্লবষড়হ ও পৃষ্ঠ্যষড়হ। 'ষড়হ' অর্থাৎ (ষট্ + অহ) ছয়দিনে নিষ্পাদ্য যাগ। অভিপ্লব-ষড়হের ছয়টি দিন নিম্নে দেখান হইল ;—

প্রথমদিন—জ্যোতিষ্টোম।
দ্বিতীয়দিন—গোষ্টোম।
তৃতীয়দিন—আয়ুষ্টোম।
চতুর্থদিন—গোষ্টোম।
পঞ্চমদিন—আয়ুষ্টোম।
ষষ্ঠদিন—জ্যোতিষ্টোম।

অভিপ্লবষড়হে প্রথমদিনে ও শেষদিনে জ্যোতিষ্টোম বিহিত। তজ্জন্য বলা হয় 'উভয়তো জ্যোতিরভিপ্লবষড়হঃ।' দুই জ্যোতিষ্টোমের মধ্যবর্তী চারিটি দিনের নাম উক্থ্য। কিন্তু পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রথমদিনে জ্যোতিষ্টোম থাকিলেও শেষদিন উক্থ্যের একটি যাগ বিহিত ; শেষদিনে জ্যোতিষ্টোম হইবে না। এই ষড়হে মাধ্যন্দিনসবনে পৃষ্ঠ্যস্তোত্র পাঠ করা হয়।

গবাময়ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান সূচী ও কালবিভাগ ভাল করিয়া অনুধাবন করিলে দেখা যায় সূর্যের বার্ষিকগতির সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। সমগ্র যজ্ঞটি দুটি ভাগে বিভক্ত ও প্রতিভাগের অনুষ্ঠানকালে ছয়মাস এবং প্রতিমাসে ত্রিশটি দিনের অনুষ্ঠান বিহিত। দুটি ভাগের মধ্যে রহিয়াছে বিষুবদিবস। দুটি ভাগের অনুষ্ঠেয় যাগাদি প্রায় একই প্রকার, কেবলমাত্র ব্যতিক্রম এই, দ্বিতীয়ার্ধের বা উত্তর ভাগের ১৮০ দিনের অনুষ্ঠানে প্রথমার্ধের বা পূর্বভাগের অনুষ্ঠানের বিপরীতক্রম অনুসরণ করা হইয়াছে। আদিত্যের বার্ষিক গতির দুই বিভাগেও এই বিপরীতক্রম দৃষ্ট হয়। সূর্যের উত্তরায়ণে দিনের স্থিতি-কালের বৃদ্ধি ও দক্ষিণায়নে দিনের স্থিতিকালের হ্রাস হইয়া থাকে। এই বৃদ্ধি ও হ্রাস একই অনুপাতে হইয়া থাকে।

গবাময়ন সোমযাগের অন্তর্গত ; অতএব সোমযাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোমে

যতগুলি পুরোহিতের প্রয়োজন ও যে যে আহুতি দ্রব্যের প্রয়োজন গবাময়নেও ততগুলি পুরোহিত ও সমান জাতীয় আহুতি দ্রব্যের প্রয়োজন।

৩৬০ দিনের অধিকদিনে নিষ্পাদ্য সকল সত্রযাগের প্রকৃতি গবাময়ন এবং ৩৬০ দিনের ন্যূনসংখ্যক কিন্তু একাদশদিনের অধিকসংখ্যক দিনে নিষ্পাদ্য সত্র যাগের প্রকৃতি 'দ্বাদশাহ' নামক যাগ।

দ্বাদশাহ

'দ্বাদশাহ' নামক যাগের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন কারণ একমাত্র 'দ্বাদশাহ' যাগে অহীন ও সত্র উভয়বিধ যাগের ধর্ম বিদ্যমান। যজমান, যাগে যজ্ ধাতুর প্রয়োগ, দক্ষিণার বিধি প্রভৃতির দিক ধরিয়া বিচার করিলে দ্বাদশাহ অহীন গোষ্ঠীর যাগের সমগোত্রীয়; আবার পুরোহিতের সংখ্যা, অনুষ্ঠানের বর্ণনা ও কার্যসূচী ও কতকগুলি বিধির দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহা 'সত্রের' সমগোত্রীয়। সত্রের ন্যায় দ্বাদশাহেরও প্রথমদিনে ও অন্তিমদিনে 'অতিরাত্র' যাগ বিহিত। অগ্নিষ্টোম যেরূপ সমস্ত একাহযাগের প্রকৃতি, দ্বাদশাহ তদ্রূপ সকল অহীন সত্রের প্রকৃতি। অহীন সত্র সম্পন্ন করিতে ৩৬০ দিনের কম সংখ্যক দিনের প্রয়োজন হয়। ৩৬০ দিনের অধিকদিন নিষ্পাদ্য সত্রের প্রকৃতি গবাময়ন—ইহা পূর্বেই গবাময়নের আলোচনায় উক্ত হইয়াছে। দ্বাদশাহের অনুষ্ঠানে ছত্রিশটি দিনের প্রয়োজন হয়। প্রথম দ্বাদশ দিবস দীক্ষার জন্য প্রয়োজন, পরবর্তী দ্বাদশদিবসে উপসদের অনুষ্ঠান বিহিত। উপসদন্তে চতুর্বিংশতমদিবসে অগ্নি ও সোম-দেবতার উদ্দেশে একটি পশু যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রথম দ্বাদশদিনে দীক্ষা ও তৎপরবর্তী দ্বাদশদিনে উপসদ্ এইভাবে চব্বিশটি দিন গত হইলে শেষ দ্বাদশদিবসে দ্বাদশটি সুত্যা বিহিত। এইভাবে সর্বসমেত ছত্রিশটি দিন দ্বাদশাহের অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট। সোমযাগের আলোচনা কালে বর্ণিত অবভৃথইষ্টি দ্বাদশাহেরও সর্বশেষে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বাদশাহের প্রথমদিনকে প্রায়ণীয় ও শেষদিনকে উদয়নীয় বলা হয়। এই যাগের দুইটি প্রকারভেদ দৃষ্ট হয় যথা, ভরতদ্বাদশাহ ও ব্যূঢ়দ্বাদশাহ। দুইটি প্রকারভেদে এই যাগে বিহিত সংস্থারও প্রকারভেদ ঘটে। ভরতদ্বাদশাহে প্রথমদিন ও দ্বাদশদিনে অতিরাত্র, দ্বিতীয় ও একাদশদিনে অগ্নিষ্টোম এবং অবশিষ্ট দিনগুলিতে উক্থ্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অন্তিম অতিরাত্রের পূর্বদিবস মহাব্রত নামে অভিহিত। ব্যূঢ়দ্বাদশাহে প্রথম ও শেষ দিবস অতিরাত্র এবং দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত

ষষ্ঠদিন পৃষ্ঠ্যষড়হ বিহিত। দশমদিনে অবিবাক্যম্‌ এবং অষ্টম, নবম একাদশ-দিবসে ছন্দোম অনুষ্ঠেয়।

রাজতন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি যজ্ঞ

কতকগুলি যজ্ঞ রাজার বা সম্রাটের অভিষেকের সহিত সংশ্লিষ্ট যথা রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ, বৃহস্পতিসব প্রভৃতি। রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া রাজা হওয়া যায়, বাজপেয় যাগের অনুষ্ঠানে সম্রাট হওয়া যায় এবং সার্বভৌম নৃপতি হইতে হইলে অশ্বমেধের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য।

'রাজসূয়েন রাজা ভবতি. বাজপেয়েন সম্রাড্‌ ভবতি, অশ্বমেধেন সার্ব-ভৌমো ভবতি।' এই যজ্ঞগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে একটি বিশাল গ্রন্থ হইয়া পড়িবে সুতরাং এই গ্রন্থে তাহাদের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। "যজ্ঞ" সম্বন্ধে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা রহিল, তাহার মধ্যে এই সকল যাগের বিস্তৃত আলোচনা করিব। এখানে সংক্ষেপে বৈদিকযুগে রাজার অভিষেকপ্রথার বর্ণনা করা হইতেছে। অভিষেকপ্রথা রাজসূয় যাগের একটি অঙ্গ ; এই অনুষ্ঠানের বর্ণনায় বৈদিক ভারতের রাজতন্ত্রের প্রামাণিক বিবিধ তথ্য পাওয়া যায়। কতপ্রকার রাজ্য ছিল, কত প্রকারের নৃপতি ছিলেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ক্ষত্রিয় রাজার সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, কিরূপে রাজার নির্বাচন হইত ইত্যাদি বহু প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। অথর্ববেদ ও ঐতরেয়, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে অভিষেক প্রথার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। 'অভিষেক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল জলদ্বারা সিঞ্চন ; যেহেতু বিবিধ পবিত্র জলদ্বারা রাজাকে অভিষেক (সিঞ্চন) করা ঐ অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ তজ্জন্য ইহাকে 'অভিষেক' প্রথা বলে।

অভিষেক অনুষ্ঠান পাঁচদিন ধরিয়া চলে। একটি দীক্ষণীয়েষ্টি তিনটি উপসদ্‌ এবং একটি সুত্যা অর্থাৎ উক্‌থ্য নামক সোমযাগ বিহিত। ফাল্গুনের পৌর্ণমাসীর পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষের অবসানে চৈত্রের প্রথমদিবসে দীক্ষা নামক ইষ্টির অনুষ্ঠান বিহিত। এই অনুষ্ঠানটির বিশদ্‌ ও বিস্তৃত বর্ণনা শতপথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। প্রথমদিন সবিতা, অগ্নি, সোম, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, রুদ্র, মিত্র ও বরুণ এই আটজন দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। আহুতি দানের সময় প্রত্যেক দেবতার এক একটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়। সেই বিশেষণ-গুলিতে রাজার বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম সুব্যক্ত। সবিতাকে 'সত্যপ্রসব', অগ্নিকে 'গৃহপতি', সোমকে 'বনস্পতি', বৃহস্পতিকে 'বাক', ইন্দ্রকে 'জ্যেষ্ঠ', রুদ্রকে

'পশুপতি', মিত্রকে 'সত্য', ও বরুণকে 'ধর্মপতি' বলিয়া আবাহন করা হয়। রাজাকেও সবিতার ন্যায় সত্যসন্ধ, অগ্নির ন্যায় গৃহের পতি, সোমের ন্যায় অরণ্যানী ও কৃষির পতি, বৃহস্পতির ন্যায় বাকপটু, ইন্দ্রের ন্যায় জ্যেষ্ঠ বা সার্বভৌম, রুদ্রের ন্যায় পশুসকলের পতি বা রক্ষক, মিত্রের ন্যায় সত্য ও বরুণের ন্যায় ধর্মপতি হইতে হইবে। বরুণের ধর্মপতি বিশেষণটি রাজার জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। এখানে ধর্ম বলিতে 'Law' বোধ্য। হিন্দু রাজনীতি মতে ধর্মই প্রকৃত রাজা এবং পার্থিব রাজা সেই ধর্মের বাস্তব রূপায়ণের দণ্ড বা নিমিত্ত মাত্র। পুরোহিতগণ অতঃপর রাজাকে দেখাইয়া প্রজাবৃন্দের নিকট ঘোষণা করেন—'এই ব্যক্তি তোমাদের রাজা; সোম আমাদের ব্রাহ্মণদের রাজা।' ইহার পর বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ও একত্র মিশ্রিত জলদ্বারা রাজাকে সিঞ্চন বা অভিষেক করা হয়। নদীর জল, পুষ্করিণীর জল, কূপোদক, শিশিরবিন্দু, বন্যার জল, বৃষ্টির জল একটি যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠের পাত্রে মিশ্রিত করা হয় অভিষেক জন্য। নদী বলিতে এখানে সরস্বতী বোধ্য। প্রত্যেকটি জলের বৈশিষ্ট্য বা রূপক অর্থ আছে। সরস্বতী নদীর জল বাগ্মিতার প্রতীক, স্রোতস্বিনী শক্তির বোধক, বন্যা প্রাচুর্যের প্রতীক, সমুদ্র বিশাল রাজ্যের বোধক এবং পুষ্করিণীর জল প্রজার আনুগত্য ও রাজভক্তির দ্যোতক। পুষ্করিণীর জল যেরূপ শান্ত প্রজাও তদ্রূপ রাজার অনুগত হইবে। ব্রাহ্মণ অধ্বর্যু নামক পুরোহিত, জনৈক ক্ষত্রিয় ও জনৈক বৈশ্য তিনজনে যুগপৎ রাজার মস্তকে সিঞ্চন বা অভিষেক করেন। অভিষেক রাজার নবজন্মতুল্য। অভিষেককালে যে সমস্ত পোষাক পরিধান করার বিধি আছে—সেই পোষাকগুলি গর্ভের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্যোতক। অতঃপর অধ্বর্যু পুরোহিত একটি ধনুতে জ্যা চড়াইয়া তিনটি বাণ সহ রাজার হাতে দেন।

রাজশক্তি ও শাসন কার্যের প্রতীক হইল ধনু।

ইহার পর রাজা ও পুরোহিত শপথ গ্রহণ করেন। পুরোহিত রাজাকে বলেন,—'যদি তুমি আমার অনিষ্ট সাধন কর তাহা হইলে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তুমি যে সুকৃতি অর্জন করিয়াছ সেই সুকৃতি, তোমার আয়ু ও সন্তান সন্ততি আমি হরণ করিব।' রাজাও অনুরূপ শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়া পুরোহিতকে আশ্বস্ত করেন। ব্যাঘ্র পশুদের রাজা তজ্জন্য রাজা ব্যাঘ্রচর্মের উপর পদযুগল রাখেন। একটি সোনার থালা রাজার পায়ের নীচে ও একটি সোনার থালা তাঁহার মস্তকোপরি রাখা হয়। সুবর্ণ অমৃতের প্রতীক;

এইভাবে রাজাকে ঊর্ধ্বে ও নিম্নে অমৃতত্ব দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়।

অতঃপর রাজা একটি চতুরশ্বযুক্ত রথে ধনুর্বান হস্তে আরোহণ করিয়া যজ্ঞ ক্ষেত্রের চতুর্দিকে গমন করেন। রাজা একটি শর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্যভেদ করেন। একটি শর পরিত্যাগের অর্থ এই,—প্রজাপতি যেমন একক হইয়াও সম্যক সৃষ্টির উপর আধিপত্য করেন রাজাও তদ্রূপ একক হইয়াও বহুর উপর রাজত্ব করেন। রথটি যজ্ঞ ভূমির চতুর্দিকে গমন করতঃ রাজার চতুর্দিগ্‌বিজয় ঘোষণা করে। ইহার পর রাজা ও মহিষী যজ্ঞস্তম্ভের উপর আরোহণ করেন। এই যজ্ঞস্তম্ভারোহণ তাঁহাদের দেবতার সন্নিকর্ষলাভ দ্যোতক। আরোহণ পূর্বক রাজা বলেন,—'আমরা প্রজাপতির সন্তান হইয়াছি।' ('প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম')। অতএব বৈদিকযুগে রাজার অভিষেকে রাজা মনুষ্যজাত হইলেও তাঁহাকে দেবত্বমহিমায় মণ্ডিত করা হইত।

এই অনুষ্ঠানের পর মাতা বসুমতী এবং রাজার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের দৃশ্য আছে। রাজা সিংহাসন হইতে ভূমিতে পদার্পণের পূর্বে পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—'মাতঃ পৃথিবী, তুমি আমার অনিষ্ট করিও না, আমিও তোমার অনিষ্ট করিব না।' পৃথিবী সদ্য অভিষিক্ত রাজাকে ভয় করেন ও ভাবেন,—'অভিষেক করার ফলে এই রাজা মহা-শক্তিধর হইয়াছে; আমার ভয় হয় সে আমাকে না বিদীর্ণ করিয়া ফেলে।' রাজাও পৃথিবীকে ভয় করেন ও ভাবেন,— 'আমাকে পৃথিবী যেন দূরে নিক্ষেপ না করেন।' পরস্পরের এই আশঙ্কা দূর করার জন্যই অভিষিক্ত রাজা ও পৃথিবীর মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় কারণ জননী (পৃথিবী) পুত্রকে (রাজাকে) কখনও হিংসা করেন না, পুত্রও জননীকে কখনও হিংসা করেন না। এই চুক্তির পর রাজা নিঃশঙ্ক চিত্তে ভূমিতে পদার্পণ করেন।

পাশাখেলা অভিষেক অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পাঁচটি পাশা লইয়া এই ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। চারটি পাশার নাম 'কৃত' ও পঞ্চমটির নাম 'কলি'। দান ফেলিলে যদি পাঁচটি পাশাই একভাবে পড়ে অর্থাৎ সবগুলিরই চিহ্নিত দিক উপরে থাকে বা পাঁচটিরই চিহ্নিত দিক অধোমুখী থাকে তাহা হইলে জয় বোধ্য। রাজাকে সর্বদাই জয়সূচক পাশার দ্বারা অনুগৃহীত করা হয়।

সিংহাসনটি খদির বৃক্ষের কাষ্ঠনির্মিত। তাহাকে 'আসন্দী' বলে। সিংহাসন রাজকীয় মর্যাদা ও শক্তির প্রতীক, রাষ্ট্রের প্রতীক। সিংহাসন বা আসন্দীর সম্মুখ-ভূমিতে একটি ব্যাঘ্র চর্ম পাতিয়া রাখা হয়। অভিষেক

অনুষ্ঠানের অবসানে রাজা অভিষিক্ত ও মন্ত্রপূত হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন ;—তিনি উপবিষ্ট হইলে পর পুরোহিত রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—'এই রাষ্ট্র রাজাকে কৃষির জন্য, প্রজার মঙ্গলের জন্য, সমৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য অর্পণ করা হইতেছে।' এই উক্তিটিতে এই সত্য সুব্যক্ত যে রাষ্ট্র রাজার স্বার্থপূরণ, স্বৈরাচার, বা প্রজাশোষণজন্য নহে কিন্তু শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রজার মঙ্গল জন্য রাষ্ট্র রাজা রক্ষা করিবেন। বৈদিক যুগের ভারতীয় নৃপতিগণ এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে রাজ্যের ভিত্তি স্বৈরাচার বা প্রজাপীড়নের উপর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না ; প্রজার মঙ্গল, দেশের সমৃদ্ধি ও জনগণের শুভেচ্ছাই রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি।

রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে পর পুরোহিত রাজার বক্ষে হস্তস্থাপন করিয়া বলেন, 'পবিত্র ধর্ম, নীতি ও শৃঙ্খলার রক্ষক রাজা উপবেশন করিয়াছেন। রাজা সকল প্রকার কথা বলিতে পারেন না এবং সকল প্রকার কাজও করিতে পারেন না। যাহা ন্যায্য তাহাই তিনি বলিবেন এবং যাহা উচিত কর্ম তাহাই তিনি করিবেন।' রাজার কিরূপ উচ্চ আদর্শ ধরিয়া চলিতে হইত এই উক্তিতে তাহা প্রকট।

অতঃপর যে অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে তাহা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পুরোহিতগণ স্বল্পাকার যষ্টি (দণ্ড) লইয়া রাজার পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে আঘাত বা স্পর্শ করেন। দণ্ডের দ্বারা স্পর্শ করিয়া পুরোহিতগণ রাজাকে দণ্ডের অতীত করেন। শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তি, 'পুরোহিতগণ রাজাকে দণ্ডস্পর্শে দণ্ডাদেশ বা বধ-আদেশের গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যান তজ্জন্য দণ্ডবধরূপ আদেশ রাজার প্রতি প্রযোজ্য নহে।' (শতপথ, ৫-৪-৮-৭)।

মনুষ্যরাজাকে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ পুরোহিত (মন্ত্রীকে) দেবগুরু বৃহস্পতির সমতুল্য মনে করা হয়। দেবরাজ সোম, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির মহাভিষেকের সময় দ্যুলোকে যে যে অনুষ্ঠান দেবগণ করিয়াছিলেন মনুষ্য নৃপতির অভিষেকের সময় পুরোহিতগণও অনুরূপ অনুষ্ঠান করেন। যে সকল পবিত্র জলে দেবরাজগণের অভিষেক হইয়াছিল সেই সকল পবিত্র জলেই মনুষ্য নরপতিরও অভিষেক হইয়া থাকে,—

'যাভিরদ্ভিরভ্যসিঞ্চৎ প্রজাপতিঃ সোমং রাজানং বরুণং যমং মনুম্।
তাভিরদ্ভিরভিসিঞ্চামি ত্বামহং রাজ্ঞাং ত্বমধিরাজো ভবেহ।'

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮-৩৭-৩)

পুরোহিত বলিতেছেন,—'যে সকল জলে প্রজাপতি স্বর্গের দেবরাজবৃন্দ

অর্থাৎ সোম, বরুণ, যম, মনুর অভিষেক করিয়াছিলেন, সেই সকল জলে আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি ; তুমি নৃপতি সকলের অধিরাজ হও।'

রাজার অভিষেক বা সিংহাসন আরোহণ রাজন্যবর্গ ও প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণের সম্মতিসাপেক্ষ অর্থাৎ তাহারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজন্যবর্গ ও বৈশ্যাদি প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণ তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেন এই তথ্য হইতে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যেহেতু এই প্রতিনিধি-গণের সম্মতি ব্যতীত রাজার অভিষেক হইতে পারে না তজ্জন্য তাঁহাদের "রাজকৃৎ" বা "রাজকর্ত্তা" বলা হয়। রাজসূয় বা অভিষেকসংক্রান্ত যাগের সহিত "রত্নহবি" নামে একটি ইষ্টি সম্পাদনের বিধান আছে। এই ইষ্টি সম্পাদনের জন্য রাজার প্রত্যেক রাজকর্ত্তা বা রাজকারকের গৃহে গিয়া কোনও এক দেবতার উদ্দেশে এক একটি আহুতি দিতে হয়। রাজকর্ত্তাদের "রত্নিন্" বলা হয়। এক স্থানে বলা হইয়াছে তাঁহারা রত্নতুল্য রাজাকে নির্বাচন ও রক্ষা করেন তজ্জন্য 'রত্নিন্' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। অপর এক ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা রাজার মুকুটের মহামূল্য রত্ন সদৃশ তজ্জন্য 'রত্নিন্' বলা হয়। অথর্ববেদে ও বিভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'রত্নিন্' বা রাজকারকদের নাম পাওয়া যায় : গ্রন্থভেদে সংখ্যার ও ক্রমের তারতম্য দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ (৫-৩-১) অনুযায়ী রত্নিন্‌দের সংখ্যা একাদশ এবং তদানীন্তন সমাজে তাঁহাদের সম্মানের স্তর অনুযায়ী নামের ক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে যথা,—সেনানী বা প্রধান সেনাপতি, পুরোহিত, মহিষী, সূত, গ্রামণী (গ্রামের প্রধান), ক্ষত্তা, সংগ্রহীতা অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ, ভাগদুঘ অর্থাৎ করসংগ্রাহক, অক্ষাবাপ বা পাশাখেলার নিরক্ষক, গোবিকর্ত্ত বা ব্যাধ এবং পালাগল বা বার্ত্তাহর। যদিও এই তালিকায় দ্বাদশটি নাম পাওয়া যায় অক্ষাবাপ ও গোবিকর্ত্ত উভয়ে মিলিয়া একজন রাজকৃৎ বোধ্য। প্রত্যেক দিন রাজা এক একজন রাজকৃতের গৃহে যান, এই ভাবে একাদশ জন রত্নিনের গৃহে গিয়া আহুতি দান করেন। দ্বাদশদিবসে রাজা তাঁহার পরিবৃক্তি নামক পরিত্যক্তা পত্নীর গৃহে গিয়া আহুতি দান করেন। এই পরিত্যক্তা পত্নীকে রত্নিমধ্যে গণ্য করা হয় না, তজ্জন্য রত্নিসংখ্যা শতপথ ব্রাহ্মণ মতে একাদশ। পরিবৃক্তিকে ধরিলে দ্বাদশ হইত। বিভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে রাজকৃৎদের সংখ্যা ও পৌর্বাপর্যের তারতম্য দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে প্রদত্ত তালিকা ও ক্রম শতপথের অনুরূপ, কেবল গোবিকর্ত্ত ও পালাগলের উল্লেখ তৈত্তিরীয়ে পাওয়া যায় না। মৈত্রায়নী সংহিতাতে

(২-৬-৫) শতপথের তালিকাধৃত নাম সবই পাওয়া যায়, অধিকন্তু তক্ষা বা সূত্রধার এবং রথকার (রথনির্মাতা) এই দুজনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই অভিষেক অনুষ্ঠান ও রাজকৃৎ বা রত্নিদের প্রথম উল্লেখ অথর্ববেদে পাওয়া যায় ; তখন মাত্র পাঁচজন রত্নিন্ ছিল, রথকার, কর্মার (কর্মকার), গ্রামণী, রাজন্য ও রাজার আত্মীয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রাপ্ত উপরিউক্ত তালিকায় সমাজের সকল শ্রেণীর বা বর্ণের প্রতিনিধিই বিদ্যমান। পুরোহিত ব্রাহ্মণবর্ণের প্রতিনিধি রাজন্য সেনানী ও মহিষী ক্ষত্রিয়ের প্রতিনিধি, গ্রামণী রথকার প্রভৃতি বৈশ্য বর্ণের প্রতিনিধি এবং অক্ষাবাপ, গোবিকর্ত্ত, ইত্যাদি শূদ্রের প্রতিনিধি। গ্রন্থভেদে রত্নিদের ক্রমের পার্থক্য দৃষ্ট হয়, যথা শতপথে প্রথমেই সেনানী বা প্রধান সেনাপতির উল্লেখ আছে, ক্ষত্রিয় বর্ণকে গুরুত্ব দিয়াছে কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও সংহিতায় প্রথমেই পুরোহিতের নাম পাওয়া যায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

যদিও বৈদিকযুগে রাজার নির্বাচন রাজকৃৎগণের সম্মতিসাপেক্ষ ছিল ও গণতন্ত্রের সুর ধ্বনিত হয় তথাপি রাজার নির্বাচন বা অভিষেকপ্রথা গণতন্ত্রমূলক ছিল বলিলে ভুল হইবে কারণ যে কোনও ব্যক্তি রাজা হইতে পারিত না। যে রাজা হইবে তাহাকে ক্ষত্রিয়বর্ণসম্ভূত ও রাজকুলোদ্ভব হইতে হইবে। বংশানুক্রমেই রাজার নির্বাচন হইত ; রাজার পুত্র বা নিকট আত্মীয়ই রাজা হইতে পারিত। সাধারণতঃ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইত। ক্ষত্রিয়বর্ণবহির্ভূত ব্যক্তির সিংহাসনে কোনই অধিকার ছিল না। স্বর্গে বা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাজাকে নির্বাচন করিতে হইয়াছিল এবং তখন যে সকল নিয়ম ও অনুষ্ঠান পালিত হইয়াছিল সেই সকল অনুষ্ঠান প্রথা হিসাবে (as a formality) চলিয়া আসিতেছিল। অভিষেকের সময় রাজাকে 'রাজাদের মধ্যে ভাবী রাজার পিতা' (রাজানাং রাজপিতরং') বলিয়া সম্বোধন করা হয় এবং শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দশ পুরুষ ধরিয়া পর পর রাজা হওয়ার ('দশপুরুষং রাজ্যম্') উল্লেখ আছে। এই সব উক্তি হইতেও প্রমাণিত হয় যে রাজার পুত্রই রাজা হইতে পারিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮-৩৯) বৈদিকযুগের বহু রাজার অভিষেকের ও সেই সেই রাজার অভিষেককারী পুরোহিতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তুরকাবষেয় নামক পুরোহিত পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয়কে, মনুবংশ সম্ভূত শর্যাত নামক রাজাকে চ্যবন ভার্গব নামক পুরোহিত, পুরোহিত সোমশুষ্ম রাজা শতানীকশত্রাজিৎকে, পর্বত এবং নারদ নামে পুরোহিতদ্বয় রাজা অম্বষ্ঠ্যকে

ও রাজা যৌধাংশ্রৌষ্টিকে, কশ্যপ রাজা বিশ্বকর্মা ভৌবনকে, ঋষিবশিষ্ঠ রাজা সুদাস পৈজবনকে, সংবর্ত্ত আঙ্গিরস রাজা মরুত্ত আবিক্ষীতকে, অত্রিপুত্র ঋষি উদময় রাজা অঙ্গকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। দুষ্মন্ত পুত্র ভরতকে দীর্ঘতমা ঋষি অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং ভরত সসাগরা ধরিত্রী জয় করিয়া একশত তেত্রিশটি অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সকল অভিষিক্ত নৃপতি প্রচুর দক্ষিণাদানে পুরোহিতগণকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বেদের ব্যাখ্যার বিভিন্ন প্রকার (প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋষিগণ এবং পণ্ডিতগণ বেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈদিক যুগে যাস্কাচার্য তাঁহার বিখ্যাত নিরুক্ত গ্রন্থে বহু বৈদিক শব্দের এবং বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ববর্তী বহু নিরুক্তকারের নাম ও মত যাস্ক উল্লেখ করিয়াছেন,—যথা কৌৎস, ঔর্ণবাভ ঔদুম্বরায়ণ, শাকটায়ন, শাকপূণি প্রভৃতি। কাহারও কাহারও মত যাস্ক খণ্ডন করিয়াছেন, কাহারও মত সমর্থন করিয়াছেন। বেদের ব্যাখ্যা লইয়া সেই সুপ্রাচীন কাল হইতেই বিবিধ মত দৃষ্ট হয়। যাস্ক কৌৎসের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। কৌৎসের মতে বেদমন্ত্রগুলি অনর্থক, পরস্পরবিরুদ্ধ এবং কতিপয় মন্ত্রের অর্থ দুর্বোধ্য। যাস্ক ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে কৌৎসের যথার্থ শব্দজ্ঞানের অভাবের জন্যই তিনি বেদমন্ত্রের অর্থ নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। এইরূপ বেদের শব্দবিশেষ লইয়াও যাস্কের পূর্বাচার্যগণের মধ্যে মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। যেমন অশ্বিনী যুগলের একটি নাম 'নাসত্যৌ'। ঔর্ণবাভের মতে এই শব্দটির অর্থ ন অসত্যৌ অর্থাৎ যাহা মিথ্যা নহে; কিন্তু আগ্রায়ণ নামক ব্যাখ্যাতা ইহার অর্থ করিয়াছেন—'সত্যস্য প্রণেতারৌ' অর্থাৎ সত্যের নেতা দুইজন। যাস্ক এই দুই প্রকার ব্যাখ্যা সমর্থন করেন নাই; তাঁহার মতে ইহার অর্থ 'নাসিকাপ্রভবৌ' অর্থাৎ নাসিকা হইতে জাত। কখনও কখনও যাস্ক একটি শব্দের বিবিধ বৈকল্পিক অর্থ করিয়াছেন।

যাস্কের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে সায়ণাচার্য বেদের ব্যাখ্যা করেন। সেই সময়কে পৌরাণিক যুগ বলা চলে এবং সেই জন্যই সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যায় বহু স্থলে পৌরাণিক চিন্তাধারা দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ

স্থলে তিনি যাস্ককে প্রমাণ ধরিয়াছেন। কিন্তু স্থল বিশেষে নিজস্ব ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। বহু মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হইয়া তিনি বিবিধ বৈকল্পিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তজ্জন্যই সায়ণাচার্যের বেদের ভাষ্য 'যদ্বা' 'অথবা' শব্দে ভরা। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্যের সকল পণ্ডিতগণই স্বীকার করিয়াছেন যে বেদের অর্থ নির্ণয়ে যাস্কের নিরুক্ত এবং সায়ণাচার্যের ভাষ্য প্রধান সহায়ক। জার্মান দেশের প্রখ্যাত বেদ বিদ্বান ভিন্টারনিৎস্, গোল্ডস্টুকার, মাক্‌স্‌মুলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে সায়ণাচার্যের প্রতি তাঁহাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল মাত্র রুডল্‌ফ্‌ রোট্ (Rudolf Roth) বিশেষ দাম্ভিকতার সহিত বলিয়াছেন যে যাস্ক বা সায়ণাচার্য বেদের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যাস্ক বা সায়ণ অপেক্ষা বেদের অর্থ নির্ণয়ে যোগ্যতর অধিকারী। রোট্ বলিতে চাহেন বেদমন্ত্র প্রকাশের সময় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের যে অর্থ অভিপ্রেত ছিল তাহা আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বলে তিনি যেরূপ ধরিতে পারিয়াছেন যাস্ক বা সায়ণের তাহা সাধ্যাতীত ছিল। তাঁহার এই মত প্রমাণ করিবার জন্য তিনি ছয়টি যুক্তি দিয়াছেন। জার্মানীর বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গোল্ডস্টুকার রোটের ছয়টি যুক্তিই সমালোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং যাস্ক ও সায়ণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রোটের দম্ভের প্রতিও তিনি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াছেন। আরেকজন জার্মান পণ্ডিত আল্‌ফ্রেড্ লুড্‌ভিগ্ (Ludwig) বলিয়াছেন যাস্ক ও সায়ণাচার্যের সাহায্য বেদ অধ্যয়নের জন্য অনিবার্য কিন্তু অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করা উচিত নহে। যে সকল স্থানে তাঁহারা প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে পারেন নাই অথবা বিবিধ বৈকল্পিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন সে সকল ক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা উচিত। রোট্ বলেন আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী তুলনামূলক ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকায় তাঁহারা যাস্ক, সায়ণ প্রভৃতি ভারতীয় ভাব-ধারাপুষ্ট ব্রাহ্মণ বেদব্যাখ্যাতাগণ অপেক্ষা বেদের অর্থ নির্ণয়ে অধিক দক্ষ কিন্তু গোল্ডস্টুকার ও লুড্‌ভিগ্ প্রভৃতিদের মতে বেদের ব্যাখ্যা সম্যগ্‌ভাবে বুঝিতে হইলে ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জ্ঞান অপরিহার্য; কেবল তুলনামূলক ধর্মজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ব দ্বারা প্রকৃত অর্থ নির্ণয় সম্ভব নহে। লুড্‌ভিগ্ সমগ্র ঋক্‌সংহিতা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য রচনা করেন; সেই ব্যাখ্যায় তিনি অধিকাংশ স্থলে যাস্ক ও সায়ণের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন। লুড্‌ভিগের মতের সমর্থক পিশেল (R. Pischel) ও গেল্‌ড্‌নার (K. F. Geldner) তাঁহাদের 'Vedische

studien' (বেদিশে স্টুডিয়েন্) নামক গ্রন্থে বহু দুর্বোধ্য বেদমন্ত্রের মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহারা স্ফুটকণ্ঠে লুড্‌ভিগের মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—ঋগ্‌বেদ ভারতীয় চিত্তেরই অভিব্যক্তি তজ্জন্য ভারতীয় ভাবধারা ও সায়ণ ভাষ্য প্রভৃতির জ্ঞান বেদার্থ নির্ণয়ে একান্ত প্রয়োজন।

বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে আর একটি বিষয়ে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। চারি বেদের সংহিতাভাগের মন্ত্রগুলি যখন প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তখন তাহাদের সহিত যজ্ঞের কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা ইহাই প্রধান বিচার্য বিষয়। একদলের মতে বেদের মন্ত্ররাজি বিশুদ্ধকাব্য, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস এবং যখন প্রকাশিত হয় যজ্ঞের সহিত কোনও সম্বন্ধ ছিল না। পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রকাশসময়ে কর্মকাণ্ডের প্রাবল্যজন্য বেদের বহু মন্ত্রের যজ্ঞে বিনিয়োগের ব্যবস্থা হয়। জার্মানীর খ্যাতনামা পণ্ডিত এডল্‌ফ্‌ কয়েগী (Kaegi) তাঁহার 'Der Rgveda die alteste Litteratur der Inder' (ডের ঋগ্‌বেদ ডি আল্‌টেস্‌টে লিটেরাটুর ডের ইন্‌ডের্) অর্থাৎ 'ভারতবাসীর প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্‌বেদ' নামক জার্মান গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি ;—'The great majority of the songs are invocations and glorifications of the deities addressed at the time ; their keynote is throughout a simple outpouring, a prayer to the Eternal ones, an invitation to accept favourably dedicated gift.' 'বেদের অধিকাংশ গান (মন্ত্র)ই দেবতাদের আহ্বান ও স্তুতিমূলক ; চিরন্তন ঐশীসত্তার বিকাশ স্বরূপ দেবতাদের প্রতি হৃদয় হইতে স্বতঃউৎসারিত প্রার্থনা এবং শ্রদ্ধাভরে অর্পিত দ্রব্যসমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধই ঐ সকল মন্ত্রের মর্ম।'

সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত ওল্ডেন্‌বের্গ (Oldenberg) কয়েগীর এই মতের বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহার 'Religion des veda' (রেলিজন ডেস্ বেদ) অর্থাৎ বেদের ধর্ম নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন বেদের মন্ত্রগুলির যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ; যজ্ঞের বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডে প্রযুক্ত গান ও প্রবচনগুলিই বেদমন্ত্রের (সংহিতার) রূপ ধারণ করিয়াছে। পুরোহিতপ্রধান সমাজেই সংহিতা মন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব।

কয়েগী ও ওল্‌ডেনবের্গের মত সুমেরু কুমেরুবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ ; উভয় মতই আংশিকভাবে সত্য। ভিন্টারনিৎস্ মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন কয়েগী ও ওল্ডেনবের্গের মত দুইটি চূড়ান্ত কোটি এবং প্রকৃত তত্ত্ব উভয় কোটির মধ্যমার্গে অবস্থিত ; উভয়ের মতই অংশতঃ সত্য, অংশতঃ

ভ্রান্ত। একথা ঠিক যে অধিকাংশ বেদের মন্ত্র যজ্ঞসম্বন্ধরহিত স্বতন্ত্র এবং গীতি বা কাব্যধর্মই সেগুলির প্রাণ; যজ্ঞের উৎপত্তির বহুপূর্বে ঐ সকল মন্ত্র প্রকাশিত। যেমন পুরুষসূক্ত, হিরণ্যগর্ভসূক্ত, নাসদীয়সূক্ত, দেবীসূক্ত, পুরুরবা-উর্বশীসংবাদ, যমযমীসংবাদ, সবিতৃদেবের কয়েকটি সূক্ত, মণ্ডূকসূক্ত, অক্ষসূক্ত প্রভৃতির যজ্ঞের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই ; প্রথমোক্ত চারিটি সূক্ত উচ্চকোটির দর্শনচিন্তার অভিব্যক্তি। আবার কতকগুলি বেদমন্ত্রের যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ স্পষ্ট প্রতীত হয়। সেগুলি যজ্ঞের জন্যই রচিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল। যজ্ঞসম্বন্ধরহিত বিশুদ্ধকাব্যধর্মী কতক মন্ত্র পরবর্তী যুগে যজ্ঞের বিনিয়োগরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভিন্টারনিৎস্ সমর্থিত এই মধ্যবর্তী পথই যুক্তি সঙ্গত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে পারা যায়—প্রাচীন ভারতে পূর্বমীমাংসাদর্শন ওল্‌ডেন্‌বের্গের মতের প্রথম পথপ্রদর্শক। পূর্বমীমাসার একটি সূত্রে জৈমিনি বলিতেছেন—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্'। আম্নায় মানে বেদ। বেদের মন্ত্রের সহিত যজ্ঞক্রিয়াত্মক অর্থের সম্বন্ধ থাকায় যে সকল মন্ত্রে যজ্ঞক্রিয়ার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না সেই সকল মন্ত্র অনর্থক বুঝিতে হইবে।

বেদমন্ত্রের সহিত যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডের সম্বন্ধের উপর সায়ণাচার্যও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ঋগ্‌ভাষ্যোপোদ্‌ঘাতে তিনি কেন ঋক্‌সংহিতার ভাষ্য আগে না লিখিয়া যজুর্বেদের, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণযজুর্বেদের ভাষ্য আগে লিখিয়াছেন তাহার সমর্থনে বলিয়াছেন যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডে যজুর্বেদের গুরুত্ব, অধ্বর্যুর প্রাধান্য ঋগ্‌বেদ ও সামবেদ হইতে অধিক। মদীয় পরমশ্রদ্ধাভাজন আচার্য মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী বলিতেন, সায়ণাচার্য নিজে কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ, তজ্জন্যই কৃষ্ণযজুঃসংহিতার ভাষ্য সর্বাগ্রে লিখিয়াছেন, ইহাই আসল কথা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চারবেদের ভাষ্যকারগণ

প্রাচীনকালে চারিটি বেদের বহু ভাষ্যকার ছিলেন কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ভাষ্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নিম্নে বর্ণিত ভাষ্যগুলির কোন কোনটি পূর্ণাঙ্গরূপে কোন কোনটির অংশবিশেষ বর্তমানে পাওয়া যায়।

ঋগ্‌বেদ :—বর্তমানে ঋক্‌সংহিতার প্রায় পনরটি ভাষ্য পাওয়া যায়।

তন্মধ্যে কতিপয় ভাষ্য ঋক্‌সংহিতার অংশবিশেষের উপর রচিত ; কেবলমাত্র স্কন্দস্বামী ও সায়ণাচার্য এই দুইজন সম্পূর্ণ ঋক্‌সংহিতার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। পনরজন ভাষ্যকারের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) স্কন্দস্বামী :—স্কন্দস্বামী ঋক্‌সংহিতার প্রাচীনতম ভাষ্যকার বলিয়া পরিগণিত। ৬৮৭ বিক্রমাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন। সমগ্র ঋক্‌সংহিতার উপর তিনি ভাষ্য রচনা করেন কিন্তু এই মূল্যবান্ গ্রন্থের কিয়দংশ আজও উদ্ধার করা হয় নাই। প্রথম অষ্টকের উপর সম্পূর্ণ ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে ; দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অষ্টক পর্যন্ত ভাষ্য স্থানে স্থানে খণ্ডিত ও লুপ্ত। কয়েকজন পণ্ডিত এই লুপ্ত অংশগুলি পুনরুদ্ধারজন্য চেষ্টা করিতেছেন। স্কন্দস্বামীর ভাষ্যের পাণ্ডুলিপিরাজি ত্রিবন্দ্রম্ ও আদিয়ার্ গ্রন্থাগারে এবং মাদ্রাজের জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। খ্যাতনামা বিদ্বান্ শাম্বশিবশাস্ত্রী এই ভাষ্যের কিয়দংশ প্রকাশ করাইয়াছেন। ঋক্‌সংহিতার খ্যাতনামা ভাষ্যকার হরিস্বামী, আত্মানন্দ, বেঙ্কটমাধব, সায়ণাচার্য, দেবরাজযজ্বা প্রভৃতি স্কন্দস্বামীর ভাষ্য হইতে পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়াছেন,—ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে স্কন্দস্বামী তাঁহাদের পূর্বাচার্য।

স্কন্দস্বামী বলভী নামক জনপদের বাসিন্দা ছিলেন। বেঙ্কটমাধব বলেন—নারায়ণ এবং উদ্‌গীথ এই দুইজন খ্যাতনামা ঋগ্‌বেদভাষ্যকারের সহযোগিতায় স্কন্দস্বামী তাঁহার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ডাক্তার কুন্‌হন্‌রাজাও এই মত সমর্থন করেন। সায়ণাচার্যের ন্যায় স্কন্দস্বামীর ভাষ্যও যাজ্ঞিকব্যাখ্যানপন্থী।

(২) নারায়ণ :—স্কন্দস্বামীর ভাষ্যরচনায় সহযোগিতা করেন ; তদ্‌ব্যতীত নিজেও একটি ভাষ্য রচনা করেন ; সম্পূর্ণ ভাষ্য পাওয়া যায় না কেবল পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম অষ্টকের অংশবিশেষের উপর তাঁহার ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে। আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রের উপরও তিনি একটি বৃত্তি রচনা করেন ; সেই বৃত্তিই বর্তমানে প্রচলিত 'নারায়ণীটীকা'।

(৩) উদ্‌গীথ :—ইনিও স্কন্দস্বামীর সহযোগী ছিলেন ; নিজেও স্বতন্ত্র-ভাষ্য রচনা করেন। বর্তমানে ঋক্ সংহিতার দশম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের পঞ্চম সপ্তম ঋক্ হইতে দশম মণ্ডলের ৮৩তম সূক্তের পঞ্চম ঋক্ পর্যন্ত মন্ত্রের উপর তাঁহার ভাষ্য পাওয়া যায়। আত্মানন্দ ও সায়ণ—তাঁহাদের ভাষ্যে উদ্‌গীথের উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্‌গীথের ব্যাখ্যানও যজ্ঞপ্রক্রিয়ামূলক।

তাঁহার ভাষ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। কিংবদন্তীমতে তিনিও বলভী-বাসী ছিলেন।

(৪) হস্তামলক :—কিংবদন্তীমতে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের খ্যাতনামা শিষ্য হস্তামলক ঋগ্‌বেদের উপর একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু অদ্যাবধি তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। হস্তামলক ঋগ্‌বেদের আশ্বলায়ন শাখার ব্রাহ্মণ ছিলেন। ৭৫৭ বিক্রমাব্দে তিনি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে।

(৫) বেঙ্কটমাধব :—চোলরাজ্যে খ্রীষ্টীয় একদশ শতাব্দীর বেঙ্কটের কাল। কাবেরী নদীর দক্ষিণতীরস্থ গোমান গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কৌশিকগোত্রীয় তাঁহার পিতামহ ছিলেন মাধব, পিতা ছিলেন বেঙ্কট, মাতার নাম ছিল সুন্দরী। তৎকৃত ঋগ্‌ভাষ্যের নাম 'ঋগর্থদীপিকা'। প্রায় সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪৭ সনে ভারতবিভাগের পূর্বে লাহোরে প্রসিদ্ধ পুস্তকব্যবসায়ী মোতিলাল বারাণসীদাস কর্তৃক এই ভাষ্যের অর্ধাংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সায়ণের ভাষ্যের ন্যায় এই ভাষ্য বিস্তৃত ও বিশদ নহে। ইহা সংক্ষিপ্ত ও টীকাধর্মী। ভাষ্য না বলিয়া ইহাকে টীকা বলাই সমীচীন। সায়ণভাষ্যের ন্যায় বেঙ্কটের ব্যাখ্যানও যজ্ঞধর্মী। বেঙ্কট বলেন যে বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নিষ্ণাত নহে সে সংহিতার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ব্রাহ্মণগ্রন্থ না পড়িয়া কেবল নিরুক্ত ও ব্যাকরণ শাস্ত্র অনুশীলন করিলে বেদের এক চতুর্থাংশ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তদধিক নহে। বেঙ্কটমাধবের উক্তি,—

'সংহিতায়াস্তুরীয়াংশং বিজানন্তি অধুনাতনাঃ।
নিরুক্তব্যাকরণয়োরাসীদ্ যেষাং পরিশ্রমঃ॥'

(৬) লক্ষ্মণ :—কিংবদন্তী অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ নামক পণ্ডিত ঋগ্‌বেদের উপর ভাষ্য রচনা করেন, কিন্তু অদ্যাবধি তাহা পাওয়া যায় নাই।

(৭) ধানুষ্কযজ্বা :—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই নামের জনৈক বিদ্বান্ ঋক্, সাম, যজুঃ বেদত্রয়ের ভাষ্য রচনা করেন এইরূপ জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বেদের ভাষ্য আবিষ্কৃত হয় নাই।

(৮) আনন্দতীর্থ :—মাধবাচার্যের দ্বৈতাদ্বৈত প্রস্থানের সমর্থক আনন্দ-তীর্থ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ (১২৫৫-১৩৩৫) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি ঋক্‌সংহিতার প্রথম চল্লিশটি সূক্তের

উপর ভাষ্য রচনা করেন। বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা ভক্তি-মার্গানুযায়ী, সায়ণের ন্যায় যজ্ঞগন্ধী নহে। তাঁহার মতে পরমপুরুষ নারায়ণই সর্ববেদ প্রতিপাদ্য একমাত্র তত্ত্ব। আনন্দতীর্থের ঋগ্‌ভাষ্যের উপর জয়তীর্থ নামক একজন বৈষ্ণব পণ্ডিত টীকা রচনা করিয়াছেন; আবার নরসিংহ নামে অপর একজন বৈষ্ণব বিদ্বান্ জয়তীর্থের টীকার উপর টীকা লিখিয়াছেন। রাঘবেন্দ্র যতি নামক আর একজন বিদ্বান্ আনন্দতীর্থের ভাষ্যের উপর টীকা লিখিয়াছেন। আনন্দতীর্থ আশী বৎসর জীবিত ছিলেন।

(৯) আত্মানন্দ:—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আত্মানন্দ ঋগ্‌বেদের বিখ্যাত অস্যবামীয় সূক্তের (১-১৬৪) উপর ভাষ্য রচনা করেন।

শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত প্রস্থানের সমর্থক আত্মানন্দর এই ভাষ্য অদ্বৈত-বেদান্তনিষ্ঠ এবং গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁহার উল্লিখিত বহু গ্রন্থ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

(১০) সায়ণাচার্য:—দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্যের প্রথম বুক্ক, কম্পন ও সঙ্গম পরপর এই তিনজন রাজার প্রধান মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত বেদ-ভাষ্যকাররূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সায়ণাচার্যের কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-শতাব্দী। তিনি রণকুশল যোদ্ধা এবং পূর্তকর্মের অধ্যক্ষও ছিলেন। চম্পারাজ্যের সহিত বিজয়নগরের যুদ্ধে তিনি সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া চম্পারাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মায়ন, জননীর নাম শ্রীমতী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম স্বনামধন্য মাধবাচার্য এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ভোগনাথ। তাঁহার গুরুর নাম ছিল শ্রীকণ্ঠনাথ। একদল পণ্ডিতের মতে মাধবাচার্য ও সায়ণাচার্য একই ব্যক্তির নাম কিন্তু কিংবদন্তী অনুসারে এবং কতিপয় গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ বচনের প্রামাণ্যে সায়ণাচার্য ও মাধবাচার্য সহোদর ভ্রাতা ছিলেন; সায়ণ মাধবের অনুজ ও অন্তেবাসী ছিলেন। সন্ন্যাসী ও বিশ্রুত-বিদ্বান্ অগ্রজ মাধবাচার্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ সায়ণ তাঁহার রচিত বেদভাষ্যের "মাধবভাষ্য" আখ্যা দান করিয়াছিলেন। এই মাধবাচার্যই 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। সায়ণের গোত্র ভরদ্বাজ, শাখা তৈত্তিরীয় এবং সূত্র বোধায়ন। বাহাত্তর (৭২) বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় শাখার ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া সর্বপ্রথম কৃষ্ণযজুর্বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের ভাষ্য রচনা করেন। তৎপর ঋগ্‌বেদের ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার ঋগ্-ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে তিনি যজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য বেদ অপেক্ষা

যজুর্বেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। সায়ণের বেদব্যাখ্যা যজ্ঞপ্রক্রিয়ামূলক; তাঁহার মতে যজ্ঞে বিনিয়োগই বেদমন্ত্রের প্রধান তাৎপর্য। যজ্ঞানুসারী ব্যাখ্যান বজায় রাখিবার জন্য স্থান বিশেষে তিনি নিরুক্তকার যাস্কের ব্যাখ্যাও পরিহার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যে বহুস্থানে বেদব্যাখ্যামার্গে তাঁহার পূর্বসূরী খ্যাতনামা স্কন্দস্বামী, নারায়ণ ও উদ্‌গীথ আচার্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; এই প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণ ঐ তিনজন পূর্বাচার্যের বেদ ব্যাখ্যানও যজ্ঞগন্ধী।

বৈদিক বাঙ্‌ময়ের ইতিহাসে সায়ণাচার্যের নাম প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় ভূখণ্ডে স্বমহিমায় ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়ন, অপরাজেয় অধ্যবসায়, অলোকসামান্য মেধা ও অক্লান্ত সারস্বত সাধনা আলোচনা করিলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতে হয়। তিনি একজীবনে চার বেদের উপর, ব্রাহ্মণ গ্রন্থরাজির উপর, আরণ্যকগ্রন্থ নিচয়ের উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; ইহা ছাড়া তিনি ঐতরেয়োপনিষদ্, সামপ্রাতিশাখ্য প্রভৃতি গ্রন্থেরও ভাষ্য লিখিয়াছেন। ভাষ্যসাহিত্য ছাড়া তিনি কতকগুলি মূল গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন; সুভাষিতসুধানিধি, প্রায়শ্চিত্তসুধানিধি, অলংকারসুধানিধি, পুরুষার্থ-সুধানিধি, মাধবীয়ধাতুবৃত্তি প্রভৃতি মূল্যবান্ গ্রন্থ তাঁহারই লেখনীপ্রসূত। জনশ্রুতি মতে নরহার, সোমযাজী, নারায়ণ, বাজপেয়যাজী, পণ্ডারীদীক্ষিত প্রভৃতি কতিপয় বেদ-বিদ্বান সায়ণাচার্যকে বিশাল বারিধিসমতুল্য বেদভাষ্যরচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

সায়ণ তাঁহার ভাষ্যগ্রন্থে বেঙ্কটমাধব, ভট্টভাস্কর, ভরতস্বামী, কপর্দীস্বামী, স্কন্দস্বামী প্রভৃতি পূর্বাচার্যের গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

জার্মানীর বিশ্ববিশ্রুত সংস্কৃতজ্ঞ আচার্য মাক্ষ্‌মূলারই সর্বপ্রথম সায়ণকৃত ঋগ্‌ভাষ্যের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া বহু পরিশ্রম করিয়া সায়ণকৃত সম্পূর্ণ ঋক্-সংহিতাভাষ্য মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। প্রাচ্য প্রতীচ্যের বিদ্বৎ-সমাজ এইজন্য মাক্ষ্‌মূলারের নিকট চিরঋণী। এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, প্রতি-লিপিকরণ ও মুদ্রণকর্ম সম্পন্ন করিতে আচার্য মূলারের পঁচিশ (২৫) বৎসর লাগিয়াছিল।

(১১) <u>রাবণ</u>:—কোনও কোনও পণ্ডিত সায়ণ ও রাবণ একই ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সায়ণ ও রাবণ দুইজন পৃথক ব্যক্তি এবং বিভিন্ন সময়ের। মল্লারি, দৈবজ্ঞ, সূর্যপণ্ডিত প্রভৃতি বেদশাস্ত্র-

নিষ্ণাত পণ্ডিতদের গ্রন্থ হইতে জানা যায় ভারতবর্ষে রাবণ নামে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন। হল্ (Hall) নামক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ইতিমধ্যে ঋগ্‌বেদের উপর রাবণভাষ্যের যে যে অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

রাবণের ব্যাখ্যানশৈলীও সায়ণ হইতে পৃথক। সায়ণভাষ্য যজ্ঞনিষ্ঠ বা আধিদৈবিক-ভাবসমৃদ্ধ কিন্তু রাবণের ভাষ্য আধ্যাত্মিক ভাবনিষ্ঠ; তিনি যজ্ঞের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, আধ্যাত্মিকতত্ত্বের দার্শনিকতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। দার্শনিক আত্মানন্দের বেদব্যাখ্যান রাবণের ন্যায় আধ্যাত্মিকতত্ত্বনিষ্ঠ। জনশ্রুতিমতে যজুর্বেদের উপরও রাবণ ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। তিনি ঋক্‌সংহিতার একটি পদপাঠও রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু মাত্র সপ্তম অষ্টকের পদপাঠের কতিপয় পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। বহুস্থানে তিনি প্রচলিত পদপাঠ পরিহার করিয়া নিজের সম্মত পদপাঠ দিয়াছেন। উদ্‌গীথ এবং দুর্গাচার্য রাবণকৃত পদপাঠ সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্ত্যের বহু বেদবিদ্বান্ মনে করেন ঋক্‌সংহিতা ও যজুঃসংহিতার উপর রাবণের সমগ্রভাষ্য আবিষ্কার করিতে পারিলে অধ্যাত্ম-ভাবনিষ্ঠ বহু সূক্তের অর্থোদ্ধার সহজ হইবে।

(১২) মুদ্‌গল :—মুদ্‌গলের জীবনী বিষয়ে কিছু জানা যায় না। প্রথম অষ্টকের সম্পূর্ণ এবং চতুর্থ অষ্টকের পাঁচটি অধ্যায়ের উপর তাঁহার ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে। সায়ণের ব্যাখ্যান মার্গই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। মুদ্‌গল পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন।

(১৩) চতুর্বেদস্বামী :—ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক; ঋক্‌-সংহিতার অংশবিশেষের উপর চতুর্বেদস্বামী ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন তজ্জন্য স্বামীর মন্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ।

ঋগ্‌বেদের কোন ভাষ্যকারই এই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে পারেন নাই। ঋক্‌সংহিতার একটি মাত্র মন্ত্র (১০-১১৩-৪) হইতেই এই ভাষ্যকার শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পূতনাবধ, কংসবধ, গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ, কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ প্রভৃতি অসম্ভব অর্থ দোহন করিয়াছেন। মন্ত্রটি এই,—

'জজ্ঞান এব ব্যবাধত স্পৃধঃ
প্রাপশ্যদ্‌বীরো অভি পৌংস্যং রণম্।

অবৃশ্চদদ্রিমব সস্যদঃ সৃজ-

দস্তভ্নান্নাকং স্বপস্যয়া পৃথুম্ ॥'

এই মন্ত্র হইতে কল্পনার বলেও ঐরূপ অর্থদোহন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কংস, পূতনা, গোবর্দ্ধন ইত্যাদির নামও এই মন্ত্রে বা পূর্বাপরমন্ত্রে দৃষ্ট হয় না। এই সকল কারণে পণ্ডিত সমাজ চতুর্বেদস্বামীর ভাষ্যকে ভাষ্য বলিয়া গণ্য করেন না।

(১৪) দেবস্বামী :—মহাভারতের বিমলবোধ নামক টীকাকার বলিয়াছেন যে দেবস্বামী নামে জনৈক বিদ্বান্ ঋক্‌সংহিতার ভাষ্য লিখিয়াছিলেন কিন্তু অদ্যাবধি তাহা পাওয়া যায় নাই। সংহিতার ভাষ্য পাওয়া যায় নাই কিন্তু আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ও আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রের উপর দেবস্বামীর ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে ও তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৫) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী :—ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত স্বামী দয়ানন্দকে বর্তমান যুগের বেদশাস্ত্রের প্রথিতযশা বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। তাঁহার লোকোত্তর মনীষা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা ভারতবর্ষের ও প্রতীচ্যের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে করিয়াছেন ও করেন। তিনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হয়েন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল মূলজী বা মূল শঙ্কর। তিনি সামবেদের ঔদীচ্যশাখার ব্রাহ্মণ ছিলেন। মথুরার স্বামী বিরজানন্দ নামক সন্ন্যাসী তাঁহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দান করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দস্বামী তাঁহার বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বেদভাষ্য রচনা আরম্ভ করেন। ভাষ্যটি সরল সংস্কৃতে বিরচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীভাষায় অনুবাদও করিয়াছেন। হিন্দী অনুবাদও তিনি নিজেই করেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের দীপান্বিতা (দেওয়ালী) উৎসবের দিন তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৪ আট বৎসরে তিনি ঋক্ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ পর্যন্ত ভাষ্য রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিশাল ভাষ্যরচনার কার্য আরম্ভের পূর্বে তিনি 'ঋগ্‌বেদাদিভাষ্য-ভূমিকা' ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব চারিবেদের ভাষ্যের ভূমিকা অংশ লিখিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ; বিবিধ আলোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

স্বামী দয়ানন্দ আর্য সমাজের পুরোধা ও প্রতিষ্ঠাতা। আর্য সমাজের বহু তত্ত্ব তাঁহার ভাষ্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি দেবতাবাদ স্বীকার করেন

না। নিরুক্তকারোক্ত তিন দেবতা বা যাজ্ঞিকগণের তেত্রিশ দেবতা তিনি মানেন না। তিনি বেদের দেবতামণ্ডলীর এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং দেবতা বাচক সকল শব্দের অর্থ পরমাত্মা বা পরমেশ্বর করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ববর্তী কোনও ভাষ্যকারের সহিত তাঁহার মত সম্পূর্ণ মিলে না। তিনি বেদের সংহিতা ভাগের নিত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিন্তু ব্রাহ্মণভাগের, আরণ্যক গ্রন্থের নিত্যতা স্বীকার করেন নাই। বেদে ইতিহাস-মূলক আখ্যানও তিনি স্বীকার করেন না। ভাষ্যকার রাবণের নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাবণের ন্যায় তিনিও কোনও কোনও স্থলে শাকল্যকৃত পদপাঠ বর্জন করিয়া নিজস্ব স্বতন্ত্র পদপাঠ করিয়াছেন। সর্বানুক্রমণীকার কাত্যায়নের দেবতানির্বাচনও তিনি অনেকক্ষেত্রে পরিহার করিয়া অন্য দেবতা কল্পনা করিয়াছেন। একটি শব্দের ক্ষেত্রভেদে বহু অর্থ কল্পনা করিয়াছেন; যেমন ইন্দ্র শব্দের তিনি কোথাও ঈশ্বর, কোথাও জীবাত্মা, কোথাও বায়ু, কোথাও সূর্য, কোথাও রাজা, আবার কোনও স্থলে বিদ্বান রাজা অর্থ করিয়াছেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বহু মনীষী দয়ানন্দস্বামীর ঋগ্বেদভাষ্যের প্রশংসা ও অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তার মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন; আবার পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অধ্যাপক গ্রিফিথ্ (Griffith), হিউম (Hume) প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত তাঁহার মত খণ্ডনও করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ দয়ানন্দের ব্যাখ্যান-শৈলী সমর্থন করিয়াছেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদের ভাষ্যকার

কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতায় আটজন ভাষ্যকারের নাম পাওয়া যায়।

(১) ভবস্বামী :—ভবস্বামী অতি প্রাচীন ভাষ্যকার। কেহ কেহ বলেন তিনি বিক্রমসংবৎ প্রারম্ভের আটশত বর্ষ পূর্বের লোক। অন্যান্য ভাষ্য-কারদের উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয় তিনি সম্পূর্ণ তৈত্তিরীয় সংহিতার উপর ভাষ্য লিখিয়াছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত সে গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। এই সংহিতার প্রখ্যাত ভাষ্যকার ভট্টভাস্করের ভাষ্যের সূচনায় "ভবস্বাম্যাদিভাষ্য" পদে ভবস্বামীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং তিনি যে ভাষ্যরচনা করিয়াছিলেন তাহা সুপ্রমাণিত হয়।

(২) গুহদেব :—গুহদেব ভবস্বামীর সমকালীন ব্যক্তি। এই সংহিতার

উপর তাঁহার ভাষ্য ছিল। ভট্টভাস্কর ইঁহার নামও উল্লেখ করিয়াছিলেন। নিঘণ্টু গ্রন্থের ভাষ্যভূমিকায় দেবরাজযজ্বাও বলিয়াছেন যে গুহদেব বেদের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার ভাষ্য অনুপলব্ধ রহিয়াছে।

(৩) ভট্টভাস্কর :—তৈত্তিরীয়সংহিতার খ্যাতনামা সুপণ্ডিত ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর একাদশশতাব্দীর লোক। সায়ণ ও দেবরাজযজ্বা বহুস্থলে ভট্টভাস্করের ভাষ্যের উদ্ধৃতি তুলিয়াছেন। ভট্টভাস্কর শৈব ছিলেন; স্বকীয়ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে তিনি শিবের প্রতি প্রণতি জানাইয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য উচ্চকোটির এবং বিদ্বজ্জনসমাদৃত; ভাষ্যের নাম দিয়াছেন তিনি "জ্ঞানযজ্ঞ"। এই ভাষ্যের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ মুদ্রিত হইয়াছে; কেবল চতুর্থ কাণ্ডের কিছু অংশের মুদ্রণ বাকী আছে। ভাষ্যকারের গোত্র কৌশিক এবং সম্পূর্ণ নাম ভট্টভাস্করমিত্র। তাঁহার পূর্ববর্তী ভাষ্যকাদের তিনি স্বীয়ভাষ্যে 'কেচিৎ', 'অপরে' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) ক্ষুর :—সায়ণাচার্য তাঁহার ধাতুবৃত্তিগ্রন্থে পাঁচবার ক্ষুর নামক কৃষ্ণযজুর্বেদী পণ্ডিতের মত উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা হইতে জানা যায় ক্ষুর সম্পূর্ণ তৈত্তিরীয় সংহিতার উপর ভাষ্য লিখিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত সে ভাষ্য অপ্রাপ্ত। কেহ কেহ অনুমান করেন তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর ব্যক্তি।

(৫) সায়ণাচার্য্য :—সম্পূর্ণ তৈত্তিরীয় সংহিতার উপর সায়ণের ভাষ্য পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি—সায়ণ সর্বপ্রথম এই সংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার ভাষ্যে সায়ণ পূর্বাচার্যদের মত উল্লেখ করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী কোথাও খণ্ডন, কোথাও মণ্ডন করিয়াছেন। যজুর্বেদের সহিত যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের অধ্বর্যুর করণীয় বিবিধ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত নির্দেশ আছে। তজ্জন্য সায়ণ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া প্রতি মন্ত্রের বিনিয়োগ অতি বিস্তৃত ও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সমর্থক বচন রূপে শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি হইতে বহু উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতার ১-১-৮ প্রপাঠক-১২ অনুবাকের রাজসূয় যজ্ঞ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে সায়ণের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষে রাজা রাজেন্দ্র বর্মার পুত্র অথবা পৌত্র রাজা নরসিংহ বর্মা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন :

'অয়ং পুরতো বর্তমানোঽসৌ নরসিংহবর্মা
অমুষ্যায়নোঽমুষ্য রাজেন্দ্রবর্মনঃ পুত্রঃ পৌত্রোবা।'

(৬) বেঙ্কটেশ :—তৈত্তিরীয় সংহিতার সপ্তমকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ তিনটি কাণ্ডের উপর বেঙ্কটেশ ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার ভাষ্যের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে; এখনও মুদ্রিত হয় নাই। কোনও কোনও পুস্তকে তাঁহার নাম "বেঙ্কট নাথ" দৃষ্ট হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী তাঁহার কাল।

(৭) বালকৃষ্ণ :—তৈত্তিরীয় সংহিতার উপর ইঁহার ভাষ্য আছে কিন্তু ভাষ্য স্থানে স্থানে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন; এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বালকৃষ্ণের কাল সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেহ কোন আলোকপাত করিতে পারেন নাই।

(৮) শত্রুঘ্ন :—এই পণ্ডিতের ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে এবং প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষ্যের নাম 'মন্ত্রার্থদীপিকা'। ভাষ্যটি অসম্পূর্ণ। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই ভাষ্য রচিত হয়।

শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন সংহিতার ভাষ্যকার

(১) শৌনক :—মাধ্যন্দিন সংহিতার একত্রিংশ অধ্যায়ের বিখ্যাত পুরুষসূক্তের উপর শৌনকের ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে। তিনি 'অপরে বদন্তি', 'কেচিৎ এবমাহুঃ' ইত্যাদি উক্তিতে তাঁহার পূর্ববর্তী ভাষ্যকারদের ইঙ্গিত করিয়াছেন; ইহা হইতে সহজেই অনুমান হয় তাঁহার পূর্বেও কয়েকজন ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাতা ছিলেন। শৌনকের ব্যাখ্যা উচ্চকোটির এবং অধ্যাত্মনিষ্ঠ। পুরুষসূক্তের প্রকৃত বিনিয়োগ মোক্ষলাভে,—তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যান-শৈলীতে বৈষ্ণব মতবাদের প্রভাব স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

(২) উবট :—উবটের মাধ্যন্দিন যজুঃ সংহিতার ভাষ্য অত্যন্ত বৈদগ্ধ্যপূর্ণ, বিখ্যাত ও সম্মানিত। তাঁহার ঋকপ্রাতিশাখ্য ও যজুঃপ্রাতিশাখ্যের টীকাও প্রসিদ্ধ ও বিদ্বজ্জনসমাদৃত। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মহারাজা ভোজের রাজত্বকালে অবন্তী নগরে উবট এই ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন আনন্দপুর নিবাসী বিশ্রুত বিদ্বান্ বজ্রট।

উবটের ভাষ্যের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই ভাষ্যের বারাণসীতে প্রকাশিত সংস্করণ ও মহারাষ্ট্রে প্রকাশিত সংস্করণের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বারাণসীর সংস্করণে পুরুষসূক্তের উপর উবটের

নিজস্ব ভাষ্য পাওয়া যায় কিন্তু মহারাষ্ট্রী সংস্করণে উবটভাষ্যমধ্যে পুরুষসূক্তের উপর উবটের পরিবর্তে শৌনকের ভাষ্য মুদ্রিত হইয়াছে। কাশীর সংস্করণে পণ্ডিত রামসকলমিশ্র উবটভাষ্যের দুই প্রকার পাঠই পৃথক পৃথক মুদ্রিত করিয়াছেন। উবটের ভাষ্য যজ্ঞনিষ্ঠ বা আধিদৈবিক। এই সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের বিংশতিতম মন্ত্র 'প্রতদ্‌বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেন মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ' ব্যাখ্যা করিবার সময় উবট মৎস্যকূর্মাদি অবতারেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণের ন্যায় তিনিও বেদের পরবর্তী পুরাণের কাহিনী বেদমন্ত্র ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করিয়াছেন। ঋষি, দেবতা, ছন্দ নির্বাচন ব্যাপারে সর্বত্র উবট সর্বানুক্রমণী অনুসরণ করেন নাই।

(৩) গৌরধর :—গৌরধর খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার পৌত্র জগদ্ধর স্বীয় "স্তুতিকুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতামহ গৌরধর পণ্ডিত মাধ্যন্দিন সংহিতার উপর "বেদবিলাস" নামে এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাষ্য আজ পর্যন্ত অপ্রাপ্ত ও অপ্রকাশিত।

(৪) রাবণ :—পণ্ডিত পদ্মনাভ তাঁহার রচিত 'রুদ্রপ্রয়োগদর্পণ' গ্রন্থে বলিয়াছেন—রাবণ এই সংহিতার উপর এক ভাষ্য লিখিয়াছিলেন কিন্তু অদ্যাবধি তাহা অপ্রাপ্ত।

(৫) মহীধর :—খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বারাণসীধামে বিখ্যাত বিদ্বান্ মহীধর এই সংহিতার উপর 'বেদদীপ' নামক ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্য বিদ্বৎসমাজে প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত। তাঁহার ব্যাখ্যা যজ্ঞনিষ্ঠ। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ও ডাক্তার লক্ষ্মণ স্বরূপের মতে মহীধরের ভাষ্যরচনার কাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। কাহারও কাহারও মতে এই মহীধর 'মন্ত্র-মহোদধি' নামে এক তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

(৬) স্বামী দয়ানন্দ :—ঋকসংহিতার খ্যাতনামা ভাষ্যকার স্বামী দয়ানন্দের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পৌষকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী-তিথিতে বৃহস্পতিবারে স্বামীজী শুক্লযজুঃ সংহিতার (মাধ্যন্দিন শাখা) ভাষ্য রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্গশীর্ষ কৃষ্ণা প্রতিপদ-তিথিতে শনিবাসরে সমাপ্ত করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই ভাষ্য প্রকাশিত হয়। ঋগ্‌বেদ ভাষ্যে দয়ানন্দ সরস্বতী যে ব্যাখ্যান-শৈলী অনুসরণ করিয়াছেন এই সংহিতার ভাষ্যেও একই শৈলী দৃষ্ট হয়। 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ পূজা, 'দেবতা'র অর্থ পরমাত্মা, ইন্দ্র রুদ্র প্রভৃতি দেবতার জীবাত্মা,

সূর্য প্রভৃতি নানা অর্থ নিষ্পাদন ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। তাঁহার ঋকসংহিতার ব্যাখ্যা যেমন বহু বিদ্বান্ মানিয়া লইতে পারেন নাই তদ্রূপ এই ভাষ্যেরও অনেকে বিরোধিতা করিয়াছেন।

শুক্লযজুর্বেদসংহিতা (কাণ্বশাখা)-র ভাষ্যকার

(১) সায়ণাচার্য ঃ—কাণ্বসংহিতার চল্লিশটি অধ্যায়ের মধ্যে কেবল কুড়িটি অধ্যায়ের উপর সায়ণের ভাষ্য পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডের অন্তিম অধ্যায়ের সায়ণভাষ্য যেরূপ লুপ্ত হইয়াছে তদ্রূপ এই সংহিতার অন্তিম বিংশতি অধ্যায়ের সায়ণ-ভাষ্যও অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ভাষ্যে সায়ণ শুক্লযজুর্বেদের পনরটি শাখার নাম করিয়াছেন। সায়ণের এই ভাষ্যও যজ্ঞমূলক।

(২) আনন্দবোধ ঃ—জাতবেদ ভট্টোপাধ্যায়ের পুত্র আনন্দবোধ সম্পূর্ণ কাণ্বসংহিতার উপর 'কাণ্ববেদমন্ত্রভাষ্য সংগ্রহ' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাষ্যও অলব্ধ এবং সম্পূর্ণ অংশ অপ্রকাশিত। খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বালশাস্ত্রী আগাশে খণ্ডিতভাষ্য মুদ্রিত করিয়াছেন।

(৩) অনন্তাচার্য ঃ—কাশীনিবাসী কাণ্বশাখীয় ব্রাহ্মণ অনন্তাচার্যের পিতার নাম ছিল নাগেশভট্ট বা নাগদেব এবং জননী ছিলেন ভাগীরথী দেবী। তিনি এই সংহিতার একবিংশতিতম অধ্যায় হইতে চত্বারিংশত্তম অধ্যায় পর্যন্ত কুড়িটি অধ্যায়ের উপর "ভাবার্থদীপিকা" নামক টীকা রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বালশাস্ত্রী আগাশে এই টীকা প্রকাশ করিয়াছেন।

অনন্তাচার্য যজুঃপ্রতিশাখ্য, ভাষিকসূত্র এবং কাণ্বশাখা শতপথব্রাহ্মণের ত্রয়োদশকাণ্ডের উপরও ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি "বেদার্থদীপিকা" ও "কাণ্বায়নস্মার্ত্ত-মন্ত্রার্থদীপিকা" নামক টীকা এবং 'কণ্বকণ্ঠাভরণ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অনন্তাচার্য খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি ছিলেন।

(৪) হলায়ুধ ঃ—খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে হলায়ুধ কাণ্বসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। সেই ভাষ্যের খণ্ডিতরূপ বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। তাঁহার ভাষ্যের নাম 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব'। ইহা ব্যতীত তিনি মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব,

পণ্ডিতসর্বস্ব ইত্যাদি গ্রন্থও রচনা করেন কিন্তু এ সকল গ্রন্থই অনুপলব্ধ ও অপ্রকাশিত।

দ্রষ্টব্য :—শুক্লযজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখার সংহিতার যে সব ভাষ্যকারের নাম উপরে দেওয়া হইল তাহা ছাড়া শুধু পুরুষসূক্তের উপর কেহ কেহ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন ; কেহ কেহ প্রসিদ্ধ রুদ্রাধ্যায়ের উপর কেহ কেহ এই সংহিতার অন্তর্গত ঈশোপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ভাষ্যকারদের নাম এখানে দেওয়া হইল না।

সামবেদ (কৌথুম শাখার) সংহিতার ভাষ্যকার

মাধব :—খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে মাধব নামে এক পণ্ডিত সামসংহিতার উপর টীকা রচনা করেন। প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমীই সর্বপ্রথম এই টীকা আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার সামবেদ কৌথুম সংহিতার সংস্করণে "মাধবীয়বিবরণ" নাম দিয়া টিপ্পনীর আকারে প্রকাশ করেন। মাধবকৃত এই 'সামবিবরণ' উচ্চকোটির পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। সংহিতার পূর্বার্ধের টীকার নাম 'ছন্দসিকাবিবরণ' এবং উত্তরার্ধের নাম 'উত্তর-বিবরণ'।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঋক্‌সংহিতার ভাষ্যকার স্কন্দস্বামীর সহকারী নারায়ণ পণ্ডিতের পুত্র এই মাধব। মাধবের 'সামবিবরণে' স্কন্দস্বামীর ঋগ্‌ভাষ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। মাধবকৃত সামবেদীয় ভূমিকা স্কন্দস্বামীর ঋগ্‌ভাষ্য ভূমিকারই রূপান্তর বলা চলে।

(২) ভরতস্বামী :—শ্রীরঙ্গপট্টম্ শহরে খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভরতস্বামী সামবেদের ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার জনকের নাম নারায়ণ এবং জননীর নাম যজ্ঞদা। ভরত কশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার ভাষ্য সংক্ষিপ্ত হইলেও সারগর্ভ এবং সম্পূর্ণ সংহিতানিষ্ঠ। অদ্যাবধি সম্পূর্ণ ভাষ্য মুদ্রিত হয় নাই। মাধবের "সামবিবরণ" গ্রন্থেরও ব্যাখ্যানের প্রভাব সুস্পষ্ট।

(৩) সায়ণ :—বেদবিদ্বৎশিরোমণি সায়ণাচার্য এই সংহিতার উপরেও ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যভূমিকায় তিনি সামবেদের প্রাণ গানের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

(৮) দৈবজ্ঞসূর্যপণ্ডিত :—প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী জ্ঞানরাজা পণ্ডিতের পুত্র 'সূর্যপণ্ডিত' গোদাবরী তটস্থিত পার্থনগরে বাস করিতেন। তিনিও পিতার ন্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রে নিষ্ণাত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামের পূর্বে "দৈবজ্ঞ"

শব্দটি আছে। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উপর "পরমার্থপ্রপা" নামে এক টীকা রচনা করেন। সেই টীকায় তিনি বলিয়াছেন যে তিনি সামবেদসংহিতার ভাষ্য লিখিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি সেই ভাষ্য পাওয়া যায় নাই। গীতার টীকায় তিনি বলিয়াছেন যে তিনি রাবণ ভাষ্য হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। "লীলাবতী" গণিতশাস্ত্রের উপরও তিনি টীকা লেখেন। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর লোক ছিলেন সূর্যপণ্ডিত।

অথর্ববেদ (শৌনক সংহিতার) ভাষ্যকার

সায়ণাচার্য—অথর্ববেদ সংহিতার একমাত্র সায়ণাচার্যের ভাষ্যই পাওয়া যায় এবং মনে হয় আর কেহ এই সংহিতার উপর ভাষ্য রচনা করেন নাই। সায়ণ অপর তিন বেদের ভাষ্য রচনা করিবার পর এই সংহিতার ভাষ্য লেখেন। ভাষ্য সূচনায় তাঁহার নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক হইতেই এই কথা জানা যায়,—

"ব্যাখ্যায় বেদত্রিতয়ং আমুষ্মিকফলপ্রদম্।
ঐহিকামুষ্মিকফলং চতুর্থং ব্যাচিকীর্ষতি॥"

"পারত্রিক ফলদায়ক" ঋক্ সাম যজুঃ তিন বেদ ব্যাখ্যা করার পর ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ফলদায়ক চতুর্বেদ অর্থাৎ অথর্বসংহিতা ব্যাখ্যা করা হইতেছে। ব্যাধিনিরাময়, বিবিধ ঔষধ, পতিলাভ, পত্নীলাভ, সপত্নী-নিরাকরণ, রাজ্যলাভাদি বিবিধ ঐহিক ফললাভের কথাও এই সংহিতায় আছে। সায়ণের অথর্ববেদভাষ্য-ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ, ইহাতে সায়ণ বেদশাস্ত্রের বিবিধতত্ত্বের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গভীর আলোচনা করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বেদের প্রামাণ্য বিচার

লক্ষণ এবং প্রমাণ ব্যতীত কোন বস্তু সিদ্ধ হয় না। 'লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ।' বেদের লক্ষণ আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি ; এই পরিচ্ছেদে বেদের প্রামাণ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিরূপ বাক্যকে প্রমাণ বলে ? যে বাক্যের অর্থে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই (অসন্দিগ্ধার্থ), যাহার অর্থ পূর্বে অজ্ঞাত বা অনধিগত (অনধিগতার্থ) এবং যে বাক্যের অর্থের

কোনও ব্যাঘাত বা বাধা ঘটে না অর্থাৎ যাহার অর্থ কোনও অনুভবের দ্বারা খণ্ডিত হয় না তাদৃশ বাক্যকে প্রমাণ বলে। 'অসন্দিগ্ধ-অনধিগত-অবাধিতার্থ-বোধকং বাক্যং প্রমাণম্।' যদি বেদ-প্রবচনে সন্দেহ, জ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্ব ও বাধা এই দোষগুলি না থাকে তবে বেদবাক্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাচীনকাল হইতে লোকায়ত প্রভৃতি বেদবিরোধী সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়া বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছে। বেদের প্রামাণ্য, নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার পূর্ব-মীমাংসাগ্রন্থে স্থাপন করিয়াছেন; তিনি ঐ সকল বেদবিরোধীর মত পূর্ব-পক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। জৈমিনি বেদবিরোধিগণ বেদ-বাক্যের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং যে প্রকারে তাহাদের যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়া বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলেন, প্রত্যক্ষ অনুমান, শব্দ বা আগম প্রভৃতি প্রমাণের মধ্যে বেদের অস্তিত্ব শব্দপ্রমাণ বা আগমপ্রমাণদ্বারা প্রতিপাদিত হয়। আপ্তপুরুষের উপদেশকে শব্দপ্রমাণ বলে। 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।' কিন্তু এই যুক্তি মানিতে পারা যায় না যেহেতু শব্দপ্রমাণরূপ লক্ষণ যেমন বেদে প্রযোজ্য তদ্রূপ বেদবহির্ভূত স্মৃতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; অতএব তাহা বেদের অস্তিত্বের নিজস্বপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। লক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ আসিয়া পড়ে। বেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদে ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদেও সনৎকুমারকে নারদ তাঁহার অধীত গ্রন্থরাশির নামোল্লেখ করার সময় চারিবেদের নাম করিয়াছেন। যদি বলা হয় বেদের মধ্যেই বেদচতুষ্টয়ের নামের এইরূপ উল্লেখ থাকায় এই সকল উক্তিই বেদের অস্তিত্বের প্রমাণ তাহা হইলে 'আত্মাশ্রয়ত্ব'রূপ দোষ আসিয়া পড়ে। স্মৃতিগ্রন্থে বেদের উল্লেখ থাকায় বেদের অস্তিত্ব প্রাতপন্ন হইতেছে ইহাও বলা চলে না, কারণ স্মৃতিগ্রন্থ শ্রুতিমূলক অর্থাৎ শ্রুতির বা বেদের প্রামাণ্যের উপরই স্মৃতিগ্রন্থের প্রামাণ্য নির্ভর করে। মীমাংসকগণ বলেন স্মৃতিপদবাচ্য শাস্ত্রগ্রন্থের এবং লৌকিক গ্রন্থের ক্ষেত্রে আত্মাশ্রয়ত্ব দোষ বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধ স্বতঃপ্রমাণ অপৌরুষেয় বেদের ক্ষেত্রে আত্মাশ্রয়ত্ব দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। বেদের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অলৌকিকশক্তিহেতু বেদের মধ্যে উল্লিখিত বাক্য বেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া ধার্য। অতএব

বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্‌বাক্য, ঋক্‌সংহিতান্তর্গত পুরুষসূক্তে ঋক, সাম, যজু প্রভৃতির উল্লেখ বেদের অস্তিত্বের প্রমাণ।

বেদ আছে ইহা প্রমাণিত হইলেও বেদের বাক্যরাশি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য নহে কারণ বেদবাক্য সন্দেহ, জ্ঞাতার্থজ্ঞাপকতা ও বাধিতার্থ বা ব্যাঘাত প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্ত নহে। কতকগুলি বেদমন্ত্রের কোনই অর্থ হয় না, যথা

'অম্যক্ সাত ইন্দ্র ঋষ্টিঃ' (ঋ, বে. ১-১৬৯-৩)

'সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরী তু পর্ফরী ফর্ফরিকা' (ঋ. বে. ১০-১০৬-৬)

'আপান্তমন্যুস্তৃপল প্রভর্মা' (ঋ. বে. ১০-৮৯-৫)

ইত্যাদি। এইসকল মন্ত্র উন্মাদব্যক্তির প্রলাপের ন্যায় অর্থহীন শব্দাড়ম্বরমাত্র। এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই,-- নিরুক্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলে এই সকল মন্ত্রের অর্থ বোধগম্য হইবে। যাস্কাচার্য নিরুক্তগ্রন্থে এই সকল মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অতএব যে নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করে নাই এই সকল মন্ত্রের অর্থ সে জানিতে পারে না; মন্ত্রের অর্থ না জানা তাহার নিজের দোষ, বেদের দোষ নহে। যেমন অন্ধব্যক্তি যদি গমনকালে খুঁটিতে আঘাত পায় তাহা অন্ধের দৃষ্টিহীনতার দোষ, খুঁটির নহে। 'নায়ং স্থাণোরপরাধো যদেনম্ অন্ধো ন পশ্যতি।'

কতকগুলি বেদমন্ত্রের সন্দিগ্ধার্থ দোষ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ তাহাদের প্রকৃত অর্থ কি সে বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগে; যথা—'অধস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ' (ঋ. বে. ১০-১২৯-৫) অর্থাৎ তিনি নীচেও ছিলেন, উপরেও ছিলেন। এই জাতীয় মন্ত্রের অর্থে সন্দেহ থাকায় বেদবাক্য অপ্রমাণ। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে উদ্ধৃত মন্ত্রে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। এই মন্ত্রটি ঋগ্‌বেদের সৃষ্টিসূক্ত (১০-১২৯) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জগতের মূলকারণ পরব্রহ্মের অপূর্বসৃজনীশক্তি ও অলৌকিক মহিমার বর্ণনা এই সূক্তে আছে। ক্ষুদ্রশক্তি সসীম মানবের পক্ষে যুগপৎ ঊর্ধ্বে ও নিম্নে অবস্থান সম্ভব নহে কিন্তু যাহার সত্তা সমগ্রবিশ্বে ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত ও অনুস্যূত রহিয়াছে সেই পরম ব্রহ্ম যুগপৎ ঊর্ধ্বে নিম্নে সর্বত্র অবস্থান করিতে পারেন। অতএব সন্দিগ্ধার্থ দোষের অবকাশ নাই।

কতকগুলি বেদমন্ত্রে অচেতন পদার্থের সম্বোধন ও চেতনবৎ ব্যবহার দৃষ্ট হয়; যথা,—ক্ষুরকে লক্ষ্য করিয়া একটি মন্ত্রে বলা হইতেছে, 'স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ' (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১-২-১-১) অর্থাৎ 'হে ক্ষুর তুমি ইহাকে হিংসা

করিও না।' 'শৃণোত গ্রাবাণঃ' (তৈ. স. ১-৩-১৩-১), 'হে প্রস্তরগণ, তোমরা শ্রবণ কর'—ইত্যাদি। অচেতন পদার্থকে কেহ এইভাবে চেতনবৎ সম্বোধন করে না ; ইহা অনুভববিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব এই সকল বেদমন্ত্রের অর্থ অনুভব দ্বারা বাধিত, ব্যাহত। বাধিতার্থদোষ আসিয়া পড়ে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই, এই সকল মন্ত্রে অচেতন পদার্থকে সম্বোধন করা হয় নাই ; অচেতন পদার্থের অভিমানী বা নিয়ন্তা দেবতা-গণকে (Presiding deities) সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রতি পদার্থে পরব্রহ্মের চৈতন্য বা চিৎসত্তা অনুস্যূত এবং সেই চৈতন্য আপাতদৃষ্ট জড়-পদার্থের অভিমানী দেবতা। এই তত্ত্বটি ভগবান বেদব্যাস স্বরচিত ব্রহ্মসূত্রে 'অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্' সূত্রে (ব্রহ্মসূত্র ২-১-৫) আলোচনা করিয়াছেন। মন্ত্রে যে সকল স্থলে অচেতনের চেতনবৎ সম্বোধন বা ব্যবহার শ্রুত হয় সেই সেই স্থলে প্রকৃতপক্ষে তদভিমানী বা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার, চৈতন্যসত্তার সম্বোধন বা আমন্ত্রণ বোধ্য, অতএব এক্ষেত্রে বাধিতার্থ দোষের অবকাশ নাই। জগতের কোনও পদার্থ সম্পূর্ণ জড় হইতে পারে না কারণ চিৎসত্তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়া পরমপুরুষ পরমাত্মা তন্মধ্যে প্রবেশ করেন ; 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। তাঁহার রূপই বিশ্বের প্রতিটি রূপ ধারণ করিয়াছে,—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' (ঋ. বে. ৪-৭-৩৩ ৩)। অতএব দৃশ্যপ্রপঞ্চের প্রতি পদার্থ জড় ও চেতনের সমষ্টি স্বরূপ,—'চিৎ-অচিৎ-গ্রন্থিরূপঃ'। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যাহা জড় তদ্রূপ পদার্থকে যদি কেহ সম্বোধন করে তখন বুঝিতে হইবে যে সেই পদার্থে নিহিত চিৎসত্তাকে সম্বোধন করা হইতেছে ; অতএব কোনপ্রকার বাধার বা ব্যাঘাতের আশঙ্কা নাই।

পূর্বপক্ষী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় নূতন আপত্তি তুলিতেছেন। কতকগুলি বেদমন্ত্রে পরস্পরবিরোধ দৃষ্ট হয় ; যেমন একটি মন্ত্র,—'এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে' (তৈত্তিরীসংহিতা ১-৮-১-১), অর্থাৎ রুদ্র একজনই, দ্বিতীয় রুদ্র নাই। কিন্তু অন্য একটি মন্ত্রে আবার বলিতেছেন,—'সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্' (তৈ. স. ৪-৫-১১-৫),—'পৃথিবীতে যে সকল সহস্র সহস্র রুদ্র আছেন।' এই দুইটি মন্ত্রের অর্থ পরস্পরবিরুদ্ধ অতএব বিপরীতার্থ বা ব্যাঘাত দোষ অপরিহার্য। কেহ যদি নিজ মুখে বলে,—'আমি যাবজ্জীবন মৌনী আছি',—তাহার সেই উক্তিই যেমন মৌন-ব্রতের বিরোধী ও বিপরীত, এক্ষেত্রেও তদ্রূপ। এতদুত্তরে আমরা বলিতে পারি মানুষের পক্ষে এক এবং বহু একসঙ্গে হওয়া অসম্ভব কিন্তু অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন

একই রুদ্রদেবতার পক্ষে নিজবিভূতিবলে সহস্রমূর্তিধারণ সম্ভব ও অবিরুদ্ধ অতএব উক্ত ব্যাঘাত-দোষনির্মুক্ত ঐ বেদবাক্য।

প্রমাণের লক্ষণ আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে জানা বা জ্ঞাত-বিষয়কে পুনরায় জ্ঞাপন করিলে তাহা প্রমাণ হইবে না। অর্থাৎ যাহা অনধিগত, অজ্ঞাত তাহা জ্ঞাপন করিলে তবে সেই বাক্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য। প্রমাণের এই অনধিগতার্থ বা অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপনরূপ লক্ষণ বেদে প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—কতিপয় বৈদমন্ত্রে কোনও নূতন তথ্য নাই ; যাহা আমরা বেদ অধ্যয়ন না করিয়া লৌকিক প্রমাণ বা অনুভবের সাহায্যে জানিতে পারি তাহারই মাত্র পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে ; তজ্জাতীয় বেদবাক্য জ্ঞাতার্থ-জ্ঞাপক হওয়ায়, যাহা আমরা জানি তাহাই জ্ঞাপন করায় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যেমন যজমানের মস্তক-মুণ্ডনের সময় এই মন্ত্রটি পাঠ করা হয়,—'আপ উন্দন্তু'—'হে জল (চুল) ভিজাইয়া দাও'। বিবাহে বরবধূর মস্তকে টোপর পরাইবার সময় এই মন্ত্রটি পাঠ করা হয়,—'শুভিকে শির আরোহ শোভয়ন্তী মুখং মম', অর্থাৎ 'হে টোপর তুমি আমার মাথায় উঠিয়া আমার মুখের শোভা বৃদ্ধি কর'। জলের চুল ভিজাইবার শক্তি বা টোপরের মস্তকে অবস্থান ও মুখশোভাবর্ধন লোকে সুবিদিত। অতএব জানা বিষয় পুনরায় জ্ঞাপন করায় এ সকল বেদমন্ত্রের প্রামাণ্য নাই। এই আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বা উত্তরপক্ষী বলেন,—ব্যবহারিক জীবনে জলের সিঞ্চনশক্তি বা টোপরের মস্তকে অবস্থানাদি সুবিদিত হইলেও সেই সেই পদার্থের (জল, টোপর প্রভৃতি) অভিমানী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুগ্রহের কথা সুবিদিত নহে। এই সকল মন্ত্রে অনুগ্রহলাভার্থ, আনুকূল্যজন্য জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার, টোপরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সম্বোধন করা হইয়াছে, অতএব জ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বদোষ আসিতেছে না। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুগ্রহরূপে অবিদিত বা অনধিগত অর্থ প্রকাশিত হইতেছে, অতএব এই সকল মন্ত্র প্রমাণ।

উপরের আলোচনায় বেদের প্রামাণ্য সুপ্রতিপন্ন। সনাতনধর্মের মূল বেদ এবং পরম প্রমাণ বেদ। মনু বলিতেছেন,—'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্' অর্থাৎ বেদ সমস্ত ধর্মের মূল। সকল ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিগ্রন্থ, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের উৎস হইতেছে বেদ। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই বেদে নিহিত। পার্থিব বিষয় প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া যায় কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষের অগোচর, অনুমানের অতীত, মানবের সসীমজ্ঞানের পরপারে,

যাহা পার্থিব কোনও প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না তদ্রূপ অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতত্ত্বও বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা পরলোকতত্ত্ব। কারীরিযজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয়, পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিলে পুত্রলাভ হয়, ইত্যাদি বেদবচনের ফল প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয় কারণ ঐ সকল যাগের ফল বৃষ্টি, পুত্রের জন্ম প্রভৃতি প্রত্যক্ষযোগ্য কিন্তু 'স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত,' অশ্বমেধ (অশ্বযজ্ঞ) করিলে যজমানের দেহান্তে স্বর্গলাভ হয়, ইত্যাদি বেদবাক্য অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে জানিবার কোনই উপায় নাই। কেহ অশ্বমেধ করিয়া দেহত্যাগের পর স্বর্গবাস করিয়া পুনরায় ধরাতলে জন্মগ্রহণের পর বলিতে পারে না, 'আমি যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে বাস করিয়াছিলাম'। অতএব এসকল ক্ষেত্রে একমাত্র ঐসকল বেদবাক্যই ঐ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ; অন্য কোনও প্রমাণের সম্ভাবনা নাই। এই জাতীয় বেদের বিধিকে এইজন্য 'অপূর্ববিধি' বলে কারণ বেদব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণের সাহায্যে তাহা জানিতে পারা যায় না।

বেদ কোনও মনুষ্যের চেষ্টাকৃত বা রচিত নহে। নিদ্রিত পুরুষের শরীর ইচ্ছাকৃত চেষ্টা ব্যতিরেকে যেমন স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে (voluntarily) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য চলিতে থাকে তদ্রূপ মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইতে স্বতঃই বেদচতুষ্টয় নির্গত হইয়াছিল; তজ্জন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা হইয়া থাকে; কোনও পুরুষের চেষ্টায় তাহা রচিত হয় নাই। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এই অপৌরুষেয়ত্বই বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের আসন দান করিয়াছে।

ন্যায়দর্শন, সাংখ্য, পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শব্দ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছে এবং শব্দপ্রমাণের মাধ্যমে বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছে। লৌকিক ও বৈদিকভেদে শব্দ দুই প্রকার। লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য অন্য প্রমাণাদির সাহায্যে সিদ্ধ হয় কিন্তু বৈদিকবাক্য বা শব্দ স্বতঃপ্রমাণ ও অমোঘ; তাহা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সাংখ্যদর্শনে শব্দপ্রমাণ বলিতে কেবল শ্রুতি বা বেদই বুঝায়। লৌকিক বাক্যকে সাংখ্যদর্শন শব্দপ্রমাণমধ্যে গণ্য করে নাই কারণ লৌকিক বাক্য অমোঘ নহে এবং তাহার প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর করে। এইজন্য লৌকিক বাক্য বা শব্দ প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত; তাহা স্বতন্ত্রপ্রমাণ নহে। কেবলমাত্র শ্রুতিই বেদই শব্দপ্রমাণরূপে গ্রাহ্য। সাংখ্যমতে বেদ শুধু যে প্রমাণ তাহা নহে, তাহা স্বতঃপ্রমাণ। 'নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যম্' (সাংখ্যসূত্র ৫—৫১)।

বেদ নিজশক্তিতে অভিব্যক্ত, অন্য কোনও শক্তির অপেক্ষা রাখে না, অন্য কোনও প্রমাণের উপর তাহার প্রামাণ্য নির্ভর করে না; তজ্জন্যই বেদ স্বতঃপ্রমাণ, স্বয়ংপ্রমাণ।

বৈশেষিকদর্শনে ঋষি কণাদ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—বেদ ঈশ্বরের বচন, অতএব তাহা অভ্রান্ত, অমোঘ, তজ্জন্যই তাহা প্রমাণ। 'তদ্‌বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্'। 'আম্নায়' শব্দের অর্থ বেদ।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত সকল আস্তিক দর্শনই, এবং স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র বেদের প্রামাণ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব বিচার

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বেদের নিত্যত্ব এই দুইটি বিচার পরস্পরসম্বদ্ধ। যাহা কোনও পুরুষের রচিত তাহা পৌরুষেয় এবং যাহা পৌরুষেয় তাহা অনিত্য কারণ তাহার আদি আছে। জন্যপদার্থ বা রচিত বস্তু কখনও অনাদি হইতে পারে না, অপৌরুষেয়ও হইতে পারে না; তাহা অনিত্য ও পৌরুষেয়।

নৈয়ায়িকগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন কিন্তু অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বেদ পরমপুরুষের রচিত, পরমেশ্বর হইতেছেন পরম পুরুষ তজ্জন্য বেদ পৌরুষেয় ও কালিদাসাদিরচিত গ্রন্থের ন্যায় অনিত্য।

মীমাংসাদর্শন ও বেদান্তদর্শন বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। মানুষ অপূর্ণ এবং তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ; তজ্জন্য তাহার রচনায় বা বাক্যে, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা এই চারিটি দোষ দৃষ্ট হয়। বেদবাক্যে এই চারিটি দোষ দৃষ্ট হয় না, অতএব বেদ মানবের রচিত হইতে পারে না। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পূর্ণ পরমেশ্বরের নিকট হইতেই তাদৃশ প্রজ্ঞার প্রকাশ সম্ভব। পরমেশ্বরও বেদের রচয়িতা নহেন। সূর্য হইতে সূর্যের আলোকের ন্যায় বেদ পরমেশ্বর হইতে স্বয়ং প্রকাশিত। বৃহদারণ্যকো-পনিষদের উক্তি, 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতং যদেতৎ ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ'। নিঃশ্বাস যেমন স্বাভাবিক কর্ম, চেষ্টাকৃত নহে, তদ্রূপ বেদ

পরমেশ্বরের চেষ্টাকৃত বা বুদ্ধিকল্পিত নহে। পরমেশ্বরের প্রজ্ঞানই বেদ। জ্ঞাতা ও জ্ঞান অভিন্ন এক্ষেত্রে। প্রতিকল্পে পরমেশ্বর বেদ স্মরণ করেন। ব্রহ্মাও বেদের কর্তা নহেন, স্মর্তা বা স্মরণকর্তামাত্র। এ বিষয়ে পরাশর-সংহিতার প্রবচন,—'ন কশ্চিৎ বেদকর্তাস্তি বেদস্মর্তা চতুর্মুখঃ' (১—২০), অর্থাৎ বেদের কর্তা কেহ নাই, চতুর্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণকর্তা মাত্র।

'ব্রহ্মাদ্যাঃ ঋষয়ঃ সর্বে স্মারকা ন তু কারকাঃ'। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিগণ অবধি সকলেই বেদের স্মরণকর্তা বা ধারকমাত্র, বেদের কর্তা বা রচয়িতা নহেন। পরমেশ্বর প্রতিকল্পে নিত্য বিদ্যমান বেদ ব্রহ্মাকে দান করেন ;—

'যো ব্রহ্মানং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ'। বেদ নিত্য বর্তমান, প্রতিকল্পে ব্রহ্মা তাহার পুনরাবৃত্তি করেন মাত্র। যুগান্তে প্রলয়কালে বেদ পরব্রহ্মে অভিন্নরূপে অবস্থান করে এবং কল্পারম্ভে বা পুনঃসৃষ্টিপ্রারম্ভে ঋষিগণ তপস্যাদ্বারা বেদ লাভ করেন। এই তত্ত্বটি নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

'যুগান্তে অন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা॥'

এইজন্যই 'ঋষি' শব্দের একটি অর্থ যাস্ক নিরুক্তগ্রন্থে মন্ত্রদ্রষ্টা করিয়াছেন, মন্ত্রকর্তা বলেন নাই। ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে যাস্ক বলিতেছেন,—'অজান্ হ বৈ পৃশ্নীং-স্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু অভ্যানর্ষৎ তদৃষয়োঽভবন্'। তপস্যারত জন্মরহিত অজ ঋষিগণের নিকট স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ গমন করিয়াছিলেন (ঋষ্ ধাতুর একটি অর্থ গমন করা); এইজন্যই ঋষিগণকে ঋষি বলা হয়। এই নিরুক্তবাক্যে বেদকে স্বয়ম্ভু উৎপত্তিরহিত অর্থাৎ অপৌরুষেয় বলা হইয়াছে।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যরচনার প্রারম্ভে তিনি মহেশ্বরকে নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রণতি জানাইয়াছেন,—

'যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥' অর্থাৎ

যে চারিবেদ হইতে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে সেই বেদ চতুষ্টয় যাঁহার নিঃশ্বাসস্বরূপ এবং যিনি সর্ববিদ্যার আধার সেই মহেশ্বরকে আমি

বন্দনা করি। বেদকে মহেশ্বরের নিঃশ্বাসরূপে বর্ণনা করিয়া সায়ণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পরমেশ্বর বেদের আধার কিন্তু রচয়িতা নহেন। নিত্যসিদ্ধ যে বেদ তাহা তিনি প্রতিকল্পে স্মরণ করেন। তাঁহাকে বেদের রচনাকর্তা বলিলে দুটি দোষ হয়। প্রথমতঃ বেদ অনিত্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বরের সর্বজ্ঞত্বের হানি ঘটে। কি করিয়া তাঁহার সর্বজ্ঞতার হানি ঘটে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমরা যখন কোনও কাব্য রচনা করি বা কোনও শ্লোক যখন মনে প্রথম সৃষ্টি হয়, সেই সময়ের পূর্বে সেই কাব্য বা সেই শ্লোক আমাদের অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ ও ত্রিকাল-দর্শী সুতরাং কোনও কালে তাঁহার নিকট কোনও বিষয় অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। তিনি কোন এক বিশেষ কালে বেদ রচনা করিয়াছিলেন বলিলে সেই কালের পূর্বে বেদ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল এই আপত্তি আসিয়া পড়ে। তিনি সর্বজ্ঞ বলিয়া কোনও কালে বেদ তাঁহার অজ্ঞাত থাকিতে পারে না; অতএব বেদ নিত্য এবং বেদ তাঁহার রচিত নহে। বেদ নিত্য একরূপ; কল্পভেদে তাহার রূপভেদ হয় না। প্রতিকল্পে পূর্ব পূর্ব কল্পের ঠিক অনুরূপ বেদ পরমেশ স্মরণ করেন।

যাহা পুরুষের রচিত, রচনার পূর্বে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। প্রথম রচনায় ও প্রথম উচ্চারণে সেই কাব্য বা শ্লোক সম্পূর্ণ নূতন; তাহার সজাতীয় বা অবিকলরূপ তৎপূর্বে থাকে না, থাকিতে পারে না;—ইহা পৌরুষেয় রচনার ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। প্রতিকল্পে বেদের স্মরণ বলা হইয়াছে, প্রথম উচ্চারণ বলা হয় নাই কারণ তাহা পূর্বকল্পের বেদের সজাতীয় উচ্চারণ। এইরূপ অনাদি অনন্ত বেদের প্রবাহ চলিতেছে; তজ্জন্য বেদ পৌরুষেয় হইতে পারে না, তাহা অপৌরুষেয়। পৌরুষেয় রচনার আদি আছে, আরম্ভ আছে,—অপৌরুষেয় বেদের আদি নাই, অতএব অন্তও নাই, তাহা অনাদি অনন্ত নিত্যবর্তমান। ঈশ্বরের সহিত বেদের সম্বন্ধও অনাদি অনন্ত।

পূর্বমীমাংসাদর্শনে বেদের নিত্যতা সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু মীমাংসকগণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে বেদের উৎস বলেন নাই। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মকে বেদের উৎস ও আধার বলা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের ব্রহ্মসূত্রের 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় সূত্রে ব্রহ্ম বেদচতুষ্টয়ের যোনি অর্থাৎ কারণরূপে কীর্তিত হইয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিতেছেন,—'ন হীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্বজ্ঞাৎ অন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি'—অর্থাৎ 'এইরূপ সকল বিদ্যার আধার অখিল ধর্মের মূল

সর্বজ্ঞ বেদের ন্যায় শাস্ত্রের উদ্ভবস্থল সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কেহ হইতে পারে না।' শুক্ল যজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মাই ত্রয়ী বিদ্যা বা বেদবিদ্যা প্রকাশ করেন,—'ব্রহ্ম এব প্রথমমসৃজত ত্রয়ীমেব বিদ্যাম্' (৮-১-১-৪)। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও ব্রহ্মাকে বেদের উৎস বলা হইয়াছে; 'তমনু ত্রয়ো বেদা অসৃজন্ত' (২-৩-১০-১)। বৈশেষিকদর্শন বেদকে ঈশ্বরের বচন বলিয়াছে এবং তজ্জন্যই তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছে।

বেদান্ত ও পূর্বমীমাংসা উভয় দর্শনেই বেদের প্রামাণ্য ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে কিন্তু বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে উভয় দর্শনের প্রস্থানভেদ দৃষ্ট হয়। পূর্বমীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ন্যায় দর্শন শব্দকে অনিত্য বলিয়াছে কিন্তু জৈমিনি ন্যায়দর্শনের যুক্তিরাজি খণ্ডন করিয়া শব্দের নিত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন; শব্দের নিত্যতা স্থাপিত হইলে বেদের নিত্যতাও প্রতিপন্ন হইল। বেদান্ত দর্শনের মতে নিত্যতা দুই প্রকারের হইতে পারে, একটি হইল কূটস্থনিত্যতা, অপরটি প্রবাহনিত্যতা। কূটস্থ অর্থাৎ সর্বদা একরূপ নির্বিকার। বেদান্তদর্শনে একমাত্র পরব্রহ্মের কূটস্থনিত্যতা ও পারমার্থিক সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মভিন্ন সকল পদার্থই অনিত্য, ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। যাহার আবির্ভাব তিরোভাব আছে, প্রতিকল্পে যাহা অভিব্যক্ত হয় ও প্রতিপ্রলয়কালে যাহার সাময়িক তিরোভাব ঘটে তাহাকে প্রবাহনিত্য বলা হয়; তাদৃশ পদার্থের কূটস্থনিত্যতা নাই, প্রবাহনিত্যতা আছে কারণ প্রতিকল্পে তাহাদের সৃষ্টি হয় ও প্রলয়কালে তাহারা বিলীন হইয়া থাকে। বেদও তদ্রূপ প্রলয়কালে পরমেশ্বরে লীন হইয়া থাকে ও প্রতিকল্পের আরম্ভে তিনি বেদ স্মরণ করেন, অভিব্যক্ত করেন। এইজন্য বেদের কূটস্থ-নিত্যতা বেদান্ত স্বীকার করে না, প্রবাহনিত্যতা স্বীকার করে। বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে এই বেদান্তসিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রের অতএব চ নিত্যত্বম্ সূত্রে (ব্রহ্মসূত্র, ১-৩-২৯) প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদ বিষয়ক 'বাচা বিরূপনিত্যয়া' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে এবং 'অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে বেদের প্রবাহনিত্যতা ঘোষিত হইয়াছে। পূর্বমীমাংসাদর্শনের মতে জগৎ সর্বদাই একরূপ তজ্জন্য প্রবাহনিত্যতার প্রসঙ্গই উঠে না। বেদের কূটস্থ বা পারমার্থিক নিত্যতা এই দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শন বেদের নিত্যতা স্বীকার করে না কিন্তু অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করে। বেদ ঋষিগণকর্তৃক দৃষ্ট, উপলব্ধ,—কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচনা নহে। কোনও পুরুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর বেদের প্রামাণ্য বা আবির্ভাব

নির্ভর করে না ; তজ্জন্য বেদ অপৌরুষেয়। বেদের কর্তারূপ কোনও পুরুষ নাই। 'ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্য অভাবাৎ' (সাংখ্য সূত্র ৫-৪৬)। যাহা দেখিলে ও পড়িলে কাহারও রচিত বলিয়া উপলব্ধি জন্মে তাহাকে পৌরুষেয় বলে। বেদকে যে শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থে স্থল বিশেষে নিত্য বলা হইয়াছে সাংখ্যদর্শন মতে তাহার অর্থ হইল গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেদের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। বৈদিক শব্দরাশি অবিকল একরূপে অপরিবর্তিতরূপে গুরুশিষ্যসম্প্রদায়পরম্পরায় উচ্চারিত ও বিধৃত হইয়া আসিতেছে। পরমেশ্বরের ন্যায় বা সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় অনাদিনিত্যতা বা কূটস্থনিত্যতা বেদের নাই কারণ প্রতি মন্ত্রের দ্রষ্টা এক একজন ঋষি ; অতএব সেই ঋষির পূর্বে সেই মন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুশিষ্য-পরম্পরায় বেদের অধ্যয়ন অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিতেছে ; এই প্রবাহের অর্থাৎ পূর্ব পূর্বকল্পের বেদের উচ্চারণ অনুযায়ী সজাতীয় উচ্চারণপ্রবাহের উচ্ছেদ কখনও কোনও কালে ঘটিতেছে না, তজ্জন্যই বেদের সজাতীয় উচ্চারণপ্রবাহের অনুচ্ছেদরূপ নিত্যতা অর্থাৎ প্রবাহনিত্যতা সাংখ্যদর্শন স্বীকার করে, অনাদি অনন্ত-রূপ নিত্যতা স্বীকার করে না।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পাণিনি-রচিত 'তেন প্রোক্তম্' (৪-৩-১০১) সূত্রের ভাষ্যপ্রসঙ্গে পতঞ্জলি বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদের নিত্যতা বিচারকালে বেদের শব্দ ও অর্থ উভয়েরই বিচার করিতে হইবে। তাঁহার মতে বেদের অর্থ নিত্য কিন্তু শব্দরাশি বা বর্ণানুপূর্বী অনিত্য। 'অর্থো নিত্যঃ, যাত্বু অসৌ বর্ণানুপূর্বী সা অনিত্যা।' প্রতি মহাপ্রলয়ে বেদের বর্ণানুপূর্বীর বা অক্ষরপরম্পরার বিনাশ হয়। প্রতিকল্পে ঋষিগণ পুনরায় বেদ স্মরণ করেন। বর্ণরাশির বিনাশ বা লোপ হইলেও বেদের অর্থ নিত্য একরূপ থাকে ; অর্থের বিনাশ কদাচ হয় না। বর্ণানুপূর্বীর ভেদ হয় বলিয়াই বেদের নানা শাখার উৎপত্তি হইয়াছে ; ঋগ্‌বেদের এইরূপ একবিংশতি ভেদ, সামবেদের এক সহস্র ভেদ (সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ) হইয়াছে। বেদের শাখার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইহা বিশদ্ ও বিস্তৃতরূপে দেখাইয়াছি। অতএব দেখা গেল পতঞ্জলির মতে বেদ নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে। অর্থের দিক দিয়া নিত্য, বর্ণানুপূর্বীর দিক দিয়া অনিত্য অর্থাৎ অংশতঃ নিত্য, অংশতঃ অনিত্য।

ন্যায়দর্শনে বেদের বা শব্দের নিত্যতা স্বীকৃত হয় নাই। বেদের অনাদি

অনন্ত-কূটস্থনিত্যতা ন্যায়দর্শন স্বীকার করে নাই কিন্তু প্রবাহনিত্যতা স্বীকার করিয়াছে। 'মন্ত্রায়ুর্বেদবচ্চ তৎপ্রামাণ্যম্ আপ্তপ্রামাণ্যাৎ' ন্যায়দর্শনের এই সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলিতেছেন,—'মন্বন্তরযুগান্তরেষু চাতীতানাগতেষু সম্প্রদায়াভ্যাস-প্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বম্'; অর্থাৎ অতীত ও অনাগত মন্বন্তরে, প্রলয়ে ও কল্পে বেদের যে সম্প্রদায়ক্রমে অভ্যাস ও প্রয়োগ অবিচ্ছিন্নধারায় চলিতেছে তাহাই বেদের নিত্যতা। এই নিত্যতা প্রবাহ-নিত্যতা।

ভাষ্যকার সায়ণাচার্যও বেদের অনাদিঅনন্ত একরূপ নিত্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন,—বেদের নিত্যতা এককল্পকালস্থায়ী। প্রতিকল্পে বেদ অভিব্যক্ত হয় ও প্রলয়কালে পরমেশ্বরে বিলীন হয়,—অর্থাৎ উৎসে প্রত্যাবর্তন করে। প্রবাহ-নিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই বেদকে নিত্য বলা যাইতে পারে—ইহাই চতুর্বেদভাষ্যকার সায়ণের মত।

অতএব দেখা গেল পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য এই তিন দর্শনের মতে বেদ অপৌরুষেয়, ন্যায়দর্শনের মতে পৌরুষেয়। বেদের কূটস্থনিত্যতা এক-মাত্র পূর্বমীমাংসা স্বীকার করিয়াছে। বেদান্ত, সাংখ্য ও ন্যায়দর্শনে বেদের কূটস্থনিত্যতা স্বীকৃত হয় নাই; এই তিনদর্শনের মতে বেদ প্রবাহরূপে নিত্য। ব্যাকরণদর্শনে পতঞ্জলি বেদের অর্থকে নিত্য বলিয়াছেন কিন্তু শব্দরাশিকে বা বর্ণানুপূর্বীকে অনিত্য বলিয়াছেন। স্মৃতিগ্রন্থে ও পুরাণাদিশাস্ত্রে বেদের নিত্যতা ঘোষিত হইয়াছে। বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি দর্শন ব্রহ্ম বা পরমপুরুষকে বেদের কারণ, বেদের উৎস বলিয়াছে এবং তজ্জন্যই বেদের প্রামাণ্য ও প্রবাহনিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু পূর্বমীমাংসা পরমেশ্বরকে বেদের কারণ বা উৎসরূপে নির্দেশ করে নাই। এই দর্শনের মতে শব্দ নিত্য। বিবিধ যুক্তিজালবিস্তারে জৈমিনি ন্যায় দর্শনের শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদক যুক্তিরাশি খণ্ডন করিয়া শব্দের নিত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদের নিত্যতা শব্দের নিত্যতাজনিত; শব্দ নিত্য বলিয়াই বেদ নিত্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বেদের কাল

যাঁহারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা কোন একটি বিশেষ যুগে বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল একথা স্বীকার করেন না। যাহা নিত্য তাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই, সুতরাং উৎপত্তিকালের প্রশ্নই উঠে না। যাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহারা বলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন এক বিশেষ কালে বেদ রচিত হইয়াছিল; তজ্জন্য তাঁহারা বেদের কাল বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভূখণ্ডের বহু পণ্ডিত বেদ ঋষিদের রচনা বলিয়া মনে করেন এবং বেদের উৎপত্তির কাল বিচার করিয়া নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদ যে অপৌরুষেয় বা স্বতঃ অভিব্যক্ত (Revealed) নহে, তাহা যে ঋষিদের রচনা, তাঁহাদের এই অভিমত প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বেদ হইতেই,—বেদমন্ত্রের রচনা বা উৎপত্তিসূচক মন্ত্র উদ্ধার করেন। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব আলোচনাকালে আমরা কতকগুলি শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছি যাহাতে বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে। আবার কতকগুলি শ্রুতিবচনে বেদমন্ত্রের উৎপত্তির কথাও স্পষ্ট বলা আছে। ঋগ্‌বেদের (সংহিতার) কয়েকটি মন্ত্র উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধার করা যাইতে পারে; যথা,—

'গোতমো ইন্দ্রনব্যমতক্ষৎ' (১-৬২-১৩); অর্থাৎ 'রথকার যেমন রথের বিভিন্ন অংশ নির্মাণ করিয়া সংযুক্ত করেন তদ্রূপ গোতম ঋষি এই নতুন মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।' 'ব্রহ্মাণি সসৃজে বসিষ্ঠঃ' (৭-১৮-৮), 'বসিষ্ঠ ঋষি মন্ত্ররাজি সৃষ্টি করিয়াছেন।' 'ব্রহ্মাণি জনয়ন্তো বিপ্রাঃ' (৭-২২-৯) অর্থাৎ বিপ্রগণ মন্ত্র সকলের জন্ম দিয়াছেন। ঋক্ সংহিতার প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে (১০-৯০) বিরাট্ পুরুষের যজ্ঞ হইতে সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বেদের উৎপত্তিও কথিত হইয়াছে;—

'তস্মাদ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥'

অর্থাৎ 'সেই (আদি) যজ্ঞ হইতে ঋক্ সকল, সামরাশি, ছন্দসকল ও যজুঃ-মন্ত্রসকল উৎপন্ন হইয়াছিল।' এই সকল উদ্ধৃত মন্ত্র ব্যতীত বহু বেদমন্ত্রে বলা আছে অমুক অমুক ঋষির রচিত সেই সেই মন্ত্রসকল। যাঁহারা বেদকে পৌরুষেয় ও উৎপত্তিশীল মনে করেন তাঁহারা উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবচনগুলির

উল্লেখ করিয়া স্বকীয়মত সমর্থন করেন এবং বেদের কাল বিচার করিয়াছেন। অবশ্য, পণ্ডিতগণ বেদরচনার কাল সম্বন্ধে একমত নহেন; এক একজন এক এক মত পোষণ করেন। কেহ সুপ্রাচীনকাল, কেহ অদূরবর্তীকাল নির্ণয় করিয়াছেন; একদল আবার মধ্যবর্তী পথ ধরিয়াছেন। ভারতবর্ষে স্বনামধন্য বালগঙ্গাধর তিলক, নারায়ণরাও পাভ্‌গী, বেটকার, বৈদ্য (C. V. Vaidya), অবিনাশচন্দ্র দাস প্রভৃতি, এবং পাশ্চাত্ত্যে মহামতি মাক্‌স্‌মূলার, মনীষী য়াকোবি (Jacobi), বেবর (Weber) হুইট্‌নি, ম্যাক্‌ডোনেল, ভিন্টারনিৎস, গ্রাসমান, বূলার, ওল্‌ডেন্‌বারগ্‌ প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলী বেদের রচনাকাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ (ছয় হাজার) বৎসর পর্যন্ত উর্ধ্বে গিয়াছেন, কেহ কেহ আবার খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ (এক হাজার) অবধি নিম্নতম সীমারেখা টানিয়াছেন।

খ্রীষ্টধর্মের বাইবেল, ইসলামধর্মের কুরাণ্‌ বা ইহুদীধর্মের 'তালমুদ' (Talmud) বলিতে একখানি মাত্র ধর্মগ্রন্থ বুঝায় এবং তাহার কাল নির্ণয় করা সহজ ও সম্ভব; কিন্তু সনাতন ধর্মের 'বেদ' বলিতে একটি মাত্র গ্রন্থ নহে, একটি গ্রন্থাগার বুঝায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ বলিতে সংহিতাচতুষ্টয়, প্রতিবেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থরাজি, আরণ্যকসমূহ ও উপনিষদ্‌রাশি প্রতিবোধ্য সুতরাং বেদের একটি বিশিষ্ট কাল (One particular point of time) হইতে পারে না। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের উৎপত্তির ভিন্ন ভিন্ন কাল হইবে। এইজন্যই সমগ্র বেদের কাল নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার, এবং এইজন্যই মাক্‌স্‌মূলার বলিয়াছেন, 'Whether the Vedic hymns were composed in 1000, or 1500, or 2000, or 3000 B. C. no power on earth will ever determine' (Griffith lectures on physical Religion 1889), অর্থাৎ 'বেদমন্ত্ররাজি খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অথবা ১৫০০ অথবা ২০০০ বা ৩০০০ বৎসর কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা পার্থিব কোনও শক্তিই কখনও নির্ণয় করিতে পারিবে না।' এই একই কারণে প্রখ্যাত জার্মাণ দেশীয় পণ্ডিত ভিন্টারনিৎস্‌ বলিয়াছেন,—'It is foolish to ascertain a defiinite date for both the Samhita period and the Brahmana period of the Veda (History of Indian Literature, Vol I.). 'বেদের সংহিতাখণ্ড ও ব্রাহ্মণখণ্ডের জন্য একই কাল নির্ণয় করিলে তাহা মূর্খামির পরিচায়ক হইবে।' বেদের কাল কেহ জ্যোতিষ্‌তত্ত্ব ধরিয়া, কেহ ভাষাতত্ত্ব ধরিয়া, কেহ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব, কেহ ভূতত্ত্ব, কেহ

বা আবার আভ্যন্তর প্রমাণ ধরিয়া নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বালগঙ্গাধর তিলক, কেট্‌কার, বুলার (Buhler) প্রভৃতি জ্যোতিষের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছেন। তিলক তাঁহার 'Arctic Home' ও 'Orion' নামে বিশ্রুত গ্রন্থ দুইটিতে বেদে জ্যোতিষের যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, কৃত্তিকা, মৃগশিরা প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থান বিচার করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে বেদের প্রাচীন সংহিতার কাল ৬০০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৮০০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ; এবং পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির কাল ৪০০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত। পণ্ডিত কামেশ্বর আয়ারের মতে ২৩০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ২০০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থরাজির রচনাকাল।

তিলক এবং য়াকোবি (Jacobi) উভয় মনীষী পরস্পর আলোচনা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে সংহিতার ও ব্রাহ্মণের জ্যোতিষসংক্রান্ত তথ্যের গবেষণা করিয়াছেন এবং আশ্চর্যরূপে দুইজনেই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন সংহিতার কালে বসন্তকালীন বিষুবসংক্রান্তির (Vernal Equinox) মৃগশিরা (Orion) নক্ষত্রে হইয়াছিল এবং গণনা করিলে তাহার কাল ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব পাওয়া যায় ; অতএব সংহিতার রচনা আরও পূর্বে হইয়াছিল। আবার ব্রাহ্মণগ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণে পাওয়া যায়—বসন্তকালীন বিষুবসংক্রান্তি কৃত্তিকানক্ষত্রে (Pleaids) হইয়াছিল ; জ্যোতির্গণনা মতে ইহার কাল ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ এইজন্য ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ রচনার কাল তিলক ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ১৪০০ খ্রীঃ পূঃ ধরিয়াছেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ বলেন প্রাচীন উপনিষৎসমূহ ১৪০০ খ্রীঃ পূঃ মধ্যেই রচিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থের জ্যোতিষতথ্য বলিতে তিলক ও য়াকোবি (Jacobi) প্রধানতঃ শতপথ ব্রাহ্মণের নিম্নোদ্ধৃত বচনটি ধরিয়াছেন,—

'এতা হ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে' (২-১-২-৩) ;—'এতা' অর্থাৎ কৃত্তিকানক্ষত্র কখনও পূর্বদিক হইতে স্খলিত হয় না ; অর্থাৎ বসন্তকালীন বিষুবসংক্রান্তি কৃত্তিকানক্ষত্রে সংঘটিত হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেট্‌কার (V. B. Ketkar) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি বচনকে সূত্ররূপে ধরিয়া (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩-১-৫) গবেষণা করিয়াছেন। তথায় বলা আছে—'তিষ্য (পুনর্বসু) নক্ষত্রকে প্রায় আচ্ছাদন করার সময় (গ্রহণের সময়) বৃহস্পতিগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কেটকার গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ৪৬৫০ খ্রীষ্টপূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। অতএব সংহিতার রচনা ইহার পূর্ববর্তী। প্রসঙ্গক্রমে

জানাইতেছি এই মহারাষ্ট্রীপণ্ডিত কেট্‌কারের জার্মাণদেশীয়া পত্নী শ্রীযুক্তা কেট্‌কারই সর্বপ্রথম ভিণ্টারনিৎসের (Winternitz) জার্মাণ ভাষায় বিরচিত 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ইংরাজীতে অনুবাদ করেন ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে।

স্বনামধন্য বেদজ্ঞ মার্কিণদেশীয় পণ্ডিত ব্লুমফিল্‌ড্ ৪৫০০ খ্রীঃ পূঃ বৈদিক-যুগের প্রারম্ভকাল বলিয়া ধরিয়াছেন।

ঋগ্‌বেদের কয়েকটি মন্ত্রে বর্ষাকালে বৎসর আরম্ভের কথা বলা আছে, বিশেষ করিয়া মণ্ডূকসূক্তে (৩-১০৩) এই তত্ত্ব সুপ্রমাণিত। ভাষাতত্ত্ববিদ্ কেহ কেহ বলেন বর্ষাকালে বৎসর আরম্ভ হইত বলিয়া বৎসরের একটি নাম 'বর্ষ' হইয়াছে। কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছেন ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বের আগে এই ঘটনা অর্থাৎ বর্ষাকালে বৎসর আরম্ভ সম্ভব ; অতএব ঋগ্‌বেদের রচনাকাল তাহার পূর্ববর্তী।

ডাঃ বূলার, তিলক ও য়াকোবির সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং সমর্থন করিয়াছেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'Indian Antiquary' (২৪৮ পৃষ্ঠা) পুস্তিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি (বূলার) বলিয়াছেন,—'অধ্যাপক য়াকোবি ও তিলকের সিদ্ধান্ত আমি অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি না। মৃগশিরা নক্ষত্রের যে প্রমাণ তাঁহারা দিয়াছেন আমিও তাহা অতিশয় মূল্যবান বলিয়া মনে করি।'

অধ্যাপক বৈদ্য (C. V. Vaidya) সম্পূর্ণ বৈদিক যুগ ৪৫০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৮০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ধরিয়াছেন। জাপানের কাকাসু ওকাকুরা (Kakasu Okakura) তাঁহার 'The Ideals of the East' গ্রন্থে ৪৫০০ খ্রীঃ পূঃ বৈদিকযুগের সূচনা এবং ৭০০ খ্রীঃ পূঃ বৈদিক যুগের সমাপ্তিকাল ধরিয়াছেন। তাঁহার মতে উপনিষদ্‌রাজি ২০০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৭০০ খ্রীঃ পূঃ কালের মধ্যে রচিত।

ঋগ্‌বেদে যে সকল নদীর নাম আছে তন্মধ্যে সরস্বতী নদীর নাম বহুবার পাওয়া যায়। সরস্বতীকে নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও জননীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ('অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি') বলা হইয়াছে। একটি মন্ত্রে (ঋক্‌সংহিতা ৭-৯৫-২) সরস্বতীর পর্বত হইতে উৎপত্তি ও সমুদ্রে পড়ার কথা স্পষ্ট বলা আছে,—

'একা চেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ' ; 'নদীসকলের মধ্যে একমাত্র সরস্বতী ইহা জানেন, সরস্বতী অর্থাৎ যে পুণ্যতোয়া নদী

গিরি হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বহিয়া গিয়াছে।' সরস্বতী নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু সমুদ্র বহুদূরে সরিয়া যাওয়ায় অধুনা সরস্বতী রাজস্থানের বিকানীর অঞ্চলের মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ভূতত্ত্ববিদ কেহ কেহ বলেন পঞ্জাবের পাতিয়াল রাজ্যের নিকট উহা লুপ্ত হইয়াছে। কোন্ সুপ্রাচীন যুগে সরস্বতী সমুদ্র পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল তাহার গবেষণা বিশেষভাবে কেটকার করিয়াছেন। তিনি পুরাতত্ত্বের বিবিধ দিক হইতে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ৭৫০০ খ্রীঃ পূঃ সময়ে সরস্বতী নদী মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়াছে; তৎপূর্বে সমুদ্র পর্যন্ত প্রবহমানা ছিল এবং সমুদ্র রাজস্থানের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেটকারের এই গবেষণামতে ঋগ্বেদের ঐ মন্ত্রের রচনার কাল ৭৫০০ খ্রীঃ পূর্বের পূর্ববর্তী। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ প্রাচ্যবিদ্যানিষ্ণাত প্রাচীনভারতের ইতিহাসের প্রমাণস্বরূপ পণ্ডিতদের অন্যতম অবিনাশ চন্দ্র দাস মহাশয়ও তাঁহার মৌলিকগবেষণাপ্রসূত পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'Rigvedic India' নামক গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮)।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়া মাইনর অন্তর্গত বোঘাৎসকোই (Boghazkoi) নগরে হুগো ভিনক্লার্ (Hugo Winckler) কতকগুলি মৃত্তিকানির্মিত ফলক আবিষ্কার করেন। প্রাচীন হিটীরাজ্যের রাজার সহিত মিতানী দেশের রাজার সন্ধিপত্র এই মৃন্ময়ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। এই সন্ধিপত্র খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। সন্ধির রক্ষকরূপে উভয় দেশের দেবতাগণকে আহ্বান করা হইয়াছে; বাবিলন দেশীয় এবং হিটীদেশীয় বহু দেবতার নাম তো আছেই, অধিকন্তু মিতানীদেশের দেবগণের মধ্যে বৈদিক দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যৌ দেবতাগণের নামও লিখিত আছে। এশিয়া মাইনরে মিতানীদেশে কিরূপে এই বৈদিকদেবতাগণের নাম ও পূজা পৌঁছিয়াছিল এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গবেষকদের ভিন্ন ভিন্ন মত। ঐতিহাসিক মেয়ার (Meyer) মনে করেন আর্য ও ইরাণীয়গণ যখন একত্রে বসবাস করিত তখন এই সকল বৈদিক দেবতা উভয়ধর্মে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে ইরাণ হইতে পশ্চিম ভূখণ্ডে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ওল্ডেন্‌বার্গ মনে করেন বৈদিক আর্যগণের এই সকল দেবতা ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলনিবাসী জনগণের সমসংজ্ঞক এই সকল দেবতারা একটি প্রাচীন সাধারণ উৎস হইতে আসিয়াছে; কিন্তু সেই সাধারণ উৎসটি কোন স্থানে ছিল বা কোন্ যুগের সে সম্বন্ধে ওল্ডেন্‌বার্গ কিছু বলেন নাই। য়াকোবি (Jacobi), স্টাইন্

কোনো (Stein Konow), হিলেব্রানৃড্‌ট্‌, ভিণ্টারনিৎস প্রভৃতি প্রাচ্য-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মিত্র এবং বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্যৌ (অশ্বিযুগল) এই দেবতাদের এভাবে বর্গীকরণ করিয়া উল্লেখ করায় ইহারা ভারতীয় বৈদিক দেবতা। ওল্‌ডেন্‌বার্গের প্রাচীন সাধারণ উৎসনিষ্ঠ মতবাদ তাঁহারা খণ্ডন করিয়াছেন। ভিণ্টারনিৎস দ্বিধাহীন স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,—'I agree with Jacobi, Konow and Hillebrandt in considering these gods to be Indian, Vedic deities and that there is no possible justification for any other view.' 'য়াকোবি, কোনো ও হিলেব্রানৃড্‌টের সঙ্গে আমি একমত যে এই সকল দেবতা ভারতীয় এবং বৈদিক ; এছাড়া অন্য মতের কোনও সম্ভাব্য যুক্তি নেই।' য়াকোবি প্রভৃতির মতে খ্রীষ্ট পূর্ব দুই সহস্র কালে কতিপয় বৈদিক দেবতার প্রভাব ও পূজা পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে বেদের সংহিতা ভাগের সূচনা ছয় হাজার খ্রীষ্টপূর্বে, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের সূচনা তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বে এবং উপনিষদ্‌বাঙ্‌ময়ের সূচনা এক হাজার পাঁচশত খ্রীষ্টপূর্বে হইয়াছিল এবং বৈদিক বাঙ্‌ময়ের শেষ সীমা এক হাজার খ্রীষ্টপূর্ব।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বৈদিকবাঙ্ময়ে পাশ্চাত্ত্যের অবদান

রবার্ট দ্য নোবিলিউস্ (Robert de Nobilius) নামে একজন পাদ্রী সর্বপ্রথম ভারতে বেদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থকাম হয়েন। মাদ্রাজের কতিপয় ধূর্ত পণ্ডিত একটি পুস্তক রচনা করিয়া তাহা 'যজুর্বেদ' নাম দিয়া নোবিলিউস্‌কে দেন ; তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহারা তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছেন।

অতঃপর প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ কোল্‌ব্রুক (Colebrooke) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং তাঁহাকেও এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ একটি অন্য গ্রন্থ দিয়া মিথ্যা করিয়া বেদ বলিয়া চালাইয়া দেয়। তিনিও প্রতারিত ও ভগ্নমনোরথ হয়েন।

অবশেষে কর্ণেল পোলিয়ার (Colonel Polier) নামে জনৈক ইংরাজ

আপ্রাণ চেষ্টা ও অক্লান্ত অধ্যবসায়বলে জয়পুর হইতে চারি বেদের সংহিতার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং ১৭৯৮ খ্রীঃ তাহা লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রেরণ করেন।

১৮৩০ খ্রীঃ অধ্যাপক রোজেন (Rosen) ঋগ্‌বেদের কতিপয় মন্ত্রের অনুবাদ করেন। তিনি লাতীন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ঋগ্‌সংহিতার প্রথম অষ্টক লাতীনভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার প্রাণত্যাগের পর এই লাতীন অনুবাদ ১৮৩৮ খ্রীঃ কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। এই লাতীন অনুবাদ পড়িয়া বহু পাশ্চাত্ত্য বিদ্বান্ বৈদিকবাঙ্ময়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েন। ইহা পড়িয়াই বিশ্রুত প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ Eugene Bournouf ফরাসীদেশে বেদশাস্ত্র অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য Rudolf Roth ১৮৫৬ খ্রীঃ বেদের সাহিত্য ও ইতিহাস শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। রুডোল্‌ফ্‌ রোট্ (জার্মাণ উচ্চারণ) রচিত এই পুস্তিকা পাঠে জার্মাণ পণ্ডিতগণ বেদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েন। উক্ত পুস্তিকার কিয়দংশ মুইর (Muir) রয়াল্ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৪৭-৪৮ খ্রীঃ এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১৮৪৭ খ্রীঃ বিদ্বদ্‌বর লেড্‌লের (Ledley) পরামর্শে ভারতীয় গ্রন্থমালা (Bibliotheka Indica) প্রকাশনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিবলিওটেকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালায় ডঃ রোয়ার্ (Roer) ১৮৪৭ খ্রীঃ ঋক্-সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অষ্টক ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। তিনি যখন শুনিলেন যে মাক্‌স্‌ম্যূলার সায়ণভাষ্যসহ সমগ্র ঋক্‌সংহিতা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং তাহাতে উইলসন্‌কৃত মন্ত্রের ইংরিজী অনুবাদও থাকিবে তখন তিনি তাঁহার আরব্ধ অনুবাদকার্য ছাড়িয়া দেন। আচার্য মাকস্‌ম্যূলারের সায়ণভাষ্যসহ ঋক্‌সংহিতা দেবনাগরী অক্ষরে ১৮৪৯ হইতে ১৮৭৫ খ্রীঃ ছাব্বিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত হয়। ইহার ব্যয়ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহন করেন। ১৮৫৬ হইতে ১৮৫৯ খ্রীঃ চারি বৎসরে তিনি প্রথম মণ্ডল পদপাঠসহ প্রকাশ করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ ম্যূলার সমগ্র ঋক্‌সংহিতা রোমান্ অক্ষরে তৎকৃত শব্দসূচীসহ প্রকাশ করেন।

ম্যূলারের পূর্বে হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ (Horace Hayman Wilson) ঋগ্‌বেদ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; যৌবনে সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং সিপাহীরূপে ১৮০৯ খ্রীঃ ভারতে আগমন করেন। ভারতে আসিয়া সংস্কৃতভাষার প্রতি এবং

বেদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েন। ১৮১০ খ্রীঃ তিনি কলিকাতায় টেঁকশালের (Mint) সহকারী অধ্যক্ষ হইয়া আসেন এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায় লইয়া গভীর অভিনিবেশসহকারে বেদ অধ্যয়ন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র ঋক্‌সংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করেন।

১৮৪৮ খ্রীঃ হইতে ১৮৫১ খ্রীঃ মধ্যে কয়েকজন ফরাসী বিদ্বান্‌ ঋগ্‌বেদের অংশবিশেষের ফরাসী অনুবাদ করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ প্যারিস্‌ নগরীতে লাংলোয়া (Langlois) নামক পণ্ডিত সমগ্র ঋগ্‌বেদের ফরাসী অনুবাদ করেন।

জার্মাণভাষায় যাঁহারা ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করেন তাঁহাদের মধ্যে আল্‌ফ্রেড লুড্‌ভিগ্‌ (Ludwig) এবং হর্‌মান গ্রাস্‌মানের (Hermann Grassmann) নাম সর্বাগ্রগণ্য। ১৮৭৬ খ্রীঃ লুড্‌ভিগ্‌ এবং ১৮৭৬-৭৭ খ্রীঃ গ্রাস্‌মান্‌ সমগ্র ঋক্‌সংহিতার জার্মান অনুবাদ করেন ও প্রকাশ করেন।

ডঃ রোট্‌ (Roth) ১৮৪৮-৫২ খ্রীঃ মধ্যে যাস্কের নিরুক্ত নিজস্ব টিপ্পনী ও মন্তব্যসহ প্রকাশ করেন। খ্যাতনামা বিদ্বান্‌ মার্টিন্‌ হোগ্‌ (Haug) রোমান্‌ অক্ষরে দুইখণ্ডে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মূল অংশ ১৮৬৩ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থেই তাঁহার স্বলিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি সংস্কৃত, হিব্রু, ইংরাজী, জার্মাণ, চীনা প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি হোগের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

১৮৬৪-৬৫ খ্রীঃ সময়ে স্টেনৎস্‌লার্‌ (Stenzler) আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রের জার্মাণ অনুবাদসহ সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ একই সময়ে হর্‌মান্‌ ওল্‌ডেনবর্গ (Oldenberg) জার্মাণ অনুবাদ ও টিপ্পনীসহ শাংখ্যায়নগৃহ্যসূত্র প্রকাশ করেন। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ প্যারিসে রেগ্‌নিয়র্‌ ঋগ্‌বেদীয় শৌনক প্রাতিশাখ্য ফরাসী অনুবাদ ও টীকাসহ প্রকাশ করেন। মাকস্‌ম্যুলার এই গ্রন্থের মূল ও জার্মাণ অনুবাদ প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক ভেবর (Weber) ১৮৬৩ খ্রীঃ পিঙ্গলকৃত ছন্দোসূত্র রোমান্‌ লিপিতে এবং ১৮৬৮ খ্রীঃ পাণিনীয়শিক্ষা প্রকাশ করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ রুডল্‌ফ্‌ মেয়র স্বরচিত ভূমিকাসহ ঋগ্‌বিধান ও বৃহদ্দেবতা প্রকাশ করেন। ১৮৮৯-৯২ খ্রীঃ গ্রিফিথ্‌ (Griffith) ঋক্‌সংহিতার ইংরাজী পদ্যানুবাদ করেন।

এগেলিং (Eggelling) শুক্ল যজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণের ইংরাজী অনুবাদ কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করেন। 'Sacred Books of the East' গ্রন্থমালায় ইহা প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থরাজির মধ্যে শতপথব্রাহ্মণ যেমন গুরুত্বে

গম্ভীর তেমনই আকারে বিশালতম। তাদৃশ সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদ গভীর অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যসাপেক্ষ। এই অনুবাদ এগেলিং মহোদয়ের অক্ষয়কীর্তি।

আচার্য মেকডোনেল্ ও তদীয় যোগ্যশিষ্য কীথ্ (Keith) ঋগ্‌বেদের শব্দসূচী সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। এই শব্দসূচী ঋগ্‌বেদ অধ্যয়নে অতীব প্রয়োজনীয়।

মার্কিনদেশের বিশ্ববিশ্রুত বেদবিদ্বান ব্লুম্‌ফিল্‌ড্ (Bloomfield) রচিত 'Vedic Concordance' ও 'Rgveda Repetitions' একাধারে তীব্র অধ্যবসায়, গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ব্লুম্‌ফিল্‌ড্ এবং গার্বে (Garbe) অথর্ববেদের পিপ্পলাদশাখার সংহিতা ১৯০১ খ্রীঃ জার্মাণদেশে প্রকাশ করেন। ভূর্জপত্রে লিখিত এই সংহিতার পাণ্ডুলিপির ৫৪০টি অবিকল ফটো কপি ছাপাইয়া প্রকাশ করেন ; তজ্জন্য গ্রন্থটি দেখিতে অতি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ব্লুম্‌ফিল্ডের Vedic Concordance বা মন্ত্রমহাসূচী বেদের ১১৬টি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

বেরিডেল্ কীথ্ তৈত্তিরীয় সংহিতার ইংরাজী অনুবাদ দুইখণ্ডে ১৯১৪ খ্রীঃ প্রকাশ করেন।

শ্রোয়েডর (Schroeder) চারিখণ্ডে মৈত্রায়নীসংহিতা এবং চারিখণ্ডে কাঠকসংহিতা প্রকাশ করেন। হুইট্‌নী (Whitney) ১৮৭১-১৮৭২ খ্রীঃ ত্রিরত্নভাষ্যসহ তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য প্রকাশ করেন। ভিন্টারনিৎস আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র সম্পাদনা করেন এবং গার্বে আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র দুইখণ্ডে ১৮৮১-১৯০৩ খ্রীঃ মধ্যে প্রকাশ করেন। কালান্‌ড্ (Caland) বৌধায়নশ্রৌতসূত্র ও বৌধায়নগৃহ্যসূত্র সম্পাদন ও জার্মাণভাষায় অনুবাদ করেন। তৎকর্তৃক কাঠকগৃহ্যসূত্র, বাধূলসূত্র এবং বৈখানসগৃহ্যসূত্রও প্রকাশিত হয়। এই পণ্ডিতপ্রবর শতপথব্রাহ্মণের কাণ্বশাখা ইংরাজীপ্রস্তাবনাসহ ১৯২৬ খ্রীঃ, সামবেদের আর্ষেয়ব্রাহ্মণ ১৮৭৮ খ্রীঃ এবং ১৯২২ খ্রীঃ জৈমিনীয়গৃহ্যসূত্র প্রকাশ করেন। হল্যাণ্ডের উট্রেশ্‌ট্ (Utrecht) হইতে তিনি অথর্ববেদ এবং জার্মানী হইতে বৈতানসূত্র প্রকাশ করেন। বৈদিকবাঙ্ময়ের অধ্যয়ন, প্রকাশন ও প্রচারকল্পে যে সকল মহামতি পাশ্চাত্ত্য মনীষী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসিগণকে কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কালান্‌ড্ অন্যতম।

গ্রাস্‌মান ১৮৭৩-১৮৭৫ খ্রীঃ তিন বৎসর পরিশ্রম করিয়া জার্মাণ ভাষায়

ঋগ্‌বেদের কোষ এবং হিলেব্রান্‌ট্ (Hillebrandt) তিন খণ্ডে বেদের অভিধান (Vedic Dictionary) প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ফরাসীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিত লুই রেনু (Louis Renou) নয়টি খণ্ডে (Bibliographica Vedica) 'বিবলিয়োগ্রাফিকা বেদিকা' ১৯৩১ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। বেদের উপর ১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে যে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল সেই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ তালিকা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ইহা ব্যতীত হিলেব্রান্‌টের জার্মাণভাষায় তিনখণ্ডে প্রকাশিত Vedic Mythology ব্লুম্‌ফিল্‌ডের বেদের ধর্ম (Religion of the Veda, জার্মাণ), কীথবিরচিত ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ধর্ম এবং দর্শন (Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads—হার্বার্ড ওরিয়েন্টাল্ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার বিশ্রুত সংস্কৃতজ্ঞ উইলিয়াম্ ডাইট হুইটনী (Wiliam Dight Whitney) সমগ্র অথর্বসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বৈদিকবাঙ্‌ময়ে ভারতীয়গণের অবদান

বহু ভারতীয় পণ্ডিত বৈদিকবাঙ্‌ময়ের সম্পাদনা, প্রচার ও প্রকাশকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। চারিবেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ইত্যাদি প্রকাশজন্য যে যে বিশিষ্ট ভারতীয় পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে প্রতিবেদের তালিকার আকারে তাহা প্রদর্শিত হইল।

গ্রন্থকার বা সম্পাদকের নাম	গ্রন্থের নাম
ঋগ্‌বেদ :—	
রাজারামশিবরাম শাস্ত্রী—	সায়ণভাষ্য (১৯১০-১২)
দয়ানন্দ সরস্বতী—	ঋগ্‌বেদের হিন্দীভাষ্য পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম অষ্টক পর্যন্ত।
আর্যমুনি—	ঋক্ সংহিতার হিন্দীভাষ্য
সিদ্ধেশ্বরশাস্ত্রী—	মারাঠী অনুবাদমাত্র।
কুন্‌হন্‌রাজা	ইংরাজী অনুবাদসহ মাধবীয় সর্বানুক্রমনী (১৯৪১)
রামগোবিন্দ ত্রিবেদী	সম্পূর্ণসংহিতার হিন্দী অনুবাদ স্বীয় টিপ্পনী সহ আটখণ্ডে প্রকাশিত।

যুগলকিশোর শর্মা—	ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের হিন্দী অনুবাদ ১৯০৩
মঙ্গলদেবশাস্ত্রী—	ঋক্‌প্রাতিশাখ্য সংস্করণ এবং তাহার ইংরাজী অনুবাদ (দুই খণ্ডে প্রকাশিত) ১৯৩৯

পুণা হইতে বৈদিকসংশোধকমণ্ডল সম্পূর্ণ ঋক্‌সংহিতা সম্পাদন করিয়া অপূর্ব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছে। এই মহৎ কার্যসম্পাদনজন্য পুণা নগরপালিকা বৎসরে সতরহাজার (১৭০০০৲) টাকা দান করিতেন। ইহা অতি প্রশংসনীয়।

কৃষ্ণযজুর্বেদ :—

হরদত্তমিশ্র—	আপস্তম্বগৃহ্যসূত্রসম্পাদনা
গোবিন্দস্বামী—	বৌধায়নধর্মসূত্র, সংস্কৃতভাষ্যসহ আটখণ্ডে প্রকাশিত।
গোপীনাথ ও মহাদেব—	হিরণ্যকেশী শ্রৌতসূত্র
ভীমসেন শর্মা—	মানবগৃহ্যসূত্রের হিন্দী অনুবাদ
দেবপাল—	লৌগাক্ষিগৃহ্যসূত্র।

শুক্লযজুর্বেদ :—

দয়ানন্দ সরস্বতী—	হিন্দীভাষ্য
মনমোহন পাঠক—	কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র কর্কভাষ্যসহ

সামবেদ :—

তুলসীরাম শাস্ত্রী—	হিন্দীভাষ্য
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—	তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ (দুইখণ্ডে) (১৮৬৯-৭৪)

লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রবিড় সম্পাদিত সাম প্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্র। সম্প্রতি তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয় সামবেদের সমস্ত ব্রাহ্মণ প্রকাশ করিয়াছে। ডঃ রঘুবীর ভারতে দুষ্প্রাপ্য জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ জার্মানী হইতে (আলোকচিত্র Copy) আনয়ন করেন এবং তৎপুত্র লোকেশচন্দ্র তাহা প্রকাশ করেন।

অথর্ববেদ :—

ক্ষেমকরণদাসত্রিবেদী—	হিন্দী ভাষ্য
ঐ	গোপথ ব্রাহ্মণ, হিন্দী অনুবাদ।
রামগোপালশাস্ত্রী—	অথর্ববেদীয় বৃহৎ সর্বানুক্রমনী।
বিশ্ববন্ধুশাস্ত্রী—	অথর্বপ্রাতিশাখ্য
ভগবদ্দত্ত—	মাণ্ডূকীশিক্ষা

স্বনামধন্য সাতবলকর চারিবেদের মন্ত্রভাগ প্রণয়নপূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্যান্য বেদিকগ্রন্থ এবং গবেষণামূলকগ্রন্থ ;—

পঞ্জাবের ডঃ লক্ষ্মণস্বরূপ সর্বপ্রথম নিঘণ্টু এবং নিরুক্তগ্রন্থ সম্পাদনপূর্বক প্রকাশ করেন এবং পৃথক্‌ভাবে তাহার ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশ করেন। চন্দ্রমনিবিদ্যালঙ্কার নিরুক্তের উপর 'বেদার্থদীপক' হিন্দীভাষ্য রচনা করেন। স্বনামধন্য বালগঙ্গাধরতিলক আর্যদের আদিনিবাস সম্বন্ধে দুইটি গবেষণাগ্রন্থ—'Arctic Home of the Vedas' এবং 'Orion' ১৮৯২ ও ১৮৯৩ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। গ্রন্থ দুইটি প্রধানতঃ জ্যোতিষ্‌ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ১৯২৬ খ্রীঃ হংসরাজ তাঁহার 'বৈদিককোষ' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। মহারাষ্ট্রের চিন্তামনি বিনায়ক বৈদ্যের (C. V. Vaidya) বৈদিকযুগের সাহিত্যের ইতিহাস (Vedic Period) ১৯৩০ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ভগবদ্দত্ত হিন্দীভাষায় 'বৈদিক বাঙ্‌ময়কা ইতিহাস' তিনখণ্ডে রচনা ও প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাশ ঋগ্‌বেদে যে ইতিহাস, সমাজচিত্র ও কৃষ্টির চিত্র পাওয়া যায় তাহা লইয়া 'Rigvedic India' ও 'Rigvedic Culture' নাম দিয়া দুইটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম গ্রন্থটির শেষাংশে তিনি বেদের কাল নির্ণয়প্রসঙ্গে তিলকের যুক্তি খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে ঋগ্‌বেদীয় সভ্যতার কাল সাতাশহাজার খ্রীষ্ট পূর্বের সন্নিকট। তিলকের জীবদ্দশায় দাশমহাশয়ের গ্রন্থের বহুলাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই। পণ্ডিত রামগোপাল কল্পসূত্রের যুগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র তাঁহার মূল্যবান গবেষণা 'India of the Vedic Kalpasutras' গ্রন্থে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ভারতীয় বিদ্যাভবন হইতে খ্যাতনামা রমেশচন্দ্র মজুমদারের সাধারণ সম্পাদক-রূপ নেতৃত্বে দশখণ্ডে প্রকাশিত 'History and Culture of the Indian people' গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডের নাম 'Vedic Age' বা বৈদিকযুগ। এই খণ্ডে বৈদিকসাহিত্যে তদানীন্তন ভারতীয় সভ্যতার যে চিত্র পাওয়া যায় তাহার আলোচনা পাওয়া যায়। এই খণ্ডের এক এক পরিচ্ছেদ এক এক পণ্ডিত লিখিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি কলেবরে বিশাল ; বৈদিক ভারতের বর্ণব্যবস্থা, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, আহার-বিহার, বৃক্ষলতা, জন্তু, কীটপতঙ্গ, ইত্যাদি বিষয়ক যাবতীয় অমূল্য তথ্য

ব্রাহ্মণগ্রন্থরাজিতে নিহিত আছে। ডঃ যোগীরাজ বসু ইংরাজীভাষায় 'India of the age of the Brahmanas' নামক গ্রন্থে বৈদিক ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার সর্ববিধ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। গ্রন্থটির মধ্যে চারিটি খণ্ড আছে; যথা—(১) সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য, (২) রাজনৈতিক ও যুদ্ধবিদ্যানিষ্ঠ তথ্য (৩) ধর্ম ও দর্শন, এবং (৪) বিবিধ। সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার (কলিকাতা) গ্রন্থটির প্রকাশক। পাশ্চাত্ত্যের বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী বেদজ্ঞ পণ্ডিত ডঃ লুই রেণু (Louis Renou) গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন।

পণ্ডিত সূর্যকান্ত ম্যাকডোনেল ও কীথরচিত 'Vedic Index' গ্রন্থের এবং ব্লুমফিল্‌ড্‌রচিত 'Atharvaveda and the Gopatha Brahmana' মূল্যবান গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ করিয়াছেন। ম্যাক্‌ডোনেলকৃত 'Vedic Mythology' পুস্তকটিও হিন্দীতে অনূদিত হইয়াছে। বাপট, নানে, কাশীকর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রম করিয়া "শ্রৌতকোষ" রচনা করিয়াছেন। হোশিয়ারপুর হইতে বিশ্ববন্ধুশাস্ত্রী বৈদিকবাঙ্‌ময় সম্বন্ধে বিবিধ মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর আমরা বৈদিক বাঙ্‌ময়ে বঙ্গদেশ হইতে যে সকল মনীষীর অবদান আছে তাঁহাদের বিষয়ে আলোচনা করিব।

বহু খ্যাতনামা বঙ্গদেশীয় মনীষী বিশাল বেদ সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশন কার্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রমেশ দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে তাঁহাদের অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

<u>রমেশচন্দ্র দত্ত</u>;—রমেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী যিনি সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদ করেন ও প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই স্মরণীয় অনুবাদ কার্য আরম্ভ করেন। ঋকসংহিতার আটটি অষ্টক আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহাকে এই দুরূহ কার্যে সাহায্য করেন; তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অলোকনাথ ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র এই সকল পণ্ডিতের নাম তাঁহার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যের বিদ্বৎ-সমাজও এই অনুবাদজন্য দত্তমহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কাউয়েল (E. B. Cowell), মাক্‌স্ মূলার প্রভৃতি বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাইয়াছেন। বেদের এই বিশাল অনুবাদকার্য জন্য দত্তকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অনেকের সন্দেহ ছিল তিনি কার্যটি

শেষ করিয়া যাইতে পারিবেন কিনা। এই স্মরণীয় অনুবাদকার্য ছাড়া তিনি ভারতীয় সাহিত্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অন্যান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে Great Epics of India, Ramayana in Verse, Mahabharata in Verse, Early Hindu civilisation, Laws of ancient India in Verse, প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ঋগ্‌বেদের অনুবাদ-কার্যে রমেশচন্দ্র সায়ণভাষ্যের সাহায্য প্রধানতঃ লইয়াছেন কিন্তু নিজের কল্পিত অর্থও বহুস্থানে করিয়াছেন। ভারতের তথা বঙ্গদেশের গোঁড়া বেদজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ তাঁহার অনুবাদে তুষ্ট হইতে পারেন নাই, বহু ত্রুটি ধরিয়াছেন।

আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী ;—যে সকল বঙ্গদেশীয় বা ভারতীয় বৈদিক-বাঙ্‌ময়ের অনুবাদ, প্রকাশন বা আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে আচার্য সামশ্রমীকে মুকুটমণি, শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্বান বলা যাইতে পারে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত-রূপে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভূখণ্ডে বেদবিদ্যারত সারস্বত সাধকগণ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। বঙ্গদেশে এইরূপ বেদবিদ্যানিষ্ণাত পণ্ডিত আর জন্মগ্রহণ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও আর জন্মাইবে কিনা সন্দেহ। সামশ্রমী ১৮৪৬ খ্রীঃ ২৮শে মে দিবসে পাটনানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামদাস ইংরাজ-সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কর্ম হইতে অবসর-গ্রহণ-পূর্বক রামদাস কাশীধামে সপরিবারে বাস করিতেন। বাল্য হইতেই সামশ্রমীর উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়নের স্পৃহা জন্মে কিন্তু তাঁহার মনের মত আচার্য পাইতেছিলেন না। সেই সময় কাশীতে নন্দরাম ত্রিবেদী নামক সামবেদে অভিজ্ঞ এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নিকট সামশ্রমী বেদ পড়িতে আরম্ভ করেন। বাল্য হইতেই তাঁহার লোকোত্তর মেধা ও মনীষা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ; তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। কিছুকাল ত্রিবেদীর নিকট অধ্যয়ন করার পর তিনি কাশীধামে সরস্বতীমঠে গৌড়-স্বামীর নিকট অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র বিংশতি বৎসর ; ঐ বয়সেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও মনীষার খ্যাতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ব্যাপ্ত হয়। কাশীতে বিংশতিবর্ষ বয়সে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। বুন্দিরাজ্যেও তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। বুন্দির মহারাজ একটি পণ্ডিতসভা আহ্বান করেন ; বহু খ্যাতনামা বিদ্বান্ সেই সভায় সমবেত হয়েন। বয়সে নবীন জ্ঞানে প্রবীণ যুবক সত্যব্রতও আমন্ত্রিত

হইয়াছিলেন। সেই বিদ্বৎসভায় বুন্দিরাজ সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মতি-ক্রমে সত্যব্রতকে "সামশ্রমী" উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর সামশ্রমী উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া কুম্ভমেলায় যোগদানজন্য হরিদ্বারে সমাগত হয়েন। কুম্ভমেলায় সর্বদাই বহু বিচারসভা, বিতর্কসভা বসে। বহু প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া সামশ্রমী একটি বিচারসভায় বিজয়মাল্য প্রাপ্ত হন। কাশ্মীরের রাজা রণবীরসিংহ সেই কুম্ভমেলায় উপস্থিত ছিলেন। সামশ্রমীর অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তি দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কাশ্মীরের রাজপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ নবদ্বীপের মথুরানাথ পদরত্নের কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই মথুরানাথের পিতাই স্বনামধন্য ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। ১৮৭০ খ্রীঃ সামশ্রমী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকার জন্য সামবেদ-মুদ্রাঙ্কনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে এই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি 'বৈদিক গ্রন্থপ্রত্ন' নামক মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি যখন বেদের বিভিন্নগ্রন্থ প্রকাশনের উদ্যোগ করেন, তখন বেদাঙ্গের অতি গুরুত্বপূর্ণ নিরুক্ত-গ্রন্থ প্রণয়নের ভার সামশ্রমীকে দেওয়া হয়। এই গ্রন্থের একটি দীর্ঘভূমিকা তিনি সংস্কৃতে 'নিরুক্তালোচনম্' নাম দিয়া লেখেন। ভূমিকাটি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিবিধ আলোচনা ও তথ্যসম্বলিত। তিনি "ঊষা" নামে বেদের আলোচনামূলক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণের সংস্করণে তাঁহার বিস্তৃত অধ্যয়নের ও গভীর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন সুব্যক্ত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের তিনি 'ঐতরেয়ালোচনম্' নাম দিয়া প্রায় একশত পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকা সংস্কৃতে লিখিয়াছেন। এই ভূমিকায় তদানীন্তন বৈদিক সমাজের চতুর্বর্ণতত্ত্ব, গুণের বলে নিম্নবর্ণের উচ্চতরবর্ণে রূপান্তর, আর্যদের আদিনিবাস কোথায় ছিল, ঋগ্‌বেদের যুগে কিরূপ রাজতন্ত্র ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিল—ইত্যাদি বিবিধ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মৌলিকচিন্তা, সূক্ষ্ম বিচার, বিশ্লেষণশক্তি এই ভূমিকায় ও নিরুক্তের ভূমিকায় প্রতিপদে প্রতিছত্রে সুস্পষ্ট। এই জাতীয় গবেষণা ও আলোচনার তিনিই পথিকৃৎ। উক্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থ দুইটিতে তিনি যে সকল টিপ্পনী পাদটীকায় দিয়াছেন তাহা পাঠে তাঁহার বৈদিক বাঙ্‌ময়ে কি ব্যাপক অধ্যয়ন ও অধিকার ছিল দেখিলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতে হয়। বেদব্যতীত তিনি বঙ্গভাষাজননীরও বহু সেবা

করিয়া গিয়াছেন; বহু কবিতা ও স্বরচিত বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশ করেন; বহু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁহার নিকট বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য নানা দেশ হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্র আসিত। আজীবন তিনি ১৪।১৫ জন ছাত্রকে ভরণপোষণ পূর্বক বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার অন্তেবাসী ছাত্রদের মধ্যে জলন্ধরের নরদেবশাস্ত্রী, লাহোরের 'আর্যপ্রভা' সম্পাদক সন্তরাম বেদরত্ন, লাহোরের বৈদিককলেজের অধ্যাপক রামশাস্ত্রী, চাম্পারণের জগন্নাথপ্রসাদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রধান। সামশ্রমী পরিণত বয়সে কলিকাতা সংস্কৃতকলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদের অধ্যাপনা করিতেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তাঁহার সাক্ষাৎ ছাত্র ও প্রিয় ছাত্র বেদবিদ্যানিষ্ণাত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়কে আমি গৌহাটী কটন কলেজে অধ্যাপকরূপে পাই। তাঁহার নিকট সামশ্রমীর আদর্শ জীবন, অধ্যাপনাশৈলী, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তা সম্বন্ধে বহু কথা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সামশ্রমীর স্বহস্ত লিখিত কয়েকটি সামগানের স্বরলিপিও আমি তাঁহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। স্নাতকশ্রেণীতে শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহোদয়কে বেদের অধ্যাপকরূপে পাওয়াতে অশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। তিনি অদ্যাপি (সেপ্টেম্বর ১৯৭০) জীবিত আছেন। বর্তমানে মীরাটে দ্বিতীয়পুত্রের নিকট আছেন। অধুনা তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরশ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে মদীয় অধ্যাপক স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী (মহারাষ্ট্র দেশীয়) আমাদের বলিয়াছিলেন যে দাক্ষিণাত্যে সামশ্রমীকে সায়ণাচার্যের দ্বিতীয় মূর্তিরূপে শ্রদ্ধা জানান হইয়াছিল; অনেকে বলিত সায়ণাচার্যই সামশ্রমীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৯১১ খ্রীঃ সন্ন্যাস-রোগে ১লা জুন তিনি ৬৫ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন।

সামশ্রমী গোভিলগৃহ্যসূত্র, শুক্ল যজুর্বেদ, সামবেদ, সামবেদের বংশব্রাহ্মণ ও দেবতাধ্যায়ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, মন্ত্র ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ ও সামবিধান ব্রাহ্মণ সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। সায়ণভাষ্যসহ চারিখণ্ডে সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। ঐতরেয়ালোচনম, নিরুক্তালোচনম্, ত্রয়ীচতুষ্টয় প্রভৃতি তাঁহার মৌলিকগ্রন্থ। ভারতে বিশাল বৈদিক বাঙ্ময়ের গ্রন্থরাজি যে সকল পণ্ডিত সম্পাদন, প্রকাশ বা অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সামশ্রমীর নাম শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র :—সামশ্রমীর সমসাময়িক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এসিয়াটিক সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং অপ্রকাশিত কয়েকটি বৈদিক গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ঐতরেয় আরণ্যক, অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ, আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র প্রভৃতি দুরূহ মূল্যবান বৈদিক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ১৮৭০-৭২ খ্রীঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যুগ্মভাবে গোপথ ব্রাহ্মণ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এই সকল সম্পাদন কার্য ছাড়াও মিত্রমহোদয় বেদবিষয়ে মৌলিক গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী :—তাঁহার পিতার নাম সুধারাম লাহিড়ী। বাংলা ১২৬০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে তিনি পণ্ডিত, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। সায়ণভাষ্যসহ বঙ্গাক্ষরে তিনি ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব চারিবেদ ছাপাইয়া প্রকাশ করেন ; বেদমন্ত্রের বঙ্গানুবাদও ঐ সঙ্গে দিয়াছেন। এই বহুপরিশ্রমসাধ্য বিরাট কার্য তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। কেবল বঙ্গভাষাভাষী পাঠকদের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই কার্য করেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাঁহাকে এই ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করেন। তাঁহার অনূদিত ও সম্পাদিত চারিবেদ সায়ণভাষ্য সহ উনচল্লিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয় ; মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা বত্রিশহাজার। এই বিরাট কার্য লাহিড়ী মহোদয়ের ১৭ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনার ফল। মণিপুর রাজদরবার তাঁহাকে 'বেদাচার্য' উপাধি দান করেন। কাশীর ভারত ধর্মমহামণ্ডল তাঁহাকে 'বেদবিশারদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে 'বর্তমান যুগের বেদব্যাস' বলিতেন। বেদচতুষ্টয়ের এইভাবে প্রকাশন ছাড়া তিনি আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও 'জ্ঞানবেদ' তাঁহার উল্লেখযোগ্য শ্লাঘনীয় অবদান। 'পৃথিবীর ইতিহাস' ছয় খণ্ডে সাড়ে চারিহাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আর্যদের ধর্ম, দর্শন, রাজতন্ত্র সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, জৈন সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা ইত্যাদি বিবিধ তথ্যে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। চারিবেদের সার বা মর্ম সংগ্রহ করিয়া তিনি পাঁচখণ্ডে "জ্ঞানবেদ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি বাংলাদেশে বেদপ্রচারকল্পে ১৩২৮ সালে বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে হাওড়া সহরে বেদ সভার উদ্বোধন করেন।

ঋগ্‌বেদ প্রভৃতির ব্যাখ্যায় লাহিড়ী মহাশয় অধিকাংশস্থলে বেদাঙ্গ নিরুক্ত বা ভাষ্যকার সায়ণের অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার বেদব্যাখ্যা অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই স্বকপোলকল্পিত এবং বহুস্থানে তিনি যেসকল আধ্যাত্মিকতত্ত্ব দোহন করিয়াছেন তাহা মূলমন্ত্রানুগামী নহে এবং কষ্টকল্পিত। এই সকল কারণে বিদ্বৎসমাজে তাঁহার ব্যাখ্যা সমাদর লাভ করে নাই। বাংলা ১৩৩৯ সালে উনআশী বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

উক্ত পণ্ডিতগণ ব্যতীত আরও কয়েকজন বঙ্গদেশীয় বিদ্বান বেদশাস্ত্র প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায় ১৮১৬ খ্রীঃ তিন বৎসরে বহু উপনিষদ্ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ্ গ্রন্থমালা (প্রধান ১১টি উপনিষদ্) বঙ্গানুবাদসহ উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশ করিয়াছে। তৎপূর্বে শ্রদ্ধেয় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মূল এগারটি উপনিষদ্, মূলানুবাদ, ভগবান শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদসহ প্রকাশ করেন। ইহা দুর্গাচরণ মহোদয়ের অমর কীর্তি। বসুমতী গ্রন্থমালায় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপনিষদ্ গ্রন্থমালা বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী অতি অল্প মূল্যে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বেদ প্রচারকল্পে ঋগ্‌বেদের কয়েকটি খণ্ড বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন; প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল মাত্র এক টাকা। কিন্তু তিনি কাজটি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বিদ্বজ্জনবরেণ্য পণ্ডিত-শিরোমণি চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার গোভিল গৃহ্যসূত্রের উপর যে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণসমৃদ্ধ বিশাল ভাষ্য রচনা করেন তাহা পাঠে প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয়দেশের বেদবিদ্যারত পণ্ডিতগণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই ভাষ্যে তর্কালঙ্কার স্মার্ত রঘুনন্দনেরও বহু সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। পণ্ডিত উমেশ বিদ্যারত্ন ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন ঋগ্‌সংহিতার সায়ণভাষ্য ১৮৯৩ খ্রীঃ প্রকাশ করেন।

বৈদিক বাঙ্‌ময়ের উপর যে সকল বঙ্গদেশীয় মনীষী গবেষণা কার্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও গ্রন্থাবলীর উল্লেখ 'বৈদিক বাঙ্‌ময়ে ভারতীয়গণের অবদান' শীর্ষক আলোচনাংশে করা হইয়াছে। পণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য যিনি উড়িষ্যায় অথর্ববেদের পিপ্পলাদ শাখীয় ব্রাহ্মণকুল আবিষ্কার করেন ও বেদবিষয়ে যাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁহার কথা অথর্ববেদ আলোচনাকালে উল্লেখ করিয়াছি। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর নিরুক্তের বঙ্গানুবাদ করেন। ডঃ

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য অথর্ববেদের উপর বিশেষভাবে গবেষণা করিয়াছেন এবং ইংরাজীতে ও বাংলায় তৎসম্বন্ধে গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। 'অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি' তাঁহার বাংলায় রচিত গ্রন্থটি তদানীন্তন ভারতীয় কৃষ্টির প্রামাণ্য গ্রন্থ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক। খ্যাতনামা শ্রীঅনির্বাণ রচিত বেদমীমাংসা দুই খণ্ডে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মন্ত্রের রহস্য, দেবতাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ 'মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা' নাম দিয়া ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের মধুচ্ছন্দা-নামক ঋষির (পুরুষ ঋষি) দৃষ্ট মন্ত্রসমূহের আধ্যাত্মিকতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ঋগ্বেদের সূক্তের মূল স্বীয় বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা। 'বেদগ্রন্থমালা' নাম দিয়া তাহাদের বেদার্থমঞ্জুষানামক ব্যাখ্যাসহ শ্রীপরিতোষ ঠাকুর ও অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। প্রত্যেকটি মন্ত্রের প্রতি পদের তাঁহারা বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় দিয়াছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বৈদিকযুগে ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি

বৈদিকযুগে সমাজের তিনটি ঊর্ধ্ব শ্রেণীর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। উপনয়নের পর ছাত্রকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে বা তপোবন-বিদ্যালয়ে গমন করিতে হইত। তিনটি উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নগ্রহণে অধিকার ছিল। উপনয়নকে সেইজন্যই "দ্বিতীয় জন্মলাভ" বা "আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্র" বলা হইত এবং যাহাদের উপনয়ন হইত তাহাদের বলা হইত "দ্বিজ"। শতপথে (১১-৫-৪-১২) এই উপনয়নে দীক্ষিত দ্বিজ সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ আছে যে, আচার্য ছাত্রের মস্তকে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার মন ভগবদ্ভাবে পূর্ণ করিয়া দিতেন। তৃতীয় রাত্রে আচার্য হইতে এই অব্যক্তভাব শিষ্যের মনে প্রবেশ করিত এবং সাবিত্রীমন্ত্রের সহিত সে তাহার প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হইত। ইহাই তাহার আধ্যাত্মিক নবজন্ম। উপনয়ন-দীক্ষার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শতপথ ব্রাহ্মণে (১১-৫-৪-১২) পাওয়া যায়। "বাস্তবিকই যে ব্রহ্মচর্য পালন করে তাহার নবজন্ম হয়—নূতন

আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হয়।" ছাত্রকে ব্রহ্মচারী বলা হইত এবং তাহাকেও নিয়মানুসারে চলিতে হইত। "আমি ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিতে চাই... আমাকে ব্রহ্মচারী হইতে দেওয়া হউক।" উপনয়ন হওয়ার পর দ্বিজছাত্রের বেদপাঠের অধিকার জন্মাইত। সমগ্র শতপথ ব্রাহ্মণে উপনয়ন হইবার পর ছাত্র কিরূপে আচার্যের তপোবনে গমন করিত এবং আচার্যের প্রথম করণীয় কর্তব্য কি ছিল সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।

"আজ হইতে তুমি ব্রহ্মচর্যের নিয়মাবলী পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে। তোমার করণীয় কর্তব্য কর। যজ্ঞকুণ্ডে কাষ্ঠ দান কর। আচার্যের আজ্ঞাধীন ও বাধ্য হইবে। দিবানিদ্রা ত্যাগ করিবে। জিতেন্দ্রিয় হইবে।"—ইত্যাদি উপদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ছাত্র অত্যন্ত বিনয় ও কুণ্ঠার সহিত আচার্যসমীপে উপস্থিত হইত। আচার্য তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে তাঁহার ছাত্ররূপে গ্রহণ করিতেন।

সমগ্র ছাত্রজীবনকে সুদীর্ঘ যজ্ঞের সহিত তুলনা করা হইয়াছে কারণ তাহা একটি বিরাট তপস্যা বা সাধনা। ছাত্রকে প্রতিদিন বেদপাঠ ও আনুষঙ্গিক বহু বিষয় পাঠ করিতে হইত। "এইরূপেই পবিত্র যজ্ঞাগ্নির উজ্জল শিখা তাহার মনকেও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত।" অসঙ্কোচে ও দ্বিধাহীন চিত্তে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইত। এইভাবে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে বিনয়ের উদ্ভব হইত। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত—"লজ্জা ও অহংকার বিসর্জন দিয়া তাহাকে ভিক্ষা দ্বারা অন্নসংগ্রহ করিতে হয়।" যাহাতে প্রথমেই তাহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে না হয় তজ্জন্য সর্বপ্রথম তাহাকে আচার্যপত্নীর নিকট ও তাহার পর তাহার নিজের মাতার নিকট ভিক্ষা চাহিতে হইবে। শিক্ষা সমাপনান্তে হোমাগ্নিতে শেষ সমিধ্ অর্পণ অর্থাৎ কাষ্ঠ সংযোগ করিয়া তাহাকে শেষ স্নান করিতে হয়। স্নান সমাপন করিয়া আরণ্য বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিবার সময় সে হয় স্নাতক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনকে সমাবর্তন বলা হইত। সেইজন্যই আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান প্রথাকে "সমাবর্তন উৎসব" বলা হয়। পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় ছাত্র গুরুগৃহের পবিত্র যজ্ঞকুণ্ড হইতে একটি প্রজ্জলিত কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত এবং গৃহে তাহা হইতেই পবিত্র গার্হপত্যাগ্নি প্রজ্জলিত করিত।

বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে আমরা বহু ছাত্রের নাম

পাই। আরুণি, ভৃগু, শ্বেতকেতু, নচিকেতা, সত্যকাম, নাভানেদিষ্ঠ, নারদ, শৌনক ইত্যাদি বহু প্রসিদ্ধ নাম। আত্মত্যাগ, সেবাপরায়ণতা ও পরমজ্ঞানের জন্য তাহারা বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নাভানেদিষ্ঠের ছাত্রজীবনের বর্ণনা আছে (৫-২২)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সমগ্র নবম খণ্ডটিতে (৫-২২) প্রাচীন ভারতে আদর্শ আচার্য কিরূপে ছাত্রগণকে সততা ও সত্যবাদিতা শিক্ষা দিতেন তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপভাবে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আমরা বিখ্যাত ভরদ্বাজের আখ্যানটি পাই। কঠোপনিষদে কিশোর বালক নচিকেতার ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের প্রতি তীব্র পিপাসা ও মৃত্যুরহস্য ভেদ করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার বর্ণনা রহিয়াছে।

আচার্যের গৃহস্থালীর তদারক, গোচারণ ও সেবা ছাত্রজীবনের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪-৪ ৫) সত্যকাম কিরূপে গুরুগৃহ হইতে গরু লইয়া দূরদেশে যায় এবং কিরূপে তাহার গরুর সংখ্যা চারিশত হইতে একহাজারে পরিণত হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যক (৩-১৬, ৩, ৪) এবং শাংখ্যায়ন আরণ্যকেও (৭-১৯) ছাত্রগণ কর্তৃক আচার্যের গোচারণ ও গোপালন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। গোপথ ব্রাহ্মণের কোন কোন বিশেষ অংশে (১১-২-৯) ব্রহ্মচর্য পালন কালে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সংযম, ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। ছাত্রগণকে নিদ্রা, আলস্য, ক্রোধ, লোভ, অহংকার, নাম ও যশের আকাঙ্ক্ষা, আত্মশ্লাঘা বা সৌন্দর্যচর্চা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইত। তাহাকে জীবন গঠনের প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোকের সঙ্গ, গীত বাদ্য, নৃত্য, বিলাসিতা, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার, গান-অভ্যাস বা যাহা তাহার মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা জন্মাইতে পারে— এমন সর্বপ্রকার বস্তু হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আচার্যের সম্মুখে তাহাকে সর্বদা বিনয়ী ও নিরহঙ্কার থাকিতে হইত। প্রকৃতির সামান্যতম বস্তু হইতেও শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে তাহাকে শিক্ষা লইতে হইত।

পাঠ্য বিষয় :—শতপথ ব্রাহ্মণে (১১-৫) পাঠ্যতালিকার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সংহিতা বা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রধান ও প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। বৎসরের পর বৎসর নূতন নূতন ছাত্রগণকে এই পবিত্রজ্ঞানরাজি মৌখিকভাবে শিক্ষাদান করা হইত।

বেদপাঠকে "স্বাধ্যায়" বলা হইত। শতপথ ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ ষষ্ঠ ভাগটি বেদপাঠের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ ও উচ্চ প্রশংসায় পূর্ণ। শতপথ ব্রাহ্মণে বেদব্যতীত অন্যান্য পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। এই বিষয়গুলির মধ্যে বেদের নিয়মপ্রণালী (অনুশাসনানি), বিজ্ঞান (বিদ্যা), কথোপকথন (বাকোবাক্যম্), প্রচলিত কাহিনী ও কিম্বদন্তী (ইতিহাস পুরাণম্), মনুষ্যের কীর্তি সম্বন্ধে ছন্দোবদ্ধ বাক্য (গাথানারাশংসী) ইত্যাদিই প্রধান। সায়ণ এই সম্বন্ধে টীকা লিখিতে "অনুশাসনানি" অর্থে ছয়টি বেদাঙ্গকে ধরিয়াছেন, 'বিদ্যা' বলিতে দর্শনশাস্ত্র বুঝিয়াছেন, বাকোবাক্যম্ অর্থে ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনাদি, 'ইতিহাস-পুরাণম্' অর্থে তত্ত্বরহস্য ও রাজন্যবর্গের কাহিনী এবং 'গাথানারাশংসী' অর্থে মনুষ্যের প্রশংসাত্মক কার্যের বর্ণনা বলিয়াছেন। শতপথে (১৩ ৪-৩) সর্পবিদ্যার, রাক্ষসবিদ্যা এবং সভ্যসমাজে অপ্রচলিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত অসুর বিদ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর নূতন নূতন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করায় পাঠ্য-বিষয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৭-১-২) বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে নারদ তাঁহার আচার্য সনৎকুমারের নিকট নারদের অধীত যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকাভুক্ত বিষয় হইতেছে,—চারিটি বেদ, ইতিহাস পুরাণ (বেদানাং বেদম্), পিতৃলোকের সন্তুষ্টি সাধনে করণীয় নিয়মাবলী, অংক বা রাশি শাস্ত্র, দৈববিদ্যা, নিধিবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, তত্ত্ব আলোচনা (বাকোবাক্যম্) আচার ব্যবহার প্রণালী, দেববিদ্যা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান, বেদের আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বা ব্রহ্মবিদ্যা, পদার্থ ও শরীরবিদ্যা (ভূত-বিদ্যা), রাজনীতি ও শাসন-প্রণালী (ক্ষত্রবিদ্যা), জ্যোতির্বিদ্যা (নক্ষত্রবিদ্যা), সরীসৃপ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান বা সর্পবিদ্যা এবং দেবজন বিদ্যা। শঙ্করাচার্যের মতে এই "বেদানাং বেদম্" এর অর্থ ব্যাকরণ ও ব্রহ্মবিদ্যা—যাহার দ্বারা বেদাঙ্গ পাঠ করা যায়। দেবজনবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন সুগন্ধি দ্রব্যপ্রস্তুতি ও নৃত্যগীত বাদ্যাদি (কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীত উভয়ই)। রঙ্গরামানুজ প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিত এই শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি শব্দ করিয়াছেন যথা :—দেববিদ্যা ও জনবিদ্যা। প্রথমটি নৃত্য ও গীত-অর্থে ও দ্বিতীয়টি চিকিৎসা বিদ্যা বা ওষধি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

বিতর্কসভা : আলোচনা সভা ও পরিষদ :—এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত তর্ক, আলোচনা সভা ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা প্রকার পরিষদ

শিক্ষাদানের অঙ্গ বলিয়াই পরিগণিত হইত। এই সকল বিষয়ের অধিকাংশই শিক্ষাসংক্রান্ত অথবা যজ্ঞসম্বন্ধীয় নানা বিষয় লইয়া হইত। বৈদিক মূলগ্রন্থে এই সকল তর্ক বিতর্ককে "ব্রহ্মোদ্য" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কাদম্বরী প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাকে বলা হইয়াছে "বিদ্যাবিচার" বা "বিদ্যা বিবাদ"। তর্ক সভায় প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করা হইত; বিচারের ভার থাকিত একজন বা কয়েকজন বিচারকের উপর।

শুক্ল যজুর্বেদ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই প্রথম প্রস্তাবকারী ও প্রতিবাদকারীকে যথাক্রমে 'প্রশ্নিন্' ও 'অভিপ্রশ্নিন্' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে পূর্বে উল্লিখিত "বাকোবাক্যম্" শব্দটির প্রকৃত অর্থ এইরূপ আলোচনা বা কথোপকথনের বাক্য ও প্রতিবাক্য।

এইরূপ তর্ক বা আলোচনা সভা হইতেই তর্কশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। কেবলমাত্র ছাত্রগণ নহে, পরম জ্ঞানী আচার্য্যগণও উৎসাহ ও পণ্ডিত-জনোচিত গাম্ভীর্য-সহকারে এই সকল তর্কসভায় যোগদান করিতেন। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে এই সকল তপোবন বিদ্যালয়ে, রাজসভায় ও বড় বড় যজ্ঞস্থলে যে সকল ধর্ম আলোচনা বা শিক্ষা সংক্রান্ত তর্ক সভার অনুষ্ঠান হইত—সে সম্বন্ধে বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে এই ধরণের তর্ক বিতর্কের বহু বিবরণ পাওয়া যায়। বিদেহরাজ জনক জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং তাঁহার সভায় প্রায়ই তর্ক ও আলোচনাসভার অনুষ্ঠান হইত এবং দ্বন্দ্বে যিনি জয়ী হইতেন তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এই শতপথ ব্রাহ্মণে দেবদেবীর সংখ্যা লইয়া ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও শাকল্যের মধ্যে বিতর্ক (১১-৬-৩), উদ্দালক আরুণি ও শৌচেয় প্রাচীনাযোগের মধ্যে (১১-৫-৩-১) আচার্য শাণ্ডিল্য ও তাঁহার ছাত্র সাপ্তরথ্যের মধ্যে, ঋগ্বেদীয় পুরোহিত 'হোতা', যজুর্বেদীয় পুরোহিত অধ্বর্যু'র মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা (১১-৫-২-১১); অশ্বমেধযজ্ঞ সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরোহিতের মধ্যে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্কের বিবরণ পাওয়া যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১১-৬-২০) রাজর্ষি জনককে ব্রাহ্মণগণের তর্কে আহ্বান এবং ঋষি ও পরম জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্যের তাঁহাদের প্রতি উত্তর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে আর একটি কৌতুকজনক ব্যাপারের কথা জানা যায় যে স্বর্ণ মুদ্রা ছুঁড়িয়া "যুদ্ধং দেহি" রূপে তর্কযুদ্ধে বা বাক্‌যুদ্ধে আহ্বান জানান হইত। উদ্দালক নামে কুরু-পাঞ্চালের এক ব্রাহ্মণ যুবক

উত্তর ভারতে গিয়া একটি স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ও দ্বন্দ্বে আহ্বানরূপে নিক্ষেপ করে। উত্তর দেশবাসীরা এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং গৌতমের পুত্র স্বৈদায়নকে তাহাদের মুখপাত্ররূপে নির্বাচিত করে এবং বাক্‌যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলে। উভয়ের মধ্যে যে তর্কযুদ্ধ হয় তাহাতে স্বৈদায়ন উদ্দালককে পরাস্ত করে; ইহার ফলে উদ্দালক বিজয়ী স্বৈদায়নকে স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইরূপেই তর্ক ও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইত। উপনিষদের যুগে এইরূপ তর্ক ও আলোচনা চরম উন্নতি লাভ করে। এই যুগে রাজর্ষি জনকের রাজসভা এইরূপ নানাবিধ ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনার বিশেষ কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। মহাজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ঋষিদের মধ্যে যে সকল তর্ক ও আলোচনা হইয়াছিল "বৃহদারণ্যক উপনিষদে" তাহার বিবরণ প্রাচীন ভারতের উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অমর অবিস্মরণীয় প্রমাণ। বৈদিক ভারতের বিদুষী মহিলাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যরূপে মহিলা দার্শনিক ঋষি গার্গীর নাম আজও অতি উজ্জ্বলরূপে বিরাজমান। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য অন্যান্য ঋষিদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু গার্গীকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। গার্গীও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। জনকের মতে উভয়েই সমতুল্য বলিয়া ঘোষিত হয়েন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই দুইটি তর্কযুদ্ধের বিবরণ উজ্জ্বল হইয়া আছে।

দ্বিবিধ ছাত্র:—ছাত্রদিগের মধ্যে দুইটি বিভাগ ছিল—প্রথম উপকুর্বাণ, দ্বিতীয় নৈষ্ঠিক। উপকুর্বাণ ছাত্রগণ পাঠ সমাপনান্তে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবন শুরু করিত। গুরুর বিদ্যাবংশধর নৈষ্ঠিক ছাত্রগণ আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত না। তাহারা ত্যাগের আদর্শে উদ্দীপিত হইয়া আচার্যের গৃহে বাস করিবার জন্য চির কৌমার্য গ্রহণ করিত। তাহারাই উত্তরকালে পরম পণ্ডিত ও ঋষি হইত। যাহারা উপকুর্বান নামে অভিহিত হইত শিক্ষায়তন ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় আচার্যকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ কিছু দিয়া আসিতে হইত। কিন্তু বিনামূল্যে শিক্ষাদান করাই প্রথা ছিল। পুত্র কন্যার শিক্ষা বাবদ পিতামাতাকে সামান্যতম কপর্দকও তাহাদের বেতন ও ভরণ পোষণের জন্য ব্যয় করিতে হইত না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী গ্রামসমূহ এই সকল ব্যয় বহন করিত। প্রতিদিন ছাত্রগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। আচার্যও কোনরূপ মূল্য গ্রহণ করিতেন না। 'আচার্য' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হইতেছে যিনি বিনামূল্যে শিক্ষাদান করেন। এইরূপ একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে

দক্ষিণাস্বরূপ আচার্যকে কিছু দান না করিলে সামান্যতম শিক্ষালাভও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেইজন্যই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় ছাত্র তাহার ইচ্ছানুসারে সামান্য কিছুও দক্ষিণা দিয়া যাইত। দরিদ্র ছাত্রগণ অন্য কিছু দিবার সামর্থ্য-অভাবে কিছু শাকসব্জী অন্ততঃ দিয়া যাইত।

দ্বিবিধ আচার্য ঃ—উপনয়ন সমাপ্ত হইবার পর ছাত্রগণ যে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বতোমুখী শিক্ষালাভের জন্য গমন করিত সে সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর ভ্রাম্যমান আচার্য ছিলেন। তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া উৎসুক ও আগ্রহান্বিত ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহাদের বলা হইত 'চরক'। এই শব্দটির মূল ধাতু "চর্"— ইহার অর্থ ভ্রাম্যমান। শতপথ ব্রাহ্মণে (৪-২-৬-১) এইরূপ ভ্রাম্যমান আচার্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। এই শ্রেণীর আচার্যগণ এইভাবে বিদ্যা ও জ্ঞান বিতরণ করিয়া সমাজের শিক্ষা বিস্তারের একটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা সহজলভ্য ও সহজপ্রাপ্ত জ্ঞান-বিদ্যার সচল বিদ্যায়তন ছিলেন। তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিতেন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন। যে সকল আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আচার্য প্রায় দশ হাজার ছাত্রের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া শিক্ষা দান করিতেন তাঁহাদের 'কুলপতি' উপাধি দান করা হইত। কুলপতির লক্ষণ হইতেছে—

"মুনীনাং দশসহস্রং যোঽন্নদানাদিনা।
অধ্যাপয়েদ্ ভরেদ্ বাপি সবৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥"

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলায় ঋষি কণ্ব ছিলেন কুলপতি। সুতরাং বুঝা যায় যে কুলপতি আচার্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন। এখন শব্দটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা Chancellor অর্থেই বোঝায়। উপাচার্যকে উপকুলপতি বলা চলে।

আচার্যরূপে পিতা ঃ—আচার্যের ন্যায় পিতার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ রহিয়াছে। শিক্ষা সমাপনান্তে গৃহে সমাগত ছাত্রদের পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য পিতার নিকট হইতে শিক্ষা নেওয়ার উদাহরণ বিরল নহে। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত শ্বেতকেতু পিতা আরুণির নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ পরাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন (ছা. উ. ৫-৩-১)। শতপথ ব্রাহ্মণে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে যে একজন ব্রাহ্মণ তাহার নিজের পুত্রকে পড়াশুনা ও

যাগযজ্ঞ—এই উভয় বিষয়ই শিক্ষা দিবেন (১-৬-২-৪)। বরুণ তাঁহার স্বীয় পুত্র ভৃগুকে শিক্ষা দান করিয়াছেন (তৈ. উ. ভৃগুর্বৈ বরুণং পিতরমুপসসার)। শতপথ ব্রাহ্মণেও এরূপ উল্লেখ আছে। সামবেদের অন্তর্ভুক্ত বংশব্রাহ্মণে প্রদত্ত আচার্যের তালিকাটিও এই বিষয়টি সমর্থন করে। শাংখ্যায়ন আরণ্যকেও আচার্যদের একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই সকল আচার্যরা তাঁহাদের নিজেদের পুত্রদেরও শিক্ষা দিতেন (১৫-১)।

ক্ষত্রিয় আচার্য :—ব্রাহ্মণরা যে ক্ষত্রিয় আচার্যের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন তাহারও উদাহরণ বহুল পরিমাণে আছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহই গুরু হইতে পারিবে না এরূপ নিয়মই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও ছিল। বিদেহরাজ জনক ছিলেন একজন বিখ্যাত বিদ্বান ও আচার্য এবং অনেক ব্রাহ্মণ ঋষি তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছেন (শ. ব্র. ১১-৬-২ ১)। তাঁহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গার্গ্যবালাকি নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নাম কৌষীতকি উপনিষদে উল্লিখিত আছে (৮-৪-১)। পরমজ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয়ে কাশীরাজ অজাতশত্রুর অগাধ জ্ঞান অবগত হইয়া তিনি নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন : সমিধ হস্তে ধারণ করিয়া গার্গ্যবালাকি রাজার নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে শিক্ষা দান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিতে পারে না—এই বিধির উপর ভিত্তি করিয়া রাজা প্রথমে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। খুব চাপে পড়িয়া তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিলেন।

ঠিক এইরূপ রাজা প্রাবাহণ জৈবালির ব্রহ্মজ্ঞান ও বিতর্ক শক্তি অতীব জ্ঞানী শ্বেতকেতু ও তাঁহার পিতাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। রাজা তাঁহাদের উভয়কেই পরম জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন (শ. ব্রা. ১৪-৯-১) (বৃহদারণ্যক ৬-১-১ ; ছান্দোগ্য ৫-৮-১)।

রাজা অশ্বপতি কেকয় আর একজন জ্ঞানী ক্ষত্রিয় আচার্য। অগ্নি হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট সমাগত নয়জন ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের অগ্নি রাজার অগ্নিকুণ্ডে স্থাপিত করিলেন ; রাজাও তাঁহাদের শিষ্যরূপে গ্রহণপূর্বক বৈশ্বানরের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞানদান করিলেন।

আচার্য ও ছাত্রের সম্বন্ধ :—আচার্য ও শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল অত্যন্ত মধুর ও আন্তরিকতাপূর্ণ। শিষ্যরা আচার্যকে পিতার ন্যায় দেখিত এবং আচার্যরাও

শিষ্যদিগকে পুত্রতুল্য মনে করিতেন। আচার্য ও শিষ্য উভয়েই এই মধুর সম্পর্ক বজায় রাখিতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। প্রাত্যহিক শিক্ষার সমারম্ভে আচার্য দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্রে এই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—

"ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ,
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

'ব্রহ্ম আমাদের উভয়কেই রক্ষা করুন। তিনি আমাদের একত্রে বহন করুন। আমরা একত্রে জ্ঞানলাভের শক্তি যেন অর্জন করি। আমাদের শিক্ষা যেন তাহার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ করিতে পারে—অথবা আলোকের ন্যায় সুদীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। আমাদের মধ্যে যেন কখনও বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়।'

<u>সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ</u>:—তৈত্তিরীয় উপনিষদে বৈদিকযুগের সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই ভাষণ হইতে তৎকালীন বৈদিক ঋষিগণের জ্ঞান, বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল তপোবন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ছাত্রগণ শিক্ষা সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে তাহাদের যে ভাষণ দেওয়া হইত, বর্তমান যুগেও তাহা অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা সমাপনান্তে স্নান করিয়া স্নাতকগণ যখন মখমলসদৃশ সবুজ শ্যামল তৃণাবৃত অরণ্য পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গনে সমবেত হইত, তখন আচার্য যে কথাগুলি বলিয়া তাঁহার বিদায় অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানাইতেন তাহার মর্ম এইরূপ ;—

সত্য কথা বলিবে; যাহা তোমার কর্তব্য তাহা করিবে। ধর্মপরায়ণ হইও। শাস্ত্রপাঠ হইতে বিরত হইও না। সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না। ধর্ম পথ ও কর্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইও না। সৎ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। দেবতা ও পিতৃগণকে তর্পণ দান করিতে ভুলিও না। আচার্যকে সম্মান প্রদর্শন করিও। পিতা ও মাতাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে। অতিথিকে শ্রদ্ধা করিবে। কু-কাজ সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। তোমাদের আচার ব্যবহার সর্বদা মার্জিত ও প্রশংসনীয় হওয়া উচিত। পবিত্র বিবাহিত জীবন যাপন করিও এবং এই জীবন ধারাকে অবিচ্ছিন্ন রাখিও। যখনই কিছু দান বা অর্পণ করিবে তাহা শ্রদ্ধার সহিত সুন্দর ভাবে অর্পণ করিবে। কখনও স্বার্থপর হইও না। সর্বতোভাবে কর্তব্যপথে থাকিও। ঈশ্বরে ভক্তি রাখিও। ইহাই

ভগবানের নির্দেশ। ইহাই উপদেশ। ইহাই বেদের শিক্ষা। আমারও ইহাই উপদেশ এবং তোমাদের জীবনের ইহাই যেন আদর্শ হয়।

এই সকল সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ হইতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শে যে গভীর জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং মূল গ্রন্থগুলিতে যে সুন্দর সুরঝঙ্কার যুক্ত অননুকরণীয় সংস্কৃত ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা যে কোন পাঠক পড়িয়া মুগ্ধ না হইয়া পারিবেন না। মাক্স্‌ম্যুলর্‌, গোল্ডষ্টুকর, সিল্‌ভাঁ লেভি, কোনো ও ভিন্‌টারনিৎস্‌ (Max muller, Goldstucker, Sylvian Levi, Stein Konow, Winternitz) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞবিদ্বদ্‌বর্গ এই অভিভাষণ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। এই অভিভাষণ পৃথিবীর সকল দেশের সকল সময়ের ছাত্রদের পক্ষে উপযুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা নিঃসন্দেহে এই উপসংহারে আসিতে পারি যে বৈদিক যুগে শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রদিগের শারীরিক, নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশসাধনের সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। শিক্ষা ব্যবস্থা মানসিক বিকাশ ও মনুষ্যত্বলাভের সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিল। ছাত্র জীবনের প্রতিশব্দ যে 'ব্রহ্মচর্য' ছিল ইহা হইতেই সেই যুগের শিক্ষাপদ্ধতির মূল আদর্শ জানা যায়। ব্রহ্মচযের শাস্ত্রোক্ত অর্থ হইতেছে চিন্তা বাক্য ও কার্যে সংযম শিক্ষা (মানসতপঃ, বাচিকতপঃ, কায়িকতপঃ)। নগরের কলকোলাহল হইতে দূরে শান্ত পরিবেশের মধ্যে ছাত্রগণ পিতার ন্যায় স্নেহশীল আদর্শ আচার্যের তত্ত্বাবধানে ও যত্নে জ্ঞানচর্চা, পরার্থপরতা ও আত্মসংযম প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত। এইরূপে সর্বতোমুখী শিক্ষালাভের ফলে তাহাদের চরিত্রের সুপ্তশক্তি পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইত। তাহাদের শিক্ষা ও ভরণপোষণের জন্য পিতামাতাকে সামান্যতম ব্যয়ও করিতে হইত না। অভিভাবকগণেরও আচার্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আচার্যের পদতলে বসিয়া ছাত্রগণ জ্ঞানের গভীরে ডুবিয়া যাইত। স্নাতক হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ছাত্রগণ বিবাহ করতঃ গৃহী হইত। ইহার পর হইতেই সে সমাজের অন্যতম সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

বলা বাহুল্য, যাহারা এইরূপ কঠোর আত্মসংযম, সেবা, আত্মনির্ভরতা ও জ্ঞানচর্চায় ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিয়া সহজ সরল জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তায় মগ্ন থাকাই জীবনের আদর্শ বলিয়া ভাবিতে শিখিত, তাহাদের পক্ষে সংসারী জীবনেও পূর্ণ বিষয়-বাসনা বা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় ডুবিয়া যাওয়া

কখনই সম্ভব হইত না। সংসারী জীবনের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা তাহাদের ন্যায় ও কর্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। সংসারে থাকিয়াও তাহারা আদর্শ জীবনযাপন করিত।

এইরূপেই তাহারা পরবর্তী জীবনে আদর্শ গৃহী হইয়া সংযম, সততা, ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মহৎ জীবন যাপন করিয়া সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিত। এই সকল ছাত্রই সমাজের রত্নস্বরূপ ও জাতির মুখপাত্র হইবার যোগ্যতা অর্জন করিত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈদিক ভারতে স্ত্রীশিক্ষা

বেদ শব্দের দ্বারা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্—এই চারিটি সাহিত্য বুঝায়। বৈদিক পাঠ্যপুস্তকে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে এই প্রবন্ধে তাহার একটি প্রামাণ্যচিত্র তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব। পুরুষগণের শিক্ষার সুস্পষ্ট ও সবিস্তার বর্ণনা বেদে রহিয়াছে। ছাত্রজীবনকে বলা হইত ব্রহ্মচর্য এবং প্রথম জীবন ছিল ইহার কার্যকাল; বৈদিক সাহিত্যে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কিন্তু বেদে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এত সুস্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় না এবং সে যুগে নারীদের জন্য কোন শিক্ষালয় ছিল কিনা সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অতি সহজেই স্ত্রী-শিক্ষার মান অনুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনটি উচ্চ বর্ণের নারীর বেদ অধ্যয়নের পূর্ণ অধিকার ছিল এবং তাঁহারা অধ্যাপনার কাজও করিতেন। বৈদিক সাহিত্যে সংহিতার মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টা বহু নারী ঋষি, অন্যান্য সাহিত্যে বহু রমণী অধ্যাপিকা, শিষ্যা, তপস্বিনী, ব্রহ্মচারিণী এবং ব্রহ্মবাদিনীর নাম পরিদৃষ্ট হয়। সংহিতা-গুলিতে বেদমন্ত্রসমূহের অনেক নারী দ্রষ্টা অথবা ঋষির নাম উল্লিখিত আছে। তাঁহাদের নিকট অনেক বেদমন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে অনেক নারী মন্ত্রদ্রষ্টার নাম লিপিবদ্ধ আছে। তাহাদের মধ্যে বিশ্ববারা (১—১২৬), রোমশা, লোপামুদ্রা (১—১৭৯), অম্ভৃণী বাক্ (১০—১২৫), জুহু, পৌলোমী, কাক্ষীবতী ঘোষা, জরিতা, শ্রদ্ধা কামায়নী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বৈদিক দেবতাবিষয়ক বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থে এই দ্রষ্টাগণকে ব্রহ্মবাদিনী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বৃহস্পতি-দুহিতা ঋষি রোমশাকে বলা হইয়াছে ব্রহ্মবাদিনী ('বৃহস্পতিপুত্রী রোমশা

ব্রহ্মবাদিনী')। এই ঋষিগণ ছাড়াও ঋগ্‌বেদের সংবাদসূক্তে উর্বশী, যমী, সর্পরাজ্ঞী এবং ইন্দ্রাণী প্রভৃতিকে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে সাতাশ (২৭) জন নারী ঋষির উল্লেখ রহিয়াছে। সামবেদে নোধা, গোপায়না, শিকতা নিবাবরী প্রভৃতি কয়েকজন নারী ঋষি অমর হইয়া আছেন।

ঋগ্‌বেদে সংহিতার যুগ হইতে সূত্র সাহিত্যের যুগ পর্যন্ত উচ্চ তিনটি জাতির নারীরা পবিত্র সূত্রের দ্বারা দীক্ষিত হইতেন, অর্থাৎ তাঁহাদের উপনয়ন হইত; তাঁহারা ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, পবিত্র অগ্নি আধান করিতেন এবং বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ পাঠ করিতেন। স্মৃতিকার যম বলিয়াছেন,--

"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ইষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ॥"

প্রাচীন কালে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা নারীদের অভিষিক্ত করা হইত (উপনয়ন সংস্কার); তাঁহারা বেদ পাঠ করিতেন এবং সাবিত্রী মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন। হারীত নামে অপর একজন স্মৃতিকার কেবলমাত্র 'কুমারীণাম্' এই শব্দটির পরিবর্তন করিয়া উপরিউক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—'পুরাকল্পে তু নারীণাম্'। তাঁহারা বিচার অনুযায়ী পরিলক্ষিত হয় যে সে যুগে ব্রহ্মবাদিনী ও 'সদ্যোবধূ' নামে নারীদের দুইটি বিভাগ ছিল। ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহারা পবিত্র অগ্নি রক্ষা করিতেন। একটি উৎসবের মাধ্যমে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা উপনীত করিয়া সদ্যোবধূদের বিবাহ দেওয়া হইত: 'সদ্যোবধূনাং তু উপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিৎ উপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ'। এই বিস্পষ্ট মন্তব্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে দ্বিজ নারীগণ অথবা উচ্চ তিনটি বর্ণের নারীগণের পুরুষদের ন্যায় উপনয়ন হইত। ইহা ছিল একটি বিশেষ অপরিহার্য বিধি। আর্য জাতির Indo-Aryan অর্থাৎ ভারতীয় আর্য শাখায় এই প্রথা যদিও কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তথাপি Indo-Iranian অর্থাৎ ইরাণীয় আর্য শাখায় ইহার প্রচলন বলবৎ ছিল এবং আজও আছে। আজও জরথুশত্র সম্প্রদায়ভুক্ত নারীরা পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হন। তাঁহাদের এই উৎসবকে বলা হয় নওজোত্‌ (নবজন্ম) সংস্কার।

হারীতের বর্ণিত নারীদের দুইটি বিভাগের মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীরা বিবাহ

করিতেন না; তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পুরুষদের ন্যায় চিরকৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিতেন। উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীগণ গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপনান্তে পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইত অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিত। গৃহ্যসূত্রের কর্তা নারীদের এই উপনয়ন প্রথাসম্বন্ধে বলিয়াছেন 'প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীম্ অভ্যুদানয়ন্ জপেৎ সোমো দদৎ গন্ধর্বায়েতি'। বর উপবীতধারিনী নববধূর হস্ত ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করে 'সোমো দদৎ গন্ধর্বায়'। পৌরাণিক যুগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উদাহরণগুলিও এই প্রথাটির স্মারক। মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত আছে যে একজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডবমাতা কুন্তীদেবীকে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রদ্বারা ভূষিত করিয়া অথর্ব বেদোক্ত গায়ত্রী-শিরসমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন—

'ততস্তাম্ অনবদ্যাঙ্গীং গ্রাহয়ামাস স দ্বিজঃ
মন্ত্রগ্রামং তদা রাজন্ অথর্ব-শিরসি শ্রুতম্ ॥' (৩০৫—২০)

ইহাও অনুমিত হয় যে খ্রীঃ সপ্তম শতকে ও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত ছিল কারণ কাদম্বরী হর্ষচরিতের বিখ্যাত গ্রন্থকার বাণভট্ট একজন নারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন যিনি পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা উপনীত হইয়াছিলেন ('ব্রহ্মসূত্রেণ পবিত্রীকৃতায়াং কন্যায়াম্')।

দ্বিজ রমণীগণের এই উপনয়ন প্রথা মনুরও সুবিদিত ছিল। স্মৃতিচন্দ্রিকা, কমলাকর কর্তৃক লিখিত নির্ণয়সিন্ধু ও তজ্জাতীয় অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ হইতেও প্রমাণিত হয় যে দ্বিজ পুরুষদের ন্যায় বৈদিক যুগে নারীগণও উপনয়নে দীক্ষিত হইতেন এবং বেদ অধ্যয়ন করিতেন। মনুর স্মৃতিগ্রন্থ সংকলনের কালে যদিও এই প্রথাটি লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি ইহার প্রভাব তখনও দৃষ্ট হইত। পি. ভি. কানে তাঁহার History of Dharmasastras নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'যদিও মনুস্মৃতি রচনার কালে নারীদের উপনয়ন প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল এবং এই প্রথার প্রভাব কমিয়া গিয়াছিল তথাপি ইহা অনুমিত হয় যে মনু এই প্রথাটির সহিত সুপরিচিত ছিলেন'।

'পত্নী' শব্দটির ব্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গে পাণিনি 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে' এই সূত্রটি রচনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ হইল এই যে স্বামীকে কেবল যজ্ঞকর্মে সহায় করার অর্থেই পতি শব্দের সহিত 'ন' প্রত্যয় যুক্ত হইবে। সুতরাং শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী স্ত্রী শব্দটির সমানার্থক 'পত্নী' শব্দের অর্থ হইল যজ্ঞকর্মে পতির সহযোগিনী। বিপত্নীক কোন পুরুষের যজ্ঞসম্পাদনের

অধিকার ছিল না। রামায়ণে কথিত হইয়াছে যে রামচন্দ্র রাজসূয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া যজমানের অধিকারলাভার্থ সীতার এক স্বর্ণময় মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন ; কারণ ঐ সময় সীতা নির্বাসনে ছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে (৫-২-১·৪) স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে 'স্ত্রী হইল যজ্ঞের এক অর্ধাংশ' (অর্ধো হ বা এষ যজ্ঞস্য যৎ পত্নী)। প্রত্যেক যজ্ঞেই 'পত্নী সংযাজ' নামে একটি যাগ অনুষ্ঠিত হইত ; ইহাতে যজমান-পত্নীর বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত এবং তাঁহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। তিনি যজ্ঞবেদীর মধ্যে পুরোহিতদের সহিত আসন গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থে ইহার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় 'দেবতারা অবিবাহিতের হাত হইতে আহুতি গ্রহণ করেন না'—'ন বৈ অপত্নীকস্য হস্তাৎ দেবা বলিং গৃহ্নন্তি' (৫-১-৬-১০)। অশ্বমেধে যজমান রাজার চারিজন রাণী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী সম্পন্ন করেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানে বধূকে অনেক বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় এবং যদি ঐ মন্ত্রগুলি পুরোহিত, বর অথবা বধূর পিতা পাঠ করেন তাহা হইলে অবস্থাটি উপহসনীয় হইয়া পড়িবে এবং মন্ত্রের অভিপ্রায় ব্যর্থ হইবে। বিবাহের অতিরিক্ত অনুষ্ঠান কুশণ্ডিকাতে নববধূ ধ্রুবনক্ষত্রকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্র পাঠ করে ;—'ধ্রুবং দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবেয়ং, ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্'। ইহার অর্থ হইল 'আকাশ স্থির, পৃথিবী স্থির, এই নক্ষত্র (ধ্রুবতারা) স্থির, ঠিক এইরূপ আমিও স্বামীগৃহে স্থির থাকিব অর্থাৎ ধ্রুব বিরাজ করিব।' সুতরাং এই মন্ত্রটি নববধূর দ্বারা পাঠ করার হেতু সর্বজনবোধ্য। গোভিল প্রভৃতির স্পষ্ট নির্দেশ 'ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ।' তদ্রূপ 'প্র মে পতিযানঃ কল্পতাম্' এই মন্ত্রটি বধূ পাঠ করে। বর এবং নববধূ একত্রে 'সরস্বতী প্রেদমতে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে।

পাণিনি কঠী, কলাপী, বহ্বৃচী প্রভৃতি কতিপয় শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে কয়েকটি সূত্র রচনা করিয়াছেন। বেদের কঠশাখায় সুপণ্ডিত একজন স্ত্রীলোক কঠী নামে অভিহিত হন ; বহ্বৃচ্ শব্দ হইতে বহ্বৃচী শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং যে নারী বহ্বৃচ্ শাখা পাঠ করিয়াছেন তিনি বহ্বৃচী নামে কথিত হন। কলাপ শাখায় নিষ্ণাত একজন নারীকে কলাপী বলা হয়। পাণিনির এই সূত্রগুলি হইতে সুস্পষ্টরূপে ইহাই প্রমাণিত হয় যে প্রাচীনকালে নারীদের বেদপাঠের পূর্ণ অধিকার ছিল।

নারী অধ্যাপিকা এবং বিদুষী রমণী

বৈদিক যুগে বহু নারী অধ্যাপিকাও ছিলেন। পাণিনি আচার্যা এবং আচার্যাণী, উপাধ্যায়া ও উপাধ্যায়ানী এই দুইটি শব্দের ব্যুৎপত্তিমূলক সূত্র করিয়াছেন। এই দুই শব্দযুগলের পার্থক্য তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন আচার্যা ও উপাধ্যায়ের অর্থ হইল নারী অধ্যাপিকা, অপর দুইটির (আচার্যাণী এবং উপাধ্যায়ানী) অর্থ হইতেছে গুরুপত্নী। আচার্যানী এবং উপাধ্যায়ানী বলিয়া অভিহিত গুরুপত্নীগণ শিক্ষিত নাও হইতে পারিতেন। পাণিনির এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্য গ্রন্থে আচার্যা এবং উপাধ্যায়া এই শব্দ দুইটির উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন ভারতের কয়েকজন নারী অধ্যাপিকার নাম ও বিদ্যাবত্তার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত বিদুষী অধ্যাপিকাদের মধ্যে আপিশালা এবং ঔদমেধা দুইটি নামও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বৈয়াকরণ আপিশালি গোষ্ঠীর সৃষ্ট ব্যাকরণের একটি বিশেষ শাখা যে নারী পাঠ করিয়াছেন এবং শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাকে বলা হইত আপিশালা। ঠিক এইভাবেই ঔদমেধীর (একজন আচার্যা) নারী ছাত্রদের বলা হইত ঔদমেধা অথবা ঔদমেধীর ছাত্রী। পাণিনির একজন ব্যাখ্যাতা কাশিকা বৃত্তি লেখক কাশকৃৎস্ন ব্রাহ্মণী নামে একজন নারী আচার্যার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কাশকৃৎস্ন গোষ্ঠীর সৃষ্ট ব্যাকরণের একটি বিশেষ শাখা শিক্ষা দিতেন।

বিশাল বৈদিক সাহিত্যে, সংহিতায়, ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে অনেক বিদুষী নারীর নাম পরিদৃষ্ট হয়। গার্গী নামে একজন জ্ঞানী, বিদুষী ও তপস্বিনী নারী বৈদিক সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন। তিনি ছিলেন বচক্নুর কন্যা। বৈদিকযুগের প্রথিতযশা বিদুষী নারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্যা। জনকরাজের রাজসভায় প্রচুর জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হইত এবং ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক হইত। এখানেই যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্য ঋষিদের মধ্যে বিখ্যাত বিতর্ক ও বিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তর্কে যখন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অন্যান্য ঋষিরা পরাজিত হইলেন তখন নারী ঋষি গার্গী তাঁহাকে আহ্বান জানাইলেন। বৃহদারণ্যক গ্রন্থে (৩-৬ এবং ৩-৮) ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিতর্কে কাহারও জয় পরাজয় নির্ণীত হয় নাই। তাঁহাদের দার্শনিক বিবাদে উভয়েই সমান পারদর্শী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীর মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ

আধ্যাত্মিক আলোচনা এই উপনিষদে লিপিবদ্ধ আছে (২—৪)। এই মুনির মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুইজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তাঁহাকে বলা হইত ব্রহ্মবাদিনী। অপরজন কাত্যায়নী ছিলেন সাংসারিক। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার অভিলাষে পার্থিব দ্রব্যাদি দুই স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলে মৈত্রেয়ী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'যদি এই সংসার ধনে পরিপূর্ণ হয় তাহা হইলে আমি কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব' ?' তিনি উত্তর দিলেন যে 'ধন পার্থিববিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই' ('অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন')। ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন 'যাহা আমাকে অমৃতত্ব বা ব্রহ্মপদ দিতে পারিবে না তাহা (পার্থিব দ্রব্য) দিয়া আমি কি করিব' ('যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্')? মৈত্রেয়ীর এই স্মরণীয় এবং উল্লেখযোগ্য উক্তি প্রতি যুগের সাধু এবং সত্যসন্ধানীদের হতবাক করিয়া দিয়াছে। ভিন্টারনিৎস এবং অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য বিদ্বানগণ প্রাচীন ভারতের এক নারীর চিত্তে উত্থিত এই আধ্যাত্মিক আলোক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা, অমৃতের স্পৃহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। মৈত্রেয়ীর বাণীতে আমরা মানবাত্মার সেই চিরন্তন বাণী শুনিতে পাই যাহাকে মেথিউ আরনল্ড বলিয়াছেন 'Divine discontent' অর্থাৎ 'ঈশ্বরপ্রদত্ত অসন্তোষ'। তিনি আমাদের ইহাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে বস্তুগত সমৃদ্ধি অথবা পার্থিব ধনসম্পদ মানুষের আধ্যাত্মিক লিপ্সাকে চরিতার্থ করিতে পারে না এবং মানবকে অমৃতত্ব দান করিতে পারে না।

গন্ধর্ব প্রভাবিত এক বিদুষী নারীর (গন্ধর্ব-গৃহীতা কুমারী) কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪—২৫—৪) উল্লিখিত আছে। অগ্নিহোত্র নামে প্রাত্যহিক হোমটি দুইদিনে অথবা একদিনে সম্পাদিত হইবে এই নিয়া একবার পুরোহিতদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হয়। একবার সকালে এবং আর একবার বৈকালে ব্রাহ্মণদের অগ্নিহোত্র প্রত্যহ দুইবার করিতে হইত। প্রত্যূষের হোম ও সায়ন্তন হোম, এই ভাবে ধরিলে যাগটি একদিনে নিষ্পাদ্য বলা যায়। আবার যদি আগের দিনের সায়ন্তন হোম হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী দিনের প্রভাতের হোম পর্যন্ত সময় গণনা করা যায় তাহা হইলে ইহা দুইদিনে নিষ্পাদ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইভাবে মতবিরোধের সূচনা হইল। তখন নামগোত্র-হীন এবং কেবলমাত্র 'কুমারী' নামে উল্লিখিত এই বিদুষী নারীর নিকট এই বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ উপস্থিত হইলেন।

তিনি দ্বিতীয় মতটি (দুইদিন) সমর্থন করিলেন এবং দেখাইলেন যে সায়ন্তন হোম সূর্যাস্তের পর এবং প্রত্যূষের হোম সূর্যোদয়ের পর প্রদত্ত হয়। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে "বড়বা প্রাতিথেয়ী" নামে ঐ যুগের একজন প্রথিতযশা বিদুষী নারীর উল্লেখ আছে।

পিতামাতা যে কেবল বিদ্বান্ পুত্রের কামনা করিতেন তাহা নহে বিদুষী কন্যার জন্মের জন্যও তাঁহাদের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি অংশে (৬—৪—১৮) এই কথা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে বিদুষী কন্যা প্রাপ্তির জন্য পিতামাতার দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত আছে। 'যদি কেহ দীর্ঘায়ুযুক্তা বিদুষী কন্যা লাভ করিতে ইচ্ছুক হন (অথ য ইচ্ছেৎ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত)', তাহা হইলে তিনি তাঁহার পত্নীকে আজ্য মিশ্রিত তিল তণ্ডুল রন্ধন করিয়া সেবন করাইবেন।'

বৈদিক যুগের নারী ঋষিরা যে সুপণ্ডিত ছিলেন সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। প্রকৃতপক্ষে, নারীদের জ্ঞানার্জনের জন্য এই আদর্শ তপস্বী জীবন যাপন এবং ব্রহ্মবাদিনীদের পরম্পরাগত প্রচলন বৈদিক যুগের পরেও লোপ পায় নাই। মহাকাব্যগুলিতেও বিদুষী নারী এবং তপস্বিনীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋষি ও সুপণ্ডিত রাজা জনকের নিকট তপস্বিনী ভিক্ষুনী সুলভার আধ্যাত্মিক আলোচনাটি মহাভারতের একটি অত্যুজ্জ্বল অংশ। রামায়ণে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎরতা ঋষি শবরী সুপণ্ডিত তপস্বিনী (সিদ্ধা তাপসী) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্রৌপদীর রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আলোচনাসমূহ মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে। যোগবাশিষ্ঠে স্বামী শিখিধ্বজের মোহমগ্ন আত্মাকে উদ্দীপিত ও জাগ্রত করিতে রাণী চূড়ালা যে সকল তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। বৈদিক যুগের পরবর্তীকালেও যে ব্রহ্মবাদিনীদের অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল তাহা সংস্কৃত নাটকের পরিব্রাজিকা অর্থাৎ নারী তপস্বিনীদের প্রাচুর্য্যদর্শনে স্পষ্টরূপে অনুমিত হয়। ৪০০ খৃষ্টপূর্বে ভারতভ্রমণকালে মেগাস্থিনিস্ চিরকৌমার্য-পালনরতা অনেক সুপণ্ডিত তপস্বিনীকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সুগভীর তত্ত্বমূলক বিতর্কে ও আলোচনায় যোগদান করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,— 'বহু নারী বিদ্বান্ চিরকুমার পুরুষ ঋষিদের মত চিরকৌমার্য অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রচর্চা করিতেন এবং ঋষিদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন'। (Frag-

ment 40) ঐতিহাসিক Nearchus এবং স্ট্রাবো (Strabo) এই তথ্য উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারিণী রমণী

উক্ত ব্রহ্মবাদিনী ছাড়াও পুরুষদের ন্যায় ব্রহ্মচর্যপালনরতা বহু ব্রহ্মচারিণীর নাম বৈদিত সাহিত্যে এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে উল্লিখিত আছে। যজুর্বেদে (৮—১) কথিত আছে যে ব্রহ্মচর্য সমাপনান্তে যুবতীগণকে যোগ্য যুবকদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইত; 'ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্'। অথর্ববেদের ১১—৫ সূক্তে উল্লিখিত আছে যে রমণীগণ জীবনের দ্বিতীয় আশ্রমে অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন। শাণ্ডিল্য এবং গর্গোর কন্যাগণ মহাভারতে ব্রহ্মচারিণী নামে অভিহিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবাদিনী এবং ব্রহ্মচারিণীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে দ্বিতীয়শ্রেণীর নারীগণ ব্রহ্মচর্য সমাপনান্তে গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিতেন কিন্তু ব্রহ্মবাদিনীগণ চিরকৌমার্য গ্রহণ করিতেন।

ললিতকলাচর্চা এবং বিবিধ জীবিকা

বৈদিক যুগে রমণীদের নৃত্যবিদ্যা, কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইত। যদিও সঙ্গীত এবং নৃত্যকলা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অভ্যাস করিত তথাপি ললিতকলাকে নারীর শিক্ষনীয় বিদ্যা বলিয়াই মনে করা হইত। ইহা বহুবার উক্ত হইয়াছে যে 'নৃত্যং গীতং স্ত্রীণাং কর্ম' অর্থাৎ গান করা ও নৃত্য করা স্ত্রীলোকের কার্য। সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রথম উদ্ভব সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে (৩—২—৪) একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একদা গন্ধর্বগণ দেবতাদের নিকট হইতে সোম অপহরণ করে। দেবতারা তখন চিন্তা করিলেন,—'গন্ধর্বগণ সঙ্গীতপ্রিয় এবং নারীর প্রতি আসক্তিপরায়ণ।' তজ্জন্য তাঁহারা সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সৃষ্টি করিলেন এবং বাগ্‌দেবীকে তাহা শিক্ষা দিলেন। দেবী বাক্ গান গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে তাঁহার বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া গন্ধর্বদের নিকট উপস্থিত হইলেন। গন্ধর্বগণ মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শুনিয়া, নৃত্যলাস্য দেখিয়া এবং অপরূপবেশধারিণী দেবীর রূপে বিমোহিত হইলেন। দেবী তখন অনায়াসেই তাঁহাদের বিমূঢ় অবস্থার সুযোগ লইয়া অপহৃত সোম আনিয়া দেবতাদের প্রত্যর্পণ করিলেন।

উক্ত ব্রাহ্মণের একটি প্রবচন হইতে জানা যায় যে পূর্বকালে সামবেদের উদ্‌গাতা পুরোহিতগণের পত্নীরা যজ্ঞে সামগান করিতেন। পরবর্তীকালে তাঁহাদের পতিগণ যখন সামগান করিতে আরম্ভ করেন তখন পত্নীগণ এই কর্ম হইতে বিরত হয়েন। 'এই উদ্‌গাতা পুরোহিতগণ প্রধানতঃ তাঁহাদের পত্নীগণের কার্য (সামগান) সম্পাদন করেন', (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪—৪—৩—২) তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং মৈত্রায়নী সংহিতায়ও এই প্রথার সমর্থন দৃষ্ট হয়। সীবন, বয়ন, পশমের কাজ, বস্ত্রালংকরণ (Embroidery) প্রভৃতি কাজ নারীগণ অভ্যাস করিতেন এবং এইগুলি স্ত্রীলোকের কলাবিদ্যা বলিয়া সর্বত্র উক্ত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১২—৭—২—১) বলা হইয়াছে, —'তৎ বা এতৎ স্ত্রীণাং কর্ম যৎ উর্ণাসূত্রং কর্ম।' উর্ণা শব্দের অর্থ হইল পশম এবং বয়ন কার্যের জন্য তাহা অত্যাবশ্যক। সূত্র অর্থাৎ সূতা এবং সীবন-কর্মজন্য সূতার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। এই ব্রাহ্মণের একটি উক্তি,— 'মোঘসংহিতা বৈ স্ত্রিয়ঃ' অর্থাৎ রমণীগণ অসার জাঁকজমকপ্রিয়। তজ্জন্য তাহারা অলংকরণশূন্য শোভাহীন বস্ত্রাদি পছন্দ করে না ; নিজেদের সুসজ্জিত ও সুশোভন করিয়া তুলিতে তাহারা সদা সচেষ্ট। এইজন্যই বস্ত্র-অলংকরণের কাজ করিয়া তাহারা নিজেদের পোষাকপরিচ্ছদ সুন্দরতর করিয়া তুলিত। সে যুগে এই অলংকরণ শিল্পটি ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল ; বৈদিক সাহিত্যে তার বহু সুস্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এই (Embroidery) অলংকরণ কর্মকে বলা হইত 'পেশস্করণ'। 'পেশ' শব্দটির অর্থ হইল অলংকরণ, কাপড়ে ফুল তোলা প্রভৃতি কাজ। 'পেশ' শব্দের সমপর্যায়ভুক্ত 'বেশ' শব্দের অর্থ হইল পোষাক। বৈদিকযুগে অলংকরণ শিল্পে সুদক্ষ বালিকা বা নারীকে বলা হইত 'পেশস্করী'। পরবর্তীকালে এই শব্দটির অর্থ দাঁড়াইয়াছিল সুন্দর বর্ণ ও চিত্তাকর্ষক আকৃতি বিশিষ্ট রঙ্গীন পতঙ্গ, যাহাকে চলিত বাংলায় 'কাঁচপোকা' বলে। বৈদিকোত্তর যুগে শব্দটি গৌণ অর্থ বারবনিতা অর্থে ব্যবহৃত হইত কারণ বেশ্যাগণ অত্যন্ত চাকচিক্যময় পোষাক পরিধান করে। নারীগণ যে অতি উচ্চকোটির বস্ত্রালংকরণ কর্মে সুদক্ষা ছিল, তাহা ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে অতিপ্রাচীন ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিপিবদ্ধ আছে। এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের (৩—১১—১০) উক্তি,—'তাহারা তাহাদের বস্ত্রের দুই সীমানায় (পাড়ের কাছে) ফুলতোলা প্রভৃতি অলংকরণ করিত, অঞ্চলদেশে ও বস্ত্রের মধ্যভাগে বিভিন্নবর্ণের সূত্রদ্বারা সুশোভন করিয়া তুলিত।' সুবর্ণ সূত্র, রজত-সূত্র ও রঙ্গীনসূত্র মিশাইয়া রমণীগণ রাজসিংহাসনের ও কাষ্ঠাসনের cushion,

চেয়ারে পৃষ্ঠদেশরক্ষার্থে নরম আস্তরণ (backrest) প্রস্তুত করিতেন; এই সকল উপাধানতুল্য আস্তরণ বা cushionকে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যকুর্চ বলা হইত।

'রজয়িত্রী' নামে অভিহিত নারী রঞ্জক সূতা এবং বস্ত্রাদি রং করিত। মঞ্জুষা (ঝুড়ি) নির্মাণ, রজ্জু তৈয়ারী, তূলা হইতে সূত্র প্রস্তুতি এবং অনুরূপ কুটির শিল্পগুলি সেই যুগে মহিলারাই সম্পাদন করিতেন। শুক্ল যজুর্বেদের ত্রিংশতম অধ্যায়ে তদানীন্তন বৈদিক ভারতে প্রচলিত প্রায় সত্তরটি (৭০) পেশার বা জীবিকার নাম উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে বস্ত্রধৌতি, ঝুড়ি প্রস্তুতি, সুগন্ধি দ্রব্য নির্মাণ, কাজল প্রস্তুতি তরবারির কোষ নির্মাণ, পুত্তলী নির্মাণ, বস্ত্রাদি রং করা, অলংকরণ বা পেশস্করণ প্রভৃতি অষ্টপ্রকার কর্ম বা বৃত্তি কেবল নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

সামরিক প্রশিক্ষণ

সামরিকশিক্ষা দান করার প্রথা নারীদের মধ্যেও যে প্রচলিত ছিল তাহা ঋগ্‌বেদের কয়েকটি মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে রমণীদের অপূর্ব বীরত্বের ও যুদ্ধকর্মের বহু উদাহরণও পাওয়া যায়। এমনকি খ্যাতনামা রাজন্যবর্গের মহিষীগণও রণাঙ্গনের পুরোভাগে নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করিতেন। রাজা নমুচির আদেশে তাঁহার মহিষী অতি ভয়ঙ্কর এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা খেলের রানী বিশ্‌পলার বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলী ঋগ্‌বেদের আশ্বিনসূক্তে (১—১১৬) বর্ণিত আছে। একদা যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনামুখে অবস্থান করতঃ শত্রুসেনার সহিত ঘোরযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময় তিনি উরুতে গুরুতর আঘাত পাইলেন, ফলে তাঁহার একটি (আহত) উরু অস্ত্রোপচারে শরীর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছিল এবং লৌহনির্মিত একটি কৃত্রিম উরু তাঁহার দেহে অস্ত্র চিকিৎসকগণ কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছিল। ঋক্‌সংহিতার ১—১১৬—১৫ মন্ত্রে এই ঘটনাটি বলা আছে। এই মন্ত্রটি বৈদিকযুগের নারীর সামরিকশিক্ষা গ্রহণের ও বীরত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ। সে যুগের অস্ত্রচিকিৎসকগণের নৈপুণ্যের সাক্ষীও এই মন্ত্র। মুদ্‌গলানী নামে অপর একজন ভয়লেশশূন্য রণপণ্ডিত বীরাঙ্গনা সামরিক প্রশিক্ষণ ও রণচাতুর্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ। বৈদিকযুগের বীরাঙ্গনাদের মধ্যে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে চিরভাস্বর হইয়া আছে ও থাকিবে। তিনি ছিলেন মুদ্‌গলের স্ত্রী। মহাভারতের অসীমসাহসী বীর রমণী সুভদ্রার ন্যায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার

পতির রথ চালনা করিয়া ও যুদ্ধ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও রথ চালাইয়া তিনি তাঁহার স্বামীর শত্রু নিপাত করিতে সমর্থ হয়েন; অনুসরণকারী শত্রুসেনাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। দ্রুত অনুসরণ করিয়া তিনি পলায়নরত বহু শত্রুসৈন্যকে একাকী বন্দী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঋক্‌সংহিতার ১০—১০২—২ মন্ত্রে নির্ভীক দুর্জয়সাহসী দৃঢ়চিত্ত মুদ্‌গলানী কর্তৃক শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন এবং বীরত্বসূচক যুদ্ধের সুন্দর বর্ণনা আছে। "রথচালনাকালে তাঁহার বস্ত্র রথবেগবশে স্ফীত হইয়া বাতাসে উড়িতেছিল। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় তিনি হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে নিরতা অদমনীয়া এই বীর মহারথী হইলেন—মুদ্‌গলানী। তিনি বহু শত্রু বন্দী করিয়া যুদ্ধজয়ের পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ঋক্‌সংহিতার এই সূক্ত হইতে ও অন্য কয়েকটি সূক্ত হইতে আমরা জানিতে পারি দাসবর্ণের অনার্যদের সৈন্যবাহিনীতে বহু স্ত্রীসৈন্য থাকিত। দাসবর্ণের সক্ষম রমণীগণ প্রচুরসংখ্যায় সামরিকবাহিনীতে যোগ দিত এবং যুদ্ধ করিত। এই বেদের অপর এক মন্ত্রে জনৈক আর্য যোদ্ধা বলিতেছেন,—'স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে কিং মা করন্নবলা অস্য সেনা?' অর্থাৎ দাসজাতি তাহাদের স্ত্রীলোকদের অস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধে (সৈন্যদলে) নিযুক্ত করে; তাহাদের অবলা স্ত্রীসেনা আমার কি ক্ষতি করিবে? ইন্দ্রদেবতার বহুসূক্তে কথিত আছে যে অসুর বৃত্রের মাতা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং ইন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াছিল। ঋক্‌সংহিতার আরও কতকগুলি সূক্তে ও কতিপয় মন্ত্রে আর্য নারীদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপ ও যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতার কথা দৃষ্ট হয় যথা, ঋক্‌সংহিতা ৫—৬১; ৫—৮০—৬; ৭—৭৮—৫; ৮—৩৩—১৯; ৮—৯১ প্রভৃতি সূক্ত ও মন্ত্র।

বৈদিকোত্তর যুগেও রমণীসমাজে সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিস গুপ্তসম্রাট্‌ চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদরক্ষী তরবারিধারিণী ও ধনুর্বিদ্যা সুদক্ষা বলবতী রমণীবাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে 'শাক্তিকী' নামে বর্শা বা বল্লমনিক্ষেপকারিণী নারীদের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপসংহার

উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে বুদ্ধিনিষ্ঠ, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ললিতকলাবিষয়ক, যুদ্ধবিদ্যা, শরীরচর্চা প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষা বৈদিকযুগের রমণীগণ লাভ করিতেন। বস্তুতঃ বৈদিকোত্তরযুগ অপেক্ষা বৈদিকযুগেই সর্বতোমুখী স্ত্রীশিক্ষার প্রমাণ ও সর্বাধিক উন্নতি দৃষ্ট হয়। ধর্মসূত্র ও মনুসংহিতার যুগ হইতেই নারীশিক্ষার এই সমুন্নত প্রতিষ্ঠাভূমি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। নারীসমাজের অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাকে; এমনকি শূদ্রদের ন্যায় উচ্চবর্ণের নারীদেরও উপনয়ন ও বেদপাঠে অধিকার লুপ্ত হয়। নারীসমাজের এই ক্রম অবনতির জন্য মূলতঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ সমূহ দায়ী।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ঋগ্‌বেদীয় যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি

ঋগ্‌বেদে আমরা তদানীন্তন সমাজ ও সংস্কৃতির যে চিত্র পাই এ অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এই আলোচনা হইতে পাঠকগণ সেই সুপ্রাচীনকালে সমাজ ও সভ্যতার মান কিরূপ উন্নত ছিল তাহার পরিচয় পাইবেন।

বাসস্থান :—বৈদিকযুগের অধিবাসীদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল এই বিষয়টি লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা, তর্ক-বিতর্ক দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে তাহাদের আদি বাসস্থান গিল্‌গিট অঞ্চলে ছিল; আবার কোন কোন পণ্ডিত অতীতের সরস্বতীনদীরাজিত সুবাস্তু জনপদই আর্যদের আদি নিবাস বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদে আমরা কোন সঠিক নগরী বা স্থানের নাম পাই না। অনুমান প্রমাণের দ্বারা কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই বেদের সপ্তম মণ্ডলে কতকগুলি নদীর নাম পাওয়া যায় এবং দশম মণ্ডলের ১০—৭৫—৫ মন্ত্রে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রী, পরুষ্ণ্যা, অসিক্ন্যা এবং বিতস্ত নদীর নাম পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে সিন্ধু নদীরও উল্লেখ আছে এবং এই শুতুদ্রী, বিতস্ত ও অসিক্ন্যা নদীই বর্তমানে শতদ্রু, বিপাশা ও চেনাব নামে পরিচিত। উক্ত মন্ত্রে কীর্তিত নদীসমূহের মধ্যে সরস্বতী অধুনা রাজপুতনার মরুভূমিতে বিলুপ্ত। এই বেদের উদ্ধৃত ঐ একটি মন্ত্রেই গঙ্গার নাম পাওয়া যায়। আমরা অনুমান করিতে পারি যে আর্যগণ এই নদীসমূহের নিকটে বাস করিতেন। সেই স্থানই পাঞ্জাব অথবা পঞ্চনদীর দেশ—এই মত বহু পণ্ডিত সমর্থন করেন। মনুসংহিতায় প্রদত্ত আর্যাবর্তের ভৌগোলিক সীমান্ত এই মত সমর্থন করে। দশম মণ্ডলে অর্থাৎ এই বেদের শেষ মণ্ডলে গঙ্গার নাম পাওয়া যায়, অন্যত্র নহে, তাহা হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে তাঁহারা অনেক পরে আদি নিবাস হইতে গঙ্গার উপত্যকার দিকে আসিয়াছিলেন। উপরন্তু এই বেদের কোন স্থানেই ধান্যের উল্লেখ নাই, কিন্তু যবের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। কেবল 'ধানা' শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ভিন্ন। ঋগ্‌বেদের পরে প্রকাশিত অথর্ববেদে ধান্যের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে আর্যগণ তখন ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং ধান্যক্ষেত্র তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। "ঐতরেয়া-

লোচনম্" নামক তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সুদীর্ঘ ভূমিকায় আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন বেদবিদ্বান্ আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী বেদে কীর্তিত পাঞ্জাবের সুবাস্তু জনপদই আর্যদের আদি নিবাস ছিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গ্রাম ও নগর :—ঋগ্‌বেদে গ্রাম ও নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলে আমরা একটি মন্ত্র পাই যেখানে 'গ্রাম' শব্দটির স্পষ্ট ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।

"ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহেমতীঃ।
যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্ ॥

(১—১১৪—১)

"মহান বীরগণের অধিপতি, করাল রুদ্রের স্তুতি করিতেছি। দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবজন্তু সুখী হউক। এই গ্রামবাসীগণ নীরোগ হইয়া পুষ্টিলাভ করুক।" আবার প্রথম মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশৎ সূক্তের দশম মন্ত্রে গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় 'অসি গ্রামেধবিতা পুরোহিতোৎসি যজ্ঞেষু মানুষঃ', অর্থাৎ 'মনুষ্যের হিতের নিমিত্ত তুমি গ্রামের রক্ষক ও যজ্ঞে তুমি পুরোহিত।' এইরূপ ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রের তাৎপর্য হইতে আমরা ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে বৈদিক আর্যগণ গ্রামে দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতেন। এই বেদের কোন কোন স্থানে আবার লৌহ-নির্মিত গৃহেরও উল্লেখ পাওয়া যায়—"প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ" (৭—৯৫—১); অর্থাৎ "লৌহ নির্মিত নগরীর ধারিণী হইয়াও এই সরস্বতী দেবী জলের সহিত গমনশীলা।" সপ্তম মণ্ডলেও তাদৃশ উদ্ধৃতি দৃষ্টিগোচর হয়—"অধা মহীন আয়স্যানাধৃষ্টো নৃপীতয়ে। পূর্ভবা শতভুজিঃ" (৭—১৫—১৪) অর্থাৎ "হে দুর্ধর্ষ অগ্নি, তুমি মনুষ্যগণের-রক্ষার নিমিত্ত লৌহ-নগরী নির্মাণ কর।" এই উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহে আমরা তদানীন্তন যুগের প্রাচীর পরিবেষ্টিত লৌহনির্মিত দুর্গের ইঙ্গিত পাই।

বিবিধ জীবিকা :—ঋগ্‌বেদের যুগে আর্যগণের কৃষি ও গো-পালন জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল। বেদের বিখ্যাত 'অক্ষ' সূক্তে দ্যূতক্রীড়ার নিন্দা ও কৃষিকার্যের প্রশংসা শ্রুত হয়। এই সূক্তে কৃষিকার্য ও দ্যূতক্রীড়ার তুলনামূলক মূল্যায়ন দৃষ্ট হয়। ঋষি বলিতেছেন,—

"অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহুমন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ ॥"

(১০—৩৪—১৩)

অর্থাৎ "পাশা খেলিও না, কৃষিকার্য কর। কৃষিকার্য করিলে বহু সম্মান ও বিত্ত লাভ করিবে। রে দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি, কৃষিকার্যেই তোমার গাভী, জায়া লাভ হইবে,—সবিতাদেব এই তত্ত্ব আমাকে বলিতেছেন।"

'পূষন' সূক্তেও পূষা দেবতাকে স্তুতি করা হইয়াছে,—"পূষনদেব আমাদের গোধন রক্ষার্থে গমন করুন। তিনি আমাদের অশ্বসমূহকে তস্কর হইতে রক্ষা করুন।" (৬—৫৪—৫)। গো, মহিষ, অশ্ব, মেষ, ছাগল এবং বিশেষভাবে দুগ্ধবতী গাভীর উদ্দেশ্যে অনেক স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়।

আর্যগণ শস্য উৎপাদন করিতে জানিতেন। শস্যক্ষেত্রে তাঁহারা কৃত্রিম জলপ্রণালীর বা সেচের ব্যবস্থাও করিতেন। বেদে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যকৃত এই উভয়বিধ জলপ্রণালীর উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"যা আপো দিব্যা উতবাস্রবন্তি খনিত্রিমা উতবা যাঃ স্বয়ংজাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥"

(৭—৪৯—২)

এই মন্ত্রে 'খনিত্রিমা' শব্দে কৃত্রিম জলসেচ প্রথা ও 'স্বয়ংজা' শব্দে প্রাকৃতিক জলসেচ প্রথা বুঝাইতেছে। এই বেদের ৩—৪৫—৩ প্রভৃতি মন্ত্রেও জলসেচ প্রথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

রথনির্মাণ :—রথনির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা ছিল। যুদ্ধযাত্রা, দৈনন্দিন গমনাগমনের বাহনরূপে রথেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই বেদের বহু মন্ত্রে রথের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন দেবদেবীগণ রথে গমন করেন। অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ রথ টানিত। একটি মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন, "গোতমো ইন্দ্রনব্যমতক্ষৎ" (১—৮২—১৩); অর্থাৎ "রথকার যেমন রথের বিভিন্ন অংশ নির্মাণ করিয়া পরে সংযুক্ত করেন তদ্রূপ গোতম ঋষি এই নতুন মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।" সমাজে রথকারগণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এই গ্রন্থের 'যজ্ঞ' শীর্ষক অধ্যায়ে রাজার অভিষেক প্রথার আলোচনাকালে আমরা দেখাইয়াছি যে সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে যাঁহাদের অনুমতি রাজাকে লইতে হইত সেই রাজকর্তা বা "রত্নিন্"দের মধ্যে রথকারদের নামও অথর্ব-বেদে দৃষ্ট হয়। প্রথমে রথকারগণ বর্ণে শূদ্র ছিল কিন্তু যজুর্বেদের যুগে তাহারা বৈশ্যের স্তরে উন্নীত হয় এবং অগ্ন্যাধানের অধিকার লাভ করে। সুবর্ণনির্মিত রথের উল্লেখও ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া যায়।

পথ নির্মাণ :—ঐ যুগেই আর্যগণ রাস্তা নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। সবিতার মন্ত্রে (১—৩৫—১১) উত্তম পথের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—'যে তে পন্থাঃ

সবিতঃ পূর্ব্যাসঃ অরেণবঃ সুকৃতাঃ' অর্থাৎ 'ধূলিশূন্য সুনির্মিত পথ'। ঋগবেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজপথ, মহাপথ ও স্রুতি—তিনপ্রকার পথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; ইহার মধ্যে রাজপথকে সুবিশাল ও দস্যুতস্করাদি উপদ্রবশূন্য বলা হইয়াছে। এই সংহিতার বহু মন্ত্রে পথের উল্লেখ আছে।

স্বর্ণ শিল্প :—ঋগবেদের মন্ত্র হইতে সুপ্রমাণিত হয় যে সেই সময়ে স্বর্ণের প্রাচুর্য ও যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। সবিতা, অপাং নপাৎ প্রভৃতি দেবতাগণের বর্ণনায় স্বর্ণ নির্মিত রথ (হিরণ্যয়েন সবিতা রথেন), স্বর্ণের অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রে ঋষি ইন্দ্রের বজ্রের বর্ণনা দিয়াছেন,—"ত্বষ্টা যদ্ বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ৎ," অর্থাৎ ইন্দ্রের সেই স্বর্ণময় সহস্রক্ষুরধারযুক্ত উত্তমরূপে নির্মিত বজ্র যাহা ত্বষ্টা নিজে নির্মাণ করিয়াছিলেন। সবিতা ও অপাং নপাৎ (বিদ্যুৎ) এই দুই দেবতার সূক্তে হিরণ্যহস্ত, হিরণ্যমুখ, হিরণ্যচক্ষু, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যদেহের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। দুই একটি মন্ত্রে 'সুনিষ্ক' (৪—৩৭—৪), 'নিষ্কগ্রীবঃ' (৫—১৯—৩), সুবর্ণ মুদ্রার সুবর্ণ অলঙ্কারের এবং ৮—৪৭—১৫ ঋকে সুবর্ণনিষ্কের উল্লেখ আছে। রৌপ্যমুদ্রার উল্লেখও ৫—৩৩—৬ ইত্যাদি মন্ত্রে পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রে রজতমুদ্রাকে "শ্বেতবর্ণাং রয়িম্" বলা হইয়াছে। সেই যুগে রমনীগণ বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিতেন। ঋগ্‌বেদে স্বর্ণবলয় (৭—৫৬—১৩), সুবর্ণ কবচ (৪—৩৪—৯ ; ৪—৫৩—২), হিরণ্য শিরস্ত্রাণ বা উষ্ণীষ,—'শিপ্রাঃ শমং বিততা হিরণ্ময়ী' (৫—৫৪—১১), হিরণ্যকুণ্ডল (১—১২২—১৪), সুবর্ণ রুক্ম অর্থাৎ স্বর্ণহার 'বক্ষসুরুক্‌মা' (৭ - ৫৬— ১৩) প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কারের স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অশ্বের সুবর্ণনির্মিত পরিচ্ছেদের বর্ণনা ('অশ্বঃ... হেম্যাবান্') ৪—২—৮ মন্ত্রে পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রে পনরটি স্বর্ণকলসের উল্লেখ আছে। স্বর্ণকার কর্তৃক স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতু গলাইবার কথা (৬—৩—৪) মন্ত্রে দেখিতে পাই।

চর্ম শিল্প :—এই বেদের কতগুলি মন্ত্রে চর্ম শিল্পের ও চর্মকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চর্ম শিল্পদ্বারা অনেকে জীবিকা নির্বাহ করিত। ৬—৪৭—২৭ মন্ত্রে গোচর্মাবৃত রথের উল্লেখ আমরা পাই। ৬—৪৮—১৮ মন্ত্রে চর্মনির্মিত দৃতি বা আধারের, ৫—৯—৫ মন্ত্রে চর্মকারের 'ধমাতরী' বা ভস্ত্রা প্রভৃতির উল্লেখ হইতে সেই যুগে চর্মশিল্প কিরূপ উন্নত ছিল তাহার অনুমান করা চলে। চর্মনির্মিত বৃহদাকার জলপূর্ণ মোষকের দ্বারা রাস্তায় জল দেওয়া হইত ('চর্মেব উদভির্ব্যুন্দন্তি ভূম')। সংহিতার পরবর্তী মধ্যবৈদিক যুগ বা ব্রাহ্মণের যুগে শূকরচর্মনির্মিত উপানহের বা জুতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রজ্জু শিল্প :—ঋগ্‌বেদের কতকগুলি মন্ত্রে রজ্জুর উল্লেখ আছে। একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে রজ্জুদ্বারা যেমন কোন দ্রব্যকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখা হয় রাজা তাঁহার রাজ্যকেও তদ্রূপ দৃঢ়ভাবে সংহত করিয়া রাখিবেন। বিদ্যুতের বহু প্রকারের বর্ণনার মধ্যে রজ্জুর উপমাও দৃষ্ট হয়। বর্তমান পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণও বলেন বিদ্যুতের বহুপ্রকার আকৃতির মধ্যে একটি আকৃতি বহুসূত্র সম্বলিত রজ্জুর সমতুল্য।

লৌহ শিল্প :—কতিপয় মন্ত্রে বিবিধ লৌহশিল্পের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লৌহ নির্মিত নগরীর (আয়সী পুঃ) বর্ণনা আছে। বিচ্ছিন্ন অঙ্গে লাগাইবার জন্য লৌহ নির্মিত অঙ্গ ব্যবহার করা হইত। বীররমণী বিশ্‌পলার যুদ্ধে জঙ্ঘা ভঙ্গ হয়; সেই আহত জঙ্ঘা অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার স্থানে লৌহ-নির্মিত জঙ্ঘা ('আয়সীং জঙ্ঘাম্') লাগান হয়, (১—১১৬—১৫); এই মন্ত্রটিতে বৈদিক যুগের উন্নত শল্যচিকিৎসা ও রমণীর বীরত্ব যুগপৎ সুপ্রমাণিত। নানারূপ যুদ্ধাস্ত্রও লৌহ হইতে নির্মাণ করা হইত। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে লৌহকে কৃষ্ণায়স বলা হইত। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নখ কাটার নরুণকে 'কাষ্ণা´য়স নখনিকৃন্তন' বলা হইয়াছে।

সূচীকর্ম ও বয়ন শিল্প :—সূচীকর্ম ও বয়নশিল্পের উল্লেখ ঋক্‌মন্ত্রে পাওয়া যায়। সপ্তম মণ্ডলের ৩৩—৯ মন্ত্রে "যমেন ততং পরিধিং বয়স্তোঽপ্সরস উপসেদুর্বশিষ্ঠাঃ"—বাক্যে বয়নের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত মণ্ডলের ঐ সূক্তের দ্বাদশ সংখ্যক মন্ত্রেও বয়ন কর্মের কথা বলা হইয়াছে। দশমমণ্ডলের একসপ্ততিতম সূক্তে ভাষা শিক্ষার প্রকৃত রীতির উল্লেখ অনন্তর নবম মন্ত্রে (১০—৭১—৯) বলা হইয়াছে,—'যে ব্যক্তি ঠিকমত ভাষাশিক্ষা করিতে অক্ষম তাহার কৃষিকার্য অথবা বয়নকার্য করা উচিত।' বেদের ব্রাহ্মণ যুগে অর্থাৎ মধ্যবৈদিকযুগে সূচীকর্ম, পশমের কাজ ও পেশস্করণ বা বস্ত্রে অলঙ্করণ কর্ম কিরূপ উন্নত ছিল এই গ্রন্থের 'বৈদিক ভারতে স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে তাহার সপ্রমাণ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

পূর্তকর্ম :—গৃহনির্মাণ, দুর্গনির্মাণ, গ্রামপরিকল্পনা, পুষ্করিণীখনন, নলকূপ, কৃত্রিম সেচপ্রথা প্রভৃতির উল্লেখ এই বেদে থাকায় পূর্তকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থপতিবিদ্যা উন্নত প্রকারের ছিল। ৭—৩—৭, ৭—১৫—১৪, ৮—১০০—৮ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তরনির্মিত নগর ও গৃহনির্মাণের উল্লেখ আছে। লৌহনির্মিত দুর্গ বা নগর (আয়সী পুঃ), নিরানব্বইটি (৯৯) দুর্গ (নবনবতী পুঃ) প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৬—৪৬—৯ ঋকে 'ত্রিধাতু গৃহ' শব্দে তিনপ্রকার

ধাতুর দ্বারা নির্মিত গৃহের কথা বলা হইয়াছে। সহস্রস্তম্ভবিধৃত অট্টালিকা ২—৪১—৫ মন্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে, 'রাজানাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে। সহস্রস্থূণ আসাতে।' মিত্রদেবতার সহস্রস্তম্ভধৃত সদনের উল্লেখ, 'ইন্দ্রং হুবে পূতদক্ষং মিত্রং চ সহস্রস্থূণম্'—মন্ত্রে দেখিতে পাই। মনুষ্যের পানীয়জল সংরক্ষণজন্য বৃহদাকার চৌবাচ্চার এবং গৃহপালিত পশুগণের পানীয়জল রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার জলাধার নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। ৪—৩২—২৩ মন্ত্রে পুত্তলিকাশোভিত রঙ্গমঞ্চের বর্ণনা আছে। সেতু নির্মাণের প্রমাণরূপে ৭—৮৫—৩ ও অন্যান্য মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। অশ্বধাবন বা ঘোড়দৌড়ের যোগ্য ময়দানের কথা ৯—৯৭—২০, ১০—১৫৬—১ প্রভৃতি মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কৃত্রিম জলসেচ নির্মাণের কথা পূর্বেই কৃষিকার্যসূত্রে বলা হইয়াছে। পুষ্করিণী খননের উল্লেখও পাওয়া যায়। ১০—১০৭—১০ মন্ত্রে "ভোজস্যেদং পুষ্কররিণীব বেশ্ম পরিষ্কৃত দেবমানেব চিত্রম্" উক্ত হইয়াছে। ১—৮৫—১০ মন্ত্রে আমরা নলকূপের স্পষ্ট উল্লেখ পাই। এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "উর্ধ্বং নুনুদ্রে অবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্ বিভিদুর্বি পর্ব্বতম্", অর্থাৎ মরুদ্ দেবতাগণ পৃথিবী ভেদ করিয়া 'অবত' নামক যন্ত্র বসাইয়া অধোদেশ হইতে জল আনয়ন করিয়াছিলেন।

পোত-নির্মাণ :—ঋগবেদীয় যুগে আর্যগণ যে উন্নত ধরণের পোত নির্মাণে সুদক্ষ ছিলেন বহু মন্ত্র তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য দান করে। এই বেদে সমুদ্র যাত্রা ও সামুদ্রিক পোতের একাধিক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১০—১৪৩—৪৫, ৭—৬৮—৭ প্রভৃতি মন্ত্রে সামুদ্রিক পোতের কথা উক্ত হইয়াছে। সমুদ্রগামী পোতগুলি অতিদৃঢ়ভাবে নির্মাণ করা হইত যাহাতে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে বা লবণাক্ত জলের স্পর্শে পোতগুলির কোন ক্ষতি না হয়। একশত দাঁড়ের বা অরিত্রের দ্বারা পরিচালিত সামুদ্রিক জাহাজের বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—"শতারিত্রাং নাবম্ আতস্থিবাং সম্"। ১—২৫—৭ মন্ত্রে বরুণদেবতার স্তুতি সূত্রে ঋষি বলিতেছেন, "বেদা যো বীণাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাম্ বেদনাবঃ সামুদ্রিয়ঃ" —অর্থাৎ "বিহঙ্গগণের অন্তরীক্ষে উর্ধ্বতম গতিরেখা ও সামুদ্রিক পোতের সমুদ্রে সুদূর গতিপথ সমস্তই বরুণদেবতা জানিতে পারেন।" ঋগবেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে ও অন্যান্য স্থানে জলযান রূপে নৌকার বহু উল্লেখ আমরা পাই। ইন্দ্রের নৌকারোহণের বর্ণনা কয়েকটি মন্ত্রে আছে। যে সকল সুনির্মিত দৃঢ় নৌকায় বিশাল নদী অনায়াসে পার হওয়া যায় তাহাকে "সুতর্মা নৌঃ" বলা হইত। ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে

যে তদানীন্তন আর্যগণ লবণাক্ত সমুদ্রে পানীয় জল অপ্রাপ্য বলিয়া যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় জল এবং বহুদিনের খাদ্য সঙ্গে লইয়া সামুদ্রিক পোতে দীর্ঘ-কালের জন্য সমুদ্র যাত্রা করিতেন। বৃহদাকার সামুদ্রিক নৌকাকে "ঐরাবতী নৌঃ" বলা হইত (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩—২৯—৫)। উপরের আলোচনা হইতে বৈদিক যুগে আর্যগণের পোতনির্মাণ শিল্প কিরূপ উন্নত ছিল তাহা পাঠকবৃন্দ অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন।

অস্ত্রনির্মাণ বিদ্যা:--বিবিধপ্রকারের অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ এই বেদে আমরা পাই। তদানীন্তন আর্যগণ নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে সুদক্ষ ছিলেন। ইন্দ্রের একহাজার ক্ষুরযুক্ত বজ্রের বর্ণনা একটি মন্ত্রে দৃষ্ট হয়; ত্বষ্টা নিজে একহাজার ক্ষুরযুক্ত স্বর্ণের বজ্র ইন্দ্রের জন্য নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন (ত্বদ্ যদ্ বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ৎ), লৌহনির্মিত বজ্রের বর্ণনা ১—৫২—৮, ১—৮১—৪, ১০—৯৬—৩ প্রভৃতি মন্ত্রে রহিয়াছে। লৌহ, স্বর্ণ ও প্রস্তর তিন প্রকারের ধাতু হইতে অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হইত। ৭—৮৩—১ ঋকে পর্শু বা কুঠার, ৫—৫২—৬, ৫—৫৭—২ ও অন্যান্য বহু মন্ত্রে ধনুকের, ৫—৫৭—২ ও অন্য অনেক ঋকে ইষু বা তীরের উল্লেখ এবং ৬—৩—৫, ৬—৪৭—১১, ১২ প্রভৃতি মন্ত্রে বিবিধ লৌহ অস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঋষ্টি, বর্শা, বাশী বা খড়গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রও ব্যবহৃত হইত। লৌহবর্ম, নিষঙ্গ প্রভৃতির উল্লেখও ঋক্ সংহিতায় দৃষ্ট হয়।

জ্যোতির্বিদ্যা:—সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর আবর্তন, ঋতুসকল, জোয়ারভাটা ইত্যাদির তথ্য ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া যায়। ১—৩৫—৬ মন্ত্রে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্র ও গ্রহাদির অবস্থিতির উল্লেখ আছে। ১০—১১০—৯ ঋকে সূর্য হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি ও উত্তাপের শীতলতা সম্পাদনের কথা আমরা পাই। বহু মন্ত্রে পৃথিবীর আবর্তনের উল্লেখ আছে যথা ৩—৩০—৯, ৫—৩২—৯, ৫-৮৪—১, ৭—৩৫—৩ প্রভৃতি মন্ত্র। ১—৮৪—১৫ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সূর্য চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়। পরবর্তীকালে বেদাঙ্গ নিরুক্তের স্পষ্ট উক্তি "সূর্যের দীপ্তি চন্দ্রকে দীপ্ত করে"। দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে ঋষি চন্দ্রের প্রভাবকে সাগর ও নদীর জোয়ার-ভাটার কারণ বলিয়াছেন। ১—১৬৪—১২ মন্ত্রে সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভ ও নভস্য নামে ছয়ঋতুর নাম ঋক্ সংহিতায় পাওয়া যায়। ১—৯৫—৩ মন্ত্রমতে ছয়ঋতুর কারণ হইল সূর্যের গতি। ১—১৬৪—৪৮, (ত্রিশতাষষ্টিঃ)

প্রভৃতি মন্ত্রে তিনশত ষাটদিনে একবৎসর হয়, বলা আছে। সবিতাদেবের উদ্দিষ্ট প্রথমমণ্ডলের পঞ্চত্রিংশত্তম সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কয়েকজন জ্যোতির্বিদ্ গণিতশাস্ত্রনিষ্ণাত পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন তদানীন্তন আর্যদের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা অতি উন্নতস্তরের ছিল। ভারতে স্বনামধন্য বালগঙ্গাধর তিলক ও কেট্‌কার এবং জার্মানীর যাকবি (Jacobi) তাঁহাদের গ্রন্থে ঋকসংহিতার বহু মন্ত্রের জ্যোতিষ তত্ত্ব ও গণিত-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩—১৪), সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে (৫—৩১—১, ২, ৩) এবং অথর্ব-বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে (২—৪—১০) দ্ব্যর্থহীন বিস্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে, "সূর্য কখনও অস্ত যায়না ; সূর্য সদা ভাস্বর। যখন আমরা মনে করি সূর্য অস্ত গিয়াছে, রাত্রি হইয়াছে, তখন পৃথিবীর অপরাংশে সূর্য বিরাজ করে, কখনও সূর্য অস্ত যায়না।"

খাদ্য :—ঋক্‌সংহিতার কোথাও ধান্যের বা ব্রীহির উল্লেখ নাই। অথর্ব-বেদে ধান্যের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। "ব্রীহিমত্তং যবমত্তমথো মাষমথো তিলম্" এই অথর্বমন্ত্রে (৬—১৪০—২) ব্রীহি, যব, মাষ, ও তিলের উল্লেখ রহিয়াছে। অথর্ববেদের যুগে আর্যগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া ধান্যক্ষেত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহা প্রতীত হয়। ঋগবেদে যবের উল্লেখ বহুস্থানে আছে। ঘৃতদ্বারা ভর্জিত যবকে 'ধানা' বলা হইত। গোবলীবর্দদ্বারা যবের চাষের কথা প্রথম মণ্ডলে দেখিতে পাই। 'গোভির্যবং ন চর্কৃষৎ' (১—২৩—১৫), দেবতার উদ্দেশ্যে 'অপূপ' বা পিষ্টক, করম্ভ প্রভৃতি অর্পণ করা হইত। মাখন বা দধিমিশ্রিত ভর্জিত যবচূর্ণকে করম্ভ বলা হইত। তৃতীয় মণ্ডলের একটি মন্ত্রে করম্ভ, ধানা ও অপূপের উল্লেখ আছে—

"পূষন্বতে তে চকৃমা করম্ভং হরিবতে হর্যশ্বায় ধানাঃ।
অপূপমদ্ধি সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহাশূর বিদ্বান্ ॥"
(৩—৫২—৭)

সেই যুগেও খাদ্যহিসাবে মাংসের প্রচলন ছিল। যজ্ঞকর্মেও মাংসের আহুতি দিতে হইত। চারিপ্রকার যাগের মধ্যে পশুযাগ নামক যজ্ঞে ছাগ প্রভৃতি পশুর আলম্ভন বা বধ বিহিত ছিল। অশ্বমেধে অশ্ব এবং গোমেধে বন্ধ্যাগাভী বা ষণ্ডবধ করিতে হইত। পঞ্চম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "দেবগণ

তিনশত মহিষের মাংসদ্বারা ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন— "সখা সখ্যে অপচত্তূয়মগ্নিরস্য ক্রত্বা মহিষা ত্রীশতানি" (৫-২৯-৭)। এই মন্ত্রে প্রমাণিত হয় মহিষের মাংসও খাদ্যমধ্যে গণ্য ছিল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, উপনিষদ্ ও গৃহ্যসূত্রের বহু উক্তি প্রমাণ করে যে মধ্যবৈদিক ও উত্তরবৈদিক যুগে খাদ্যরূপে গোমাংসের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১—৩—৪) ও শতপথ ব্রাহ্মণে (৩—৪—১—২) বিধান আছে যে রাজা বা ব্রাহ্মণ অতিথি গৃহে আসিলে একটি বড় ষাঁড় অথবা পুং ছাগ বলি দিবে অথবা একটি বন্ধ্যা-গাভী, শতপথে (৩—১—২—২১) ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "অশ্নামি এবামহমংসলং চেৎভবতি' অর্থাৎ 'গোমাংস যদি কোমল হয় তবে তাহা আমি ভোজন করিব'। গোভিল প্রভৃতি গৃহ্যসূত্রের স্পষ্ট বিধান শ্রাদ্ধে গোমাংসদ্বারা "মাংসাষ্টকা" ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

পানীয়ঃ- সেই যুগে দুগ্ধ, মধু, জল, সোম, সুরা পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশ্যে সোমরস অর্পণ করা হইত এবং যজ্ঞাবসানে পুরোহিতগণ হুতশেষ অর্থাৎ আহুতি অনন্তর অবশিষ্ট সোমরস পান করিতেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ব্যতীত আর কোন ত্রৈবর্ণিক পুরুষের অথবা যজ্ঞসম্পর্কহীন ব্রাহ্মণের সোমপানের অধিকার ছিল না। অতি দূরবর্তী স্থান হইতে সোমলতা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত এবং যজ্ঞের বিধি অনুসারে তাহার রস নিষ্কাসন করা হইত। ইহা সাধারণের পানীয় পদার্থ ছিল না। বৈদিক যুগেই সোমলতা দুষ্প্রাপ্য ছিল, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সোমলতা অপ্রাপ্য হইলে তাহার পরিবর্তে পূতিকা নামক লতার রস আহুতির বৈকল্পিক ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যজ্ঞের বিধি অনুসারে সংগৃহীত পবিত্র জল, দুগ্ধ বা দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া সোমরস দেবতাকে অর্পণ করা হইত। কেহ কেহ সোমরসকে উত্তেজক মাদক পানীয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থ প্রভৃতি ভাল করিয়া অনুশীলন করিলে সোম যে মাদক দ্রব্য ছিল না ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সোম ও সুরার পার্থক্য, সোমের প্রশংসা ও সুরার নিন্দা অতি স্পষ্ট ভাষায় উক্ত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তি—"সত্যং শ্রীর্জ্যোতিঃ সোমঃ, অনৃতং পাপ্মা তমঃ সুরা" অর্থাৎ "সোম হইতেছে সত্য, শ্রী ও জ্যোতিস্বরূপ কিন্তু সুরা অনৃত, পাপ ও তমোগুণের প্রতীক।" এই জন্য ব্রাহ্মণের সুরা পান, এমন কি সুরাস্পর্শ পর্যন্ত শ্রুতিতে নিষেধ করা হইয়াছে। সুরাপানজনিত উন্মত্ততা ও চিত্তবিকলতার নিন্দা সংহিতায় ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে শ্রুত হয়। সুরা ক্ষত্রিয়ের পেয়রূপে নির্দিষ্ট ছিল। সোমপানে

যজমান ক্ষত্রিয়ের অধিকার না থাকায় তার ক্ষেত্রে সুরাবিহিত। বিবিধ প্রকারের সুরা প্রস্তুত করা হইত। ওষধির রস হইতে একপ্রকার সুরা প্রস্তুত হইত, অন্ন দীর্ঘদিন পচাইয়া রাখিয়া আর একপ্রকার সুরা প্রস্তুত হইত।

ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ :—কয়েকপ্রকারের ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। অশ্বধাবন প্রতিযোগিতা, রথধাবন প্রতিযোগিতা অর্থাৎ ঘোড়দৌড় রথদৌড় প্রভৃতি আর্যদের প্রিয় ছিল। দেবতাদের মধ্যে এই সকল প্রতিযোগিতার বর্ণনা ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। রথধাবন প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে অশ্ববাহিত রথ, গর্দভবাহিত রথ ও অশ্বতর অর্থাৎ খচ্চরবাহিত রথের উল্লেখ আছে। তদানীন্তন সমাজে দ্যূতক্রীড়া বা পাশা খেলার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ইহা হইতে পাশাখেলার সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। বিভীতক বা বহেড়াফল পাশাখেলার গুটি বা সাধনরূপে ব্যবহৃত হইত। ঋক্ সংহিতার অক্ষ সূক্তে (১০-৩৪) দ্যূতাসক্ত ব্যক্তির চরম দুর্দশা বর্ণিত হইয়াছে। সে যে নিজ পত্নীকেও পণ রাখে ও পরাজিত হইলে পত্নীকে বিজেতা লইয়া যায় ও যদৃচ্ছা ভোগ করে ইহাও ১০-৩৪-৪ মন্ত্রে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যুগে সমাজে অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলা এইরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল ও এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে দ্যূতক্রীড়ার জন্য সার্বজনীন ক্রীড়াগার নির্মিত হইত এবং এই দ্যূতক্রীড়াগার পর্যবেক্ষণের জন্য একজন পৃথক রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাকে 'অক্ষাবাপ' বলা হইত। অক্ষসূক্তে দ্যূতাসক্তব্যক্তির ভার্যাপণ, ভার্যাবিচ্ছেদ, বিজেতাকর্তৃক ভার্যাগ্রহণ ইত্যাদি মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়াজনিত সমতুল্য দুর্দশার কথা স্বতঃই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়।

ললিতকলা :—কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত সেই যুগে সুপ্রচলিত ছিল। মণ্ডূক সূক্তে (৭-১০৩-৭, ৮) সোমরস নিষ্কাসনে ব্যাপৃত পুরোহিতগণের গানযুক্ত মন্ত্র ব্যাহরণের উল্লেখ আছে। সংহিতায় ব্যবহৃত গান, গীতি, ও উদ্গান, উদ্গাতা, সংগীত প্রভৃতি শব্দ কণ্ঠসংগীতের বোধক। ঋক্ সংহিতায় বীণা, কর্করি, দুন্দুভি, শততন্ত্রী, বাণ, বংশী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আমরা পাই ; তন্মধ্যে বীণা ও বাণ, এই দুইটি তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্র ছিল। 'বাণ' নামক বাদ্যযন্ত্রে একশত তন্ত্রী থাকিত এবং অত্যন্ত নিপুণ বাদ্যকর ব্যতীত কেহ এই যন্ত্র বাজাইতে পারিত না। সেইজন্য এই যন্ত্র যে বাজাইতে পারিত তাহাকে 'অতি কুশলী' বলা হইত। মরুদ্গণের সূক্তে (১—৮৫—১০) মরুদ্

দেবতাগণ এই 'বাণ' নামক যন্ত্র বাজাইতেছেন বলা আছে ; অর্থাৎ ঝঞ্ঝার সময় বাত্যাতাড়িত বৃক্ষরাজি ও বনানী হইতে যে শব্দ উদ্ভূত হয় তাহা বাণযন্ত্রের শব্দের সমতুল্য। এই সংহিতায় 'আঘটি' নামক করতাল বাদ্যেরও উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ নৃত্যের সংগে এই 'আঘটি' বাজান হইত। যাহারা কণ্ঠসংগীতের সহযোগে বীণা বাজাইত তাহাদিগকে 'বীণাগাথী' বলা হইত। পিচোলা ও ঔদুম্বরী নামক দুইপ্রকারের বীণার উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। কয়েকটি শ্রৌতগ্রন্থেই 'ক্ষোণী' নামক তৃতীয় প্রকারের বীণার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কর্করি নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ ঋক্ সংহিতার ২—৪৩—৩ মন্ত্রে আমরা পাই—'যদুৎপতন্ বদসি কর্করির্যথা বৃহদ্‌বদেম বিদথে সুধীরাঃ।' অর্থাৎ 'হে শকুনি (পক্ষী), তুমি যখন উড্ডীন অবস্থায় তোমার পক্ষদ্বয় সঞ্চালন কর তখন কর্করি-বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় শব্দের সৃষ্টি হয়।' বংশনির্মিত নাড়ী নামক বংশীর কথা ১০—১৩৫—৭ মন্ত্রে পাই। কৃষিপ্রধান তদানীন্তন আর্যসমাজে বংশীবাদন সুপ্রচলিত ছিল।

নৃত্যের উল্লেখ কয়েকটি মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। বংশদণ্ড লইয়া নৃত্যের কথা (১—১০—১) মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হিসাবে নৃত্যের উল্লেখ আছে।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংবাদসূক্তের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে ঋকসংহিতার সংবাদ সূক্তগুলিই নাটকের উৎস বা বীজস্বরূপ। পুরুষমেধে হব্য বা আহুতিযোগ্য পুরুষগণের মধ্যে শৈলূষ বা অভিনেতার নাম পাওয়া যায়। সোমযাগে অনার্যের নিকট হইতে সোমক্রয় ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠান অভিনয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত দান করে। সোমের মূল্য হিসাবে অনার্য ব্যক্তিকে একটি বাছুর দেওয়া হয়। বাছুরটি বাক্ বা শব্দের প্রতীক। তজ্জন্য অনার্য-পুরুষ বাছুরটিকে যখন লইয়া যায় পুরোহিতগণ তখন নির্বাক মূক হইয়া যান। পুনরায় বাকশক্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য একটি বংশদণ্ডের দ্বারা অনার্যব্যক্তিকে তাড়নের অভিনয় করেন এবং বাছুরটি পুনরায় লইয়া আসেন। এই অনুষ্ঠানটিকে কৃত্রিম অভিনয় (mock-drama) বলা যায়।

অপরাধ :—প্রতিযুগেই সাধু ও অসাধু উভয়বিধ ব্যক্তি সমাজে থাকে। আদি বৈদিকযুগেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ঋক্‌সংহিতায় তস্কর, স্তেয় বা চৌর্যকর্ম, মদ্যপায়ী, দ্যূতক্রীড়ায় আসক্তি প্রভৃতির উল্লেখ ও নিন্দা দৃষ্ট হয়। শুক্ল যজুর্বেদে বিবিধ প্রকারের তস্কর ও দস্যুর বর্ণনা রুদ্রসূক্তে পাওয়া যায়।

বিবাহ ঃ— সেই যুগে আর্যগণ বিবাহকে অতি পবিত্র ও প্রয়োজনীয় কর্ম হিসাবে একটি ব্রতরূপে গণ্য করিতেন। এক হৃদয়ের সহিত অপর হৃদয়ের শ্রুতিসম্মত অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্পাদিত পবিত্র বন্ধন ছিল এই বিবাহকর্ম। ঋক্‌-সংহিতায় বিবাহ মন্ত্রগুলি (১০—৮৫) পাঠ ও অনুধাবন করিলে বিবাহ বন্ধনের গভীরতা ও পবিত্রতা, এবং গৃহে ও সমাজে নারীর সম্মানিত উন্নতস্থান অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। নববধূকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত সূক্তে বলা হইয়াছে—

"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু ॥"

(১০—৮৫—৪৬)

অর্থাৎ "তুমি শ্বশুরের উপর সম্রাজ্ঞী হও, শাশুড়ীর উপর সম্রাজ্ঞী হও, ননদের উপর সম্রাজ্ঞী হও ও দেবরের উপর সম্রাজ্ঞী হও।" অন্য একটি বিবাহমন্ত্রে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাইয়া বধূ বরকে বলেন "আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই নক্ষত্র ধ্রুব ; আমিও পতিকুলে ধ্রুব অর্থাৎ চিরতরে বিরাজ করিব।" আবার বর বা পতি অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া বধূকে বলেন,— 'বশিষ্ঠের পাশে যেমন অরুন্ধতী, নারায়ণের যেমন লক্ষ্মী, অগ্নির যেরূপ স্বাহা, ইন্দ্রের যেরূপ শচী তদ্রূপ তুমিও আমার হও।' এই সকল মন্ত্ররাজিতে বিবাহ সম্বন্ধে বৈদিক আর্যগণের তথা সনাতন ধর্মের অতি পবিত্র ও উচ্চ ধারণা সুপ্রমাণিত। অপত্নীক ব্যক্তির যজ্ঞকর্মে অধিকার ছিল না, সপত্নীক যজমানের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করিতে হইত। এই বিষয়ে এবং তদানীন্তন সমাজে স্ত্রীলোকের শিক্ষার উচ্চমান সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে সুতরাং এই পরিচ্ছেদে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে সেই যুগে স্বয়ম্বরপ্রথা ছিল এবং বাল্যবিবাহ বিরল ছিল। ১০—১৭—১১, ১২ মন্ত্রদ্বয়ে স্বয়ম্বর প্রথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতির দুহিতা সূর্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে প্রজাপতি কর্তৃক স্বয়ম্বর সভার আহ্বান, সূর্যার পাণিপ্রার্থী বিবিধ দেবগণের সেই সভায় আগমন এবং সূর্যা কর্তৃক সোম-দেবতাকে পতিরূপে বরণের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

আর্য সমাজে বিবাহ ভগবৎনির্দিষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি বলিয়া বিবেচিত হইত। পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাব, গার্হস্থ্য ও আধ্যাত্মিক কর্মে পরস্পর

পরস্পরের প্রতি সহায় এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা বংশের রক্ষণ এই সমস্তই বিবাহ বন্ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আর্যগণ যে সর্বদা স্বকীয় ঔরসজাত পুত্র-কামনা করিত এবং সেইস্থান যে পোষ্যপুত্রদ্বারা পূরণ হয় না এই তথ্য সপ্তম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে সুব্যক্ত। শক্তিশালী যোদ্ধা পুত্র কামনা করিয়া দেবতাকে স্তুতি করা হইত যে পুত্র যেন আবার সেই একই দেবতাকে তাহার পিতার সহিত যুগ্মভাবে স্তুতি করিতে পারে। পতি কখনও পত্নীর উপর অযথা প্রভাব বিস্তার করিত না বরং জীবনসঙ্গিনী হিসাবে তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিত। সহধর্মিনী শব্দ পত্নীতে সার্থক রূপ পাইয়াছিল।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থরাজির উক্তিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় পুরুষ ইচ্ছা করিলে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারিত অর্থাৎ বহুবিবাহ প্রথা (Polygamy) প্রচলিত ছিল, কিন্তু একজন নারী কখনও একাধিক পতি গ্রহণ করিত না অর্থাৎ নারীর একাধিক পুরুষ গ্রহণ প্রথা (Polyandry) অপ্রচলিত ও নিষিদ্ধ ছিল। ঋক্‌সংহিতার ১০—৪২—২ ও তজ্জাতীয় আরও দুই একটি মন্ত্রে পতি মৃত হইলে স্ত্রীর পুনঃ অপর পতি গ্রহণের অর্থাৎ বিধবা বিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ এই সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একমত হইতে পারেন নাই; অধিকাংশ পণ্ডিত এই সকল মন্ত্রকে বিধবা বিবাহের প্রমাণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অপর পক্ষে কয়েকজন এই মন্ত্রগুলি বিধবা বিবাহের সমর্থন করেনা বলিতে চাহেন। উক্ত মন্ত্রের 'বিধবেব দেবরম্' বাক্যের অন্তর্গত 'দেবর' শব্দটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ 'নিরুক্ত' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে,—'দেবরঃ দীব্যতিকর্মা' ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ যে খেলা করে। যাঁহারা বিধবাবিবাহের সমর্থন এই মন্ত্রে নাই মনে করেন তাঁহারা বলেন খেলা করে এমন শিশুকে লইয়া বিধবা থাকিবেন। দুই একটি নিরুক্তের পাণ্ডুলিপিতে দেবর শব্দের 'দেবরো দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে' এই ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। যাঁহারা এই মন্ত্র বিধবাবিবাহের সমর্থক মনে করেন তাঁহারা এই ব্যাখ্যা ধরিয়াছেন।

বর্ণব্যবস্থা:—ঋক্‌সংহিতায় তৎকালে প্রচলিত কোন বর্ণব্যবস্থার বা বর্ণ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় কিনা ইহা একটি আলোচ্য বিষয়। বর্ণ প্রথার পরোক্ষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই উল্লেখ হইতে তদানীন্তন সমাজে বর্ণপ্রথার প্রচলন প্রমাণিত হয়। পরবর্তী যুগে বর্ণপ্রথার যে কঠিন বন্ধন সমাজে দৃষ্ট হয় তদ্রূপ কোনও সুদৃঢ় প্রথা তখন অবশ্য ছিল না। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কঠিন সীমারেখা ঋকসংহিতার যুগে ছিলনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

বর্ণচতুষ্টয়ের সাধারণ ভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। চারিটি বর্ণের স্পষ্ট উল্লেখ দশমমণ্ডলের বিখ্যাত পুরুষসূক্তে দৃষ্ট হয়—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥"

(১০—৯০—১২)

সৃষ্টিকর্তা পরমপুরুষের মুখ ব্রাহ্মণে পরিণত হইল, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয় হইল, উরুদ্বয় বৈশ্য হইল এবং পদযুগল হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। বৈশ্য ও শূদ্রের বিস্পষ্ট উল্লেখ এই সূক্তে পাওয়া যায়। ঋকসংহিতার অন্যান্য মণ্ডলে 'বিশঃ' শব্দ আছে, বৈশ্য শব্দ পাওয়া যায়না। 'বিশঃ' কথাটির অর্থ সাধারণ প্রজা। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডল ব্যতীত পূর্ব পূর্ব মণ্ডলে চতুর্বর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়না কিন্তু এই মত ভ্রান্ত, কারণ চারিবর্ণের কথা পাওয়া না গেলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ চতুর্থ মণ্ডলের বৃহস্পতি সূক্তের অষ্টম ঋক্ উদ্ধৃত করা চলে,—

"তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবানমন্তে
যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি।"

(৪—৫০—৮)

অর্থাৎ সেই রাজার বিশগণ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অনুগত হন যে রাজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে (সর্বকর্মে) অগ্রবর্তী রাখেন। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বিশের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি—'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ" (৪—১৩) অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী আমার দ্বারা বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্ট হইয়াছে। বৈদিক যুগে গুণের দ্বারা জাতির বিচার হইত, জন্ম বা জাতির দ্বারা গুণের বিচার হইত না।

রাজতন্ত্র ; শাসন ব্যবস্থা :— পরিবারই ছিল সমাজের ভিত্তি এবং সমাজ ছিল রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি। শাসন ব্যবস্থার কাঠামো ছিল পরিবার পরিচালন ব্যবস্থা। সেই যুগে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল ; সেই প্রথার মূলে ছিল পিতাপ্রভাবিত পরিবার প্রথা। রাজাই রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। ঋক্‌সংহিতায় বহু রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। বরুণের সূক্তে তাঁহাকে রাজা, সম্রাট্ প্রভৃতি শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। সোম, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের রাজা ছিলেন। ৭—৩৩—৩, ৭—৮৩—৬ প্রভৃতি মন্ত্রে রাজা সুদাসের সঙ্গে দশজন নৃপতির সমবেতভাবে যুদ্ধ করার বর্ণনা আছে।

বংশানুক্রমে দশপুরুষ ধরিয়া নৃপতিদের রাজ্যশাসনের কথাও বেদে কীর্তিত হইয়াছে। রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। ঋগবেদের বৃহস্পতিসূক্তে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে রাজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পরামর্শ লইয়া রাজ্য পরিচালনা করেন, প্রজাগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে (৪—৫০—৮)। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বৃহস্পতি দেবতা। বৈদিকযুগ হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণই প্রধানতঃ মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

দাস ও দস্যুর কথা এই বেদে বহুস্থানে বলা হইয়াছে। আর্যগণের সহিত তাহাদের প্রায়ই যুদ্ধ হইত। দাস ও দস্যুগণ অনার্য ছিল। ১০—১০২ সূক্তে জানা যায় দাস সৈন্যদলের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রী সৈন্যও থাকিত; অন্য কয়েকটি সূক্তে এই তথ্য পাওয়া যায়।

৭—১৮—২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, নৃপতি যেমন তাঁর পত্নীদের মধ্যে বাস করেন ইন্দ্র তদ্রূপ আলোকরাশির মধ্যে বাস করেন। এই উক্তি বৈদিকযুগের নৃপতিদের বহুবিবাহের সাক্ষ্যদান করে। উত্তর বৈদিকযুগে 'শতপথ' প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা ও পালাগলী নাম্নী চারিজন রানীর বর্ণনা আছে। প্রধান রানীকে বলা হইত মহিষী, প্রিয়তমা রানীকে বলা হইত বাবাতা, নিঃসন্তানা পরিত্যক্তা পত্নীর নাম ছিল পরিবৃক্তা এবং নিম্নবর্ণের রানীকে পালাগলী বলা হইত। এই চারজনের মধ্যে একমাত্র মহিষীর সাংবিধানিক মর্যাদা ছিল।

ধর্ম :—ঋগবেদে ধর্ম নিরপেক্ষ (Secular) সূক্তের তুলনায় ধর্মসংক্রান্ত সূক্তের সংখ্যা অনেক বেশী। ধর্মমূলক সূক্তগুলিতে দেবতাগণের স্তুতি, দেবতাদের নিকট প্রার্থনা দৃষ্ট হয়; আবার কোন কোন সূক্ত যজ্ঞ সংশ্লিষ্ট। ঋগবেদের সূক্তগুলিতে আমরা মনন ও চিন্তার বিবিধ ও বিচিত্রধারা দেখিতে পাই। এই চিন্তাধারার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈদিক ধর্মের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহা ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী এবং ফলপ্রসূ। মন্ত্রগুলি যেমন ছন্দোবদ্ধ কাব্যের উচ্ছ্বাস অন্যদিকে আবার কিছু সূক্ত যজ্ঞমূলক এবং যজ্ঞে প্রযোজ্য। সেই যুগে গৃহপালিত পশু, ঐশ্বর্য, বীরপুত্র, দীর্ঘজীবন, প্রভূত শস্য প্রভৃতির জন্য ঋষিগণ দেবতার নিকট মন্ত্রের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাইতেন। দেবতাকে তাঁহারা স্তুতি করিতেন ও যজ্ঞে আহুতি দান করিতেন, এবং তাহার পরিবর্তে ঐহিক ও পারত্রিক সম্পদরূপে দেবতাগণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেন। দেবতা ও মানুষের মধ্যে শর্তবিহীন সরল প্রাণের পারস্পরিক সম্বন্ধই উদ্দিষ্ট ছিল।

যাজকীয় ধর্ম ; পৌরোহিত্য :—ঋকবেদীয় ধর্মের অপর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা প্রকৃতপক্ষে পুরোহিত শ্রেণীর ধর্ম—উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে বৈদিকধর্ম স্বভাবতঃ যজ্ঞনিষ্ঠ ধর্ম। সমাজে তখন পুরোহিত শ্রেণী অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁহারা রাজা ও দেবতার মধ্যে মধ্যস্থ ব্যক্তিরূপে কর্ম করিতেন। যেহেতু অনিবার্য যুদ্ধাদির ঘোষণা ও বিজয় তাঁহাদের প্রার্থনার উপর নির্ভর করিত তাই পুরোহিতগণ কেবল ধর্মের কেন্দ্রই ছিলেন না, তাঁহারা রাজনীতিরও প্রাণকেন্দ্র ছিলেন। ভগবান তাঁহাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া কোনও নৃপতির অনুকূল হইয়া বিপক্ষকে পরাভূত করিতেন ও এই নৃপতিকে বিজয়-মাল্য দান করিতেন। বহু শতাব্দীব্যাপী গ্রীকদের ধর্মীয় গল্পে আমরা এইরূপ পুরোহিতের প্রভাবের চিত্র দেখিতে পাই। ঋগ্‌বেদে দেখিতে পাই বশিষ্ঠদেব ইন্দ্রকে অনুরোধ করিতেছেন তিনি যেন জনগণের অনুকূলে থাকিয়া বিপক্ষ শত্রুকে ধ্বংসের জন্য তাহাদিগকে সাহায্য ও সৈন্যসামন্ত প্রদান করেন। সেই দেবোদ্দিষ্ট ঐকান্তিক সরল অন্তরের স্তুতি অকৃত্রিম ভক্তিরসাপ্লুত ছিল। হৃদয়ের সহিত ছিল হৃদয়ের ভালবাসা। প্রাণহীন আকৃতি, অনুভূতিহীন কৃত্রিম শব্দাড়ম্বর অথবা মিথ্যাভাষণ প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিলনা।

দেবতা :—ঋগবেদের দেবতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ও বিশেষ করিয়া নবম পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে পুনরায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল বৈদিক দেবতাবাদের একটি বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করিব। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক গ্রীক দেবতা-বাদের সঙ্গে বৈদিক দেবতাবাদকে সমপর্যায়ে ফেলিয়াছেন। আচার্য মাকস্‌মূলার এই শ্রেণীর সমালোচকদের ভ্রান্তি দর্শাইয়া দিয়াছেন। ঋক-বেদের দেবদেবী পূজার ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য যে যখন কোন দেবতার আবাহন ও স্তুতি করা হয় তখন তাঁহাকে ক্ষুদ্র সসীম শক্তিসম্পন্ন দেবতারূপে স্তুতি করা হয় না ; সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর রূপে স্তুতি করা হয়। এই তত্ত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে বেদের দেবতাতত্ত্ব প্রাচীন গ্রীক ধর্মের দেবতাবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাচীন গ্রীক ধর্মে দেবতাগণকে ক্ষুদ্র শক্তি সম্পন্ন এক একজন সসীম ব্যক্তিসত্তারূপে কল্পনা করা হইয়াছে, পরমেশ্বর বা মহাসত্তারূপে কল্পনা করা হয় নাই। তজ্জন্য গ্রীকদেবতাবাদকে Polytheism বা বহুদেবতাবাদ বলা হয়। গ্রীক দেবতাবাদে জিউস (Zeus) নামে দেবরাজ একজন আছেন কিন্তু পৃথক পৃথক দেবতার ব্যক্তিসত্তা

অতিক্রমকারী কোনও সর্বব্যাপী পরমসত্তার ধারণা পাওয়া যায় না। বেদের দেবতাবাদের এই বৈশিষ্ট্যকে মাকস্‌মুলার হিনোথি-ইজম্ (Henotheism) বা কেথিনোথি-ইজম্ (Kathenotheism) সংজ্ঞা দিয়াছেন ; এই সংজ্ঞার অর্থ যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয় তখন তাঁহাকে পরমেশ্বর রূপে স্তুতি করা হয়। দেবতাতত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্য নিম্নোদ্ধৃত বেদমন্ত্রের দ্বারা সমর্থিত। "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" (ঋঃ বেঃ ১—১৬৪—৪৬), অর্থাৎ সেই এক পরমসত্তাকে বিপ্রগণ অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত করেন। "এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উহ্যেব সর্বে দেবাঃ" (শুক্লযজুঃ সংহিতা) ; 'এই পরমেশ্বরেরই বিসৃষ্টি জগৎপ্রপঞ্চ ; এই পরমেশ্বরই সকলদেবতা।' শুক্লযজুর্বেদের আর এক মন্ত্রে আরও স্পষ্ট ভাষায় ঋষি বলিতেছেন—

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদ্ বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥" (৩২-১)

অর্থাৎ 'তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জলদেবতা, তিনিই প্রজাপতি।' বেদের দেবতাবাদের এই মূলতত্ত্ব হিন্দুধর্মে অদ্যাবধি সকল পূজায় রূপায়িত। বিষ্ণু, শিব, কালী, গণেশ, দুর্গা যাঁহারই পূজা করুক ভক্ত তাঁহাকে পরব্রহ্মরূপে পূজা করে, তজ্জন্যই সাধক প্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

'কালীই ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'

বেদের এই দেবতাবাদই বৈদিকধর্ম ও দর্শনের একেশ্বরবাদের উৎস।

একেশ্বরবাদ :—দেবতাদের আলোচনায় ঋগ্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদ হইতে যে মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করা হইল সেই মন্ত্রগুলি সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ভূতাত্মা ও জীবাত্মা একেশ্বর তত্ত্বের বোধক। ঋগ্বেদে হিরণ্যগর্ভ সূক্ত (১০—১২১) পুরুষসূক্ত (১০—৯০) প্রভৃতি সূক্ত একেশ্বরবাদ ঘোষণা করে। পুরুষসূক্তে সৃষ্টির সূচনায় পুরুষ কি ভাবে নিজেকে আহুতি দিলেন,—সেই একের সত্তা স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রপঞ্চে পরিণত হইল তাহা দেখান হইয়াছে। এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে যাহা কিছু সৃষ্টপদার্থ সবই পুরুষ, তৃতীয় মন্ত্রে তত্ত্বটি আরও পরিস্ফুট হইয়াছে—

'এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥"

অর্থাৎ তাঁরই সৃষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই পুরুষের মহিমা। (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের

সকল পদার্থ তাঁহার একটি অংশমাত্র ; তাঁহার অবশিষ্ট তিন অংশ দ্যুলোকে অমৃত হইয়া রহিয়াছে ; অর্থাৎ পুরুষ যেমন বিশ্বের উৎস ও বিশ্বময় তদ্রূপ যুগপৎ তিনি বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন। পুরুষসূক্তের এই তত্ত্বই বেদের উপনিষদ্‌বাক্যে "একোঽহং বহু স্যাম্" "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ একের বহু হওয়া তত্ত্বের বীজ এবং এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রটি উপনিষৎ-কীর্তিত ব্রহ্ম যে যুগপৎ বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র, বিশ্বের উৎস, বিশ্বময় (Immanent) ও বিশ্বাতিগ (Transcendent) এই পরমতত্ত্বের বীজস্বরূপ, এই তত্ত্ব গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ভগবদ্‌বাণীতে ধ্বনিত হইয়াছে—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"।

১০-৪২

শ্রীভগবান বলিতেছেন,—"আমি আমার একাংশের দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি।"

পরিশিষ্ট (ক)

এই গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে কয়েকজন দেবতার আলোচনা করা হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে আরও কয়েকজন দেবদেবীর স্বরূপ ও কার্যের আলোচনা করা হইল।

সূর্য

'ঋগ্বেদে সর্বসমেত তেরটি সূক্ত সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে পাওয়া যায়। আবার এই বেদের পঞ্চম মণ্ডলের চল্লিশ সংখ্যক সূক্তে ইন্দ্র ও সূর্যের একযোগে স্তুতি করা হইয়াছে। সূর্যের বহুমুখী স্তুতি ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। সূর্যই সকল শক্তির মূল উৎস। সূর্য বিহনে আমাদের এই সচলায়তন জগৎ অচলায়তনে রূপান্তরিত হইয়া পড়িবে এই সত্যটি সর্বজনবিদিত। পৃথিবীর ভৌগোলিক তারতম্যের হেতু এই সূর্য। আবার ঋতুপরিবর্তনও সম্পূর্ণরূপে সূর্যের উপরই নির্ভরশীল। প্রাণীর জীবনধারণের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য্য তাপ এবং আলোকের উৎপত্তিস্থলও সূর্য। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য সর্বাপেক্ষা দ্যুতিমান। বেদে অস্তগামী সূর্যের অতি মনোমুগ্ধকর রূপকে একজন সুন্দর সুঠাম যুবকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

যাস্কাচার্য তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে সূর্য শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করিয়াছেন—'সূর্যঃ সর্তের্বা সুবতের্বা স্বীর্য্যতের্বা'। দুর্গাচার্য আবার একস্থানে বলিয়াছেন—'সর্তের্বা সূর্যঃ সুবতের্বা', প্রসবার্থস্য স এব হি ইদং সর্বং প্রসুবতি জনয়তীত্যর্থঃ' —অর্থাৎ সূর্যই এই সমস্ত কিছুর জন্মদাতা। দুর্গাচার্যের মতানুসারে আবার বায়ু দ্বারা প্রেরিত হয় এই অর্থে সূর্যশব্দের নির্বচন দৃষ্ট হয়—'বায়ুনা হ্যয়ং সুষ্ঠু ঈর্য্যতে প্রের্য্যতে ইত্যর্থঃ'। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৫।১৫) শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষ্যে ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে যে যিনি রশ্মিকে সম্যক্ প্রেরণ করেন অথবা গুণ ও জ্ঞানকে যিনি প্রেরণ করেন তিনিই সূর্য (সূর্যঃ সুষ্ঠু ঈরয়তে রসান্ রশ্মীন গুণান্ ধিয়ো বা জগতঃ)। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত নব্বইতম সূক্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সূক্তে বিরাট্ পুরুষের উল্লেখ রহিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান এই পুরুষ হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর আকাশ, জীবজন্তু এবং বিভিন্ন বর্ণসমূহও এই পুরুষ হইতেই সমুদ্ভূত। বিরাট্ পুরুষের মন হইতে উৎপন্ন হইল চন্দ্র; সূর্যদেব জাত হইলেন তাঁহার চক্ষু হইতে, মুখ হইতে জন্ম নিলেন ইন্দ্র এবং অগ্নি

(৬০।৯০।১৩)। 'সহস্রশীর্ষা সহস্রপাৎ' এই পুরুষের ন্যায় সূর্যদেব ও সহস্র-শৃঙ্গযুক্ত বৃষভ ('সহস্রশৃঙ্গো বৃষভঃ'—৭।৫৫।৭)। অথর্ববেদে উদীয়মান ভানুকে 'রোহিত' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই রোহিত নামসম্পন্ন 'সহস্র-শৃঙ্গবৃষভ' ঋগ্‌বেদের সহস্রশৃঙ্গবিশিষ্ট সূর্যের মতই প্রবল পরাক্রমশালী এবং তেজস্বী। এই রোহিতদেবতা আকাশ এবং পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন এবং অন্যান্য দেবতাগণও এই দেবতার প্রভাবেই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। একথা স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে ঋগ্‌বেদের সবিতা, পূষা, মিত্র প্রভৃতি দেবতাগণ সূর্যেরই বিভিন্ন রূপ। সূর্যকে আকাশ এবং অদিতির পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঊষা সূর্যের ভার্যা (সূর্যস্য যোষা) বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন (৭।৭৫।৫); আবার অন্যত্র ঊষাকে সূর্যের ভগিনীও বলা হইয়াছে।

বেদে সূর্যকে সোমরসপায়ী বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। সূর্য যেন মধুর সোমরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া যজমানকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন (বিভ্রাড্ বৃহৎপিবতু সোম্যং মধু)।

এই বিভ্রাট দেবতা শত্রুনাশক, বৃত্রহন্তা এবং রাক্ষসদিগকে দমন করিতে সুনিপুণ (অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা ১০।১৭০।২)। জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে সূর্যই সর্বাপেক্ষা দ্যুতিশীল এবং বেগবান্। সূর্য সর্বজয়ী, সর্বপ্রকার ধনও এই দেবতার আয়ত্তাধীন (ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্ বিশ্বজিদ্ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ—১০।১৭০।৩)। সূর্যের তেজ কল্যাণ-প্রসূ, যজ্ঞসম্পাদনে অনুকূল এবং সর্বলোক পালনে সমর্থ। (১০।১৭০।৪)।

সূর্যের পৃষ্ঠপোষক দেবতার উল্লেখও বেদে পাওয়া যায়। পূষণদেবতা সূর্যদেবের বার্তাবহ এবং বরুণদেবতা তাঁহার গতিপথ নির্ধারণকারী। (যাস্তে পূষন্ নাবো অন্তঃ সমুদ্রে হিরণ্ময়ীরন্তরিক্ষে চরন্তি। তাভির্যাসি দূত্যাং সূর্যস্য—৬।৫৮।৩; উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পন্থামন্বেতবা—উ—১।২৪।৮)। নিরুক্তগ্রন্থে সূর্যকে দ্যুলোকের দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (সূর্যঃ দ্যুস্থানম্। ৭।২।১)। 'অথৈতান্যাদিত্যভক্তীন্যসৌ লোকস্তৃতীয় সবণং বর্ষা জগতী সপ্তদশস্তোমো বৈরূপং সাম যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতা—উত্তমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ' (নিরুক্ত ৭।৩।৪)—অর্থাৎ আদিত্য দ্যুলোকনিবাসী, তৃতীয় সবণ, বর্ষাঋতু, জগতীছন্দ, সপ্তদশস্তোম এবং বৈরূপ সাম আদিত্য-সম্বন্ধী। উত্তমস্থানে পরিকল্পিত আদিত্যাদি দেবতা এবং ঊষা, বৃষাকপায়ী প্রভৃতি দেবী সূর্যের সহচরী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

সূর্যের কর্ম নিরূপণকালে যাস্কাচার্যের বিজ্ঞান-সম্মত উক্তিটি উল্লেখযোগ্য

—'অথাস্য কর্ম রসাদানং রশ্মিভিশ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবল্হিতমাদিত্য কর্মৈব তৎ' (নিরুক্ত, ৭।৩।৪)। তাৎপর্য এইরূপ,—রসপ্রদান এবং রশ্মির দ্বারা রসধারণ করা আদিত্যদেবতার কর্ম। যে কোন প্রবল্হিত কর্ম আদিত্য দেবতা কর্তৃক নিষ্পাদিত হয়। এখানে রসদান বলিতে বৃষ্টি বুঝাইতেছে। আবার রশ্মিদ্বারা আদিত্য রসধারণ করে—এই তত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে এক বৈজ্ঞানিক সত্য। সূর্যরশ্মির ফলেই সমুদ্রের জল বাষ্পায়িত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়; আবার সেই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়ে। মেঘের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিজ্ঞানসম্মত কারণ তাঁহার 'মেঘদূত' নামক খণ্ডকাব্যে কালিদাস দর্শাইয়াছেন তাহার সহিত সূর্যের কর্মের নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। কালিদাস বলিয়াছেন,—'ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ'—ধূম, তেজ, জল এবং বায়ুর সংমিশ্রিত মেঘ। তেজের সহায়ে জল হয় বাষ্পীভূত এবং সেই বাষ্প আকাশে বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া ঘনীভূত মেঘের সৃষ্টি করে। এখানে জ্যোতিঃ অর্থে সূর্যকেও ধরা যাইতে পারে। কারণ সূর্য ব্যতীত অপর কোন শক্তি নাই যাহা এত শীঘ্র জলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করিতে পারে (যাঃ সূর্যো রশ্মিভিরাততান ৭।৪৭।৪)।

এই মহান্ সূর্যদেবতা ঋগ্বেদে চন্দ্রমা, বায়ু এবং সংবৎসরের সহিত স্থানে স্থানে একযোগে স্তুত হইয়াছেন। গগনে সূর্যের উদয় সূচিত হওয়ামাত্র নক্ষত্রমণ্ডলী চোরের মত পলায়ন তৎপর হইয়া উঠে (অপত্যে তারবো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে ১।৫০।২)। বিশ্বের প্রদীপক অর্থাৎ প্রকাশক এই দেবতা; বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ১।৫০।৪)। তিনি দিবারাত্রির প্রভেদ নির্ণায়ক (বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা সিমানো অক্তুভিঃ ১।৫০।৭)। অতিশয় ভাস্বর রশ্মিসমন্বিত সূর্যদেবের শ্রেষ্ঠত্ব ঋগ্বেদের একজায়গায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি উত্তম বান্ধবস্বরূপ। উত্তম মিত্র বলিয়াও সূর্যের সুখ্যাতি রহিয়াছে (উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ ১।৫০।১১)। এই সূর্য রোগশোকাদি ধ্বংসের জন্য আকাশ পথে যেন গমন করেন (১।৫০।১৩)।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একশত পঞ্চদশতম সূক্তে সূর্যোদয়ের এক মনোলোভা বর্ণনা দৃষ্ট হয়। উক্ত সূক্তে ভাষার মাধুরিমা এবং অলঙ্কারের ধ্বনি কাব্যরসের মানকে নিঃসন্দেহে এক উন্নত পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে। দেবতা সকলের কান্তিসমন্বিত অত্যুজ্জ্বল বলিয়া এই সূর্যদেবতার বর্ণনা করিয়াছেন বেদের ঋষি। এই উজ্জ্বলমুখ তাঁহার ঔজ্জ্বল্য লইয়া উদয়াচলে গমন করেন (চিত্রং দেবানামুদগাদণীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ—১।১১৫।১)। উদয়কালে

সূর্য আকাশের পূর্বভাগে তাঁহার অপূর্ব দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া শোভা পান। উক্ত মন্ত্রে সূর্যকে দেবতাদের উজ্জ্বলমুখ বলা হইয়াছে। 'Ancient Mariner' নামক কাব্যে কবিবর কোলেরিজ (Coleridge) নিম্নোদ্ধৃত স্তবকে সূর্যকে ভগবানের উত্তমাঙ্গ বলিয়াছেন—

'Nor dim nor red like God's own head
The glorious Sun uprist ;'

সেই জাজ্বল্যমান অগ্নিপিণ্ডটি নববধূর কপালে শোভিত সিন্দূর বিন্দুর মতই এক অভিনব সৌন্দর্য্যের আকর। প্রভাত সূর্যের রূপে মুগ্ধ কবির কণ্ঠ হইতে তাই নিঃসারিত হইয়াছে—'পূর্ব উদয় গিরি ভালে, গাহে বিহঙ্গম পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে'। এই বসুন্ধরা, আকাশ এবং অন্তরীক্ষকে পূর্ণ করিয়াছেন সূর্যদেবতা তাঁহার দীপ্তি এবং তেজ বিতরণ করিয়া (আপ্রা দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরিক্ষম্—১।১১৫।১)। মিত্র, বরুণ এবং অগ্নিদেবতার দর্শনেন্দ্রিয়-স্বরূপ এই দেবতা (চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ ১।১১৫।১)।

সূর্যদেবতাকে সাতটি অশ্ব বহন করে (সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য—১।৫০।৮)। সূর্যের রথবহনকারী অশ্বগুলি কল্যাণময় বলিয়া উক্ত হইয়াছে (ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যস্য ১।১১৫।৩)। এই অশ্বসমূহ বিভিন্নবর্ণ-বিশিষ্ট। বিশ্বের কল্যাণার্থে অশ্বসপ্তক সূর্যকে বহন করে (শীর্ষ্ণঃ শীর্ষ্ণো জগতস্তস্থুষস্পতিং সময়া বিশ্বমা রজঃ। সপ্ত স্বসারঃ সুবিতায় সূর্যং বহন্তি হরিতো রথে'—৭।৬৬।১৫)। সূর্য যখন রথে সপ্ত অশ্ব জুড়িয়া আকাশ পথে গমন করেন তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই তাঁহাকে রোধ করিতে সমর্থ হয় না।

সূর্যের আকৃতি দুই প্রকার—কৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ। মিত্র এবং বরুণের প্রতিকৃতি বলিয়াই যেন এক সূর্যের দুই রূপ (১।১১৫।৫)। এই সূক্তে রাত্রি প্রাণীবাচক বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। আবার একই সূক্তে অন্য মন্ত্রে রাত্রির এক জীবন্ত প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। তাৎপর্য স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অশ্বগুলি যখন সূর্যের রথ হইতে পৃথকীকৃত হয় তখন পৃথিবী যেন কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া আত্মগোপন করেন। কি অপূর্ব এই কবিকল্পনা। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সূর্যের দ্বিবিধ আকৃতির এক সুষ্ঠু রূপদান করা হইয়াছে—'অথ যদেত-দাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈর্কাথযন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে (ছা. উ. ১।৬।৫)। অর্থাৎ ঋক্ হইতেছে সূর্যের শুভ্র দীপ্তি, কৃষ্ণবর্ণই সাম। এই শুভ্রতার প্রতিভূ ঋকের মধ্যেই কৃষ্ণদীপ্তি-রূপ সাম নিহিত এবং এই কারণেই ঋক্ সামের অধিষ্ঠান বলিয়া খ্যাত।

সকল অদৃষ্ট অশুভ প্রাণীর নাশক বহু প্রকার বিষনাশক অদিতিপুত্র সূর্য পর্বত হইতেও বহু উচ্চতর স্থানে অধিরোহন করেন (আদিত্যাঃ পর্বতেভ্যঃ বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা—১।১৯১।৯)। সূর্যদেবতা অতিদূরে অবস্থান করিলেও আমাদের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার মহিমার প্রভাবে বিষও অমৃতে পর্যবসিত হয় (মধু ত্বা মধুলা চকার—১।১৯১।১১)। সূর্যই দিন রাত্রির ক্রম পরিবর্তনের কারণ। বিরুদ্ধাচারীকে নাশ করিবার জন্য অপরিসীম বলে বলীয়ান সূর্যের তেজকে ঋষি বন্দনা করিতেছেন। শত্রুনাশার্থে সর্বথা মিত্র-ভাবাপন্ন ঋভুরূপী মরুদ্‌গোষ্ঠীকে ঋগ্বেদে সূর্যের শক্তি প্রার্থনায় রত দেখা যায় (৩।৩১।১৭)।

ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র এবং সূর্যদেবতার একটি সূক্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ইন্দ্র-সূর্যের যুক্ত সম্বোধন দৃষ্টিগোচর হয় না। এক সময় স্বর্ভানু নামক এক দৈত্যের প্রভাবে সূর্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। ফলে অখিল জগৎ গাঢ় অন্ধকারের অন্তরালে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। ইন্দ্র অবশেষে এই স্বর্ভানুর মায়াকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হন এবং অন্ধকারে আবৃত সূর্য তখন অত্রিমুনির ঋক্‌চতুষ্টয়ের দ্বারা প্রকাশিত হন। সূর্য তখন মুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—'হে মুনিবর, এইরূপ অবস্থায় পতিত হইলে আমি যেন তোমার দ্বারা রক্ষা প্রাপ্ত হই। সেই অন্নকামী বিদ্রোহী রাক্ষস যেন আমাকে অন্ধকারের দ্বারা সমাবৃত করিতে না পারে এবং সেই জন্য তুমি ও বরুণ হইবে আমার সহায়ক। তুমি সত্যের পোষক এবং মিত্রভাবের রক্ষক।'

বেদের সপ্তম মণ্ডলের একটি সূক্তে সূর্যকে মনুষ্যের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। সূর্যই সকলের প্রেরক এবং বলদাতা। এই দেবতার তেজ হইতেই সৃষ্ট প্রাণিবর্গ কর্মনিষ্পাদনে নিরত হয় (নূনং জনাঃ সূর্যেন প্রসূতা অয়ন্নর্থানি কৃণবন্ন পাংসি—৭।৬৩।৪)। সূর্য বহুদূর হইতে দেখিতে সমর্থ হন (উরুচক্ষা ৭।৩৫।৮ ; ৭।৬৩।৪ ; দূর দৃশে ১০।৩৭।১) ; সূর্য সকলকে অবলোকন করেন (সূরায় বিশ্বচক্ষসে—১।৫০।২) ; মর্ত্যবাসীর পাপপুণ্য সূর্যই নিরীক্ষণ করেন (ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্নভি চষ্টে সূরো অর্য এবান্ ৬।৫১।২)। বেদে দিব্যজন্মা, তেজস্বী, প্রকাশযুক্ত, পবিত্র এবং মিত্রাবরুণের দ্রষ্টা প্রভৃতি বহু বিশেষণে সর্বলোকের শীর্ষস্থানীয় সূর্যকে বিভূষিত করা হইয়াছে। সূর্যের শীতল এবং উত্তপ্ত তাপ—উভয়ই মনুষ্যের পক্ষে হিতকর। জ্যোৎস্না রাত্রি সূর্যের আলোকেই আলোকিত হইয়া মানুষকে স্নিগ্ধ করে। দিবাভাগে সূর্যের প্রখর সন্তাপ শস্যাদি উৎপাদনের পক্ষে একান্ত সহায়ক। এই

তথ্যটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত যে সূর্যের তেজেই চন্দ্র সমুদ্ভাসিত। সূর্যতাপ-বিহনে বৃক্ষলতাদির উৎপত্তিও যে অসম্ভব তাহাও সর্বজনবিদিত। সূর্যের শীতল এবং প্রখর—এই উভয় রূপই পৃথিবীর পক্ষে হিতকর, সেই কারণেই সম্ভবতঃ গগনমণ্ডলে দেদীপ্যমান সূর্য এবং অস্তগামী সূর্য—উভয়ই মঙ্গলময় (শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহ্না শং ভানুনা শং হিমা শং ঘৃণেন—১০।৩৭।২০)। সূর্য স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব পদার্থের আত্মাস্বরূপ (সূর্য আত্মা জগতঃ তস্থুসশ্চ—১।১১৫।১)।

ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে উক্ত হইয়াছে যে উদিত হইয়াই সূর্য মাতৃরূপ পূর্বদিকে মিলিত হন এবং অতঃপর পিতৃরূপ আকাশ পথে ধাবমান হয়েন (আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুর। পিতরং চ প্রয়ন্ত স্বঃ—১০।১৮৯।১)। শত্রুঘাতক এবং দেবকুলের হিতৈষী এই দেবতা স্বকীয় মহিমাতেই সমুজ্জ্বল। কেহ তাঁহার প্রতি হিংসাপরায়ণ হইতে পারে না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সূর্যকে রাতের আঁধার এবং ভয়নাশক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—'উদ্যংস্তমো ভয়মপহন্তি' (১।৩।১)। উক্ত শ্রুতিতে সূর্য সবিতার ভিন্ন এক রূপ বলিয়া বর্ণিত। বেদে যেমন সূর্য বিশ্ববাসীর চক্ষু (বিশ্বচক্ষসে) কঠোপনিষদেও তেমনি সূর্য সকলের নয়নস্বরূপ 'সূর্যো যথা সর্ব লোকস্য চক্ষুঃ'। আবার সূর্য যে সকল দেবতার চক্ষুবিশেষ সে সম্বন্ধেও শ্রুতি বিদ্যমান—'এষ বৈ বিশ্বেষাং দেবানাং চক্ষুঃ।'

আদিত্য এবং সূর্য—এই দুই নামে একজন অথবা দুইজন দেবতা বোধ্য কিনা সে বিষয়ে স্বভাবতঃই সন্দেহের অবসর থাকিয়া যায়। যাস্কাচার্য একস্থলে বলিয়াছেন—'সূর্যঃ দ্যুস্থানম্'। অনন্তর এই দেবতার বিভাগ এবং কর্মাদি নিরূপণ কালে বলিয়াছেন—'আদিত্য ভক্তীনি'। অতএব সূর্য এবং আদিত্য যে একই দেবতার অভিধান সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে আদিত্য এবং সূর্য একই দেবতা। কিন্তু ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (৯।১১৪।৩) সূর্য এবং আদিত্যের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে।

মনুষ্যকুলের কল্যাণ নিষ্পাদক দেবতা সবিতা। সায়ণাচার্য সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বক্ষণকে সবিতা আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন—'উদয়াৎ পূর্বভাবী সবিতা'। সকল প্রাণীকে জ্ঞানের প্রেরণা যোগান এই সবিতাদেব। পূর্বে আলোচিত ভগবান্ শ্রীশ্রীশংকরাচার্যের ব্যাখ্যার সহিত এই আলোচনার মিল দৃষ্ট হয়। গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া ভগবান শঙ্করাচার্য

সূর্যের এরূপ অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং সবিতা এবং সূর্যের একত্ব সিদ্ধ হয়। সায়নাচার্যের সবিতার ব্যাখ্যার সহিত গায়ত্রীমন্ত্রের 'সবিতুঃ' (সবিতার) নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান, আবার সবিতা জ্ঞান প্রেরয়িতা এবং শঙ্করাচার্যের ভাষায় সূর্য হইতেছেন 'ধিয়ো জগতঃ'।

বেদে অগ্নির শারীরিক অবয়বের যেরূপ চিত্র রহিয়াছে সূর্যের সেরূপ কোথাও নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের অতি পরিচিত প্রতিদিন দৃষ্ট যে সূর্য অতি প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত দেবতা সে সম্বন্ধে তিলমাত্র সংশয় নাই। বৈদিক ঋষিগণ বন্দনা কালে বলেন,—'এই সূর্যদেবতাকে দর্শন করার জন্য আমাদের চক্ষু যেন শক্তিশালী হয়, সূর্যদেবতার মহিমা এবং কান্তি দর্শনের জন্য আমরা একশত শরৎকাল যেন উপভোগ করি'। কাত্যায়নের মতে বেদের সকল দেবতাই সূর্যের বিভিন্ন রূপ মাত্র। তাঁর উক্তি 'একএব মহানাত্মা বেদে স্তূয়তে, স সূর্য ইতি ব্যাচক্ষতে।' এই গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে এই তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

যমদেবতা

বেদে যমদেবতার স্তোত্রও পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু সূক্ত সংখ্যা অতি অল্প; মাত্র তিনটি। এই তিনটি সূক্তই দশম মণ্ডলের অন্তর্গত। আমাদের ঋগ্বেদে যেরূপ যমের উল্লেখ রহিয়াছে ঠিক তেমনি 'আবস্তা'-গ্রন্থে যীমার ভগিনী 'যিমেহ'র উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। বেদে যমের পিতা যেমন 'বিবস্বত' তেমনি আবস্তার—যীমার পিতা 'বিবনহ্বন্ত' (Vivanhvant)। Macdonell যম-যমী নামক সংবাদ সূক্তটির আখ্যানের মূল যে ইন্দো ইরানীয় যুগের দেবতাবাদ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন তাহার মূলে নিহিত রহিয়াছে এই সাদৃশ্যতথ্য।

নিরুক্তকার যাস্কাচার্য যমদেবতাকে মধ্যমস্থানের বায়ু বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যম শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রদানকালেও তিনি একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যম স্তোতৃবর্গের অভিলষিত বস্তু প্রদানকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (মধ্যমস্থানো বায়ুঃ। যচ্ছতি প্রযচ্ছতি স্তোতৃভ্যঃ কামানি—নিরুক্ত, পঞ্চম অধ্যায়)।

মৃত্যুর পর কি গতি হয় জীবাত্মার—এই চিন্তায় মনুষ্যকুল বিব্রত। সত্যিই বড় জটিল এই প্রশ্ন। ঋগ্বেদের একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে দাতাদের বাসস্থান স্বর্গলোক এবং তাঁহাদের ঊর্ধ্বগতি অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ দেবতার

নিকটতম স্থান তাঁহাদেরই প্রাপ্য (নাকস্য পৃষ্ঠে অধিতিষ্ঠতি শ্রিতো যঃ পৃণাতি স হ দেবেষু গচ্ছতি ১।১২৫।৫)। অন্যত্র বলা হইয়াছে যে আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ সোমকে নেতৃপদে অধিষ্ঠিত করিয়া দেবতা সকলের বরণীয় সুখের অধিকারী হইয়াছেন ; (ত্বং সোম প্র চিকিতো মনীষা ত্বং রজিষ্ঠমনুনেষি-পন্থাম্। তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ—১।৯১।১)। এই দুই মন্ত্রে উক্ত দেবতার বরণীয় সুখ—উভয়ই একই অর্থের দ্যোতক। কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যানটিও যমদেবতাকে লইয়াই বিরচিত। নচিকেতার পিতা তাহাকে মৃত্যুকে অর্থাৎ যমকে দান করেন এবং মৃত্যুতত্ত্ব সম্যক্ অবগতির জন্য যমরাজের গৃহে সেই বালক আতিথ্য গ্রহণ করিল। যম তাহাকে বলিলেন যে পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি মানুষ কি দেবতা সকলেই অজ্ঞ এবং সকলেই জানিতে উৎসুক কিন্তু এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অতি দুরধিগম্য।

মৃত আত্মার আশ্রয়দাতা দেবতা হইলেন যম। যমী এই যমদেবতার ভগিনী। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের যম-যমীর সংবাদ সূক্তটিই উত্তর যুগের প্রেমমূলক গীতিকাব্য নাটক প্রভৃতির উৎস বলিয়া বিদ্বৎ সমাজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এই সকল সংলাপপূর্ণ বৈদিকসূক্ত সমূহেই নাটকের বীজ নিহিত আছে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংবাদ সূক্ত শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

যম-যমীর মধ্যে ভাই-ভগিনী সম্বন্ধ। যমী যমের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়া লইতে সমুৎসুক। কিন্তু যম যমীর এই অসঙ্গত অবৈধ প্রস্তাব স্বীকার করিতে সর্বান্তঃকরণে নারাজ। যমী যমের প্রতি অবশেষে বিবিধ কটূক্তি বর্ষণ করিয়া যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে সচেষ্ট হইল। যম কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যমীকে অন্য কোন পুরুষকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া লইতে যম উপদেশ দিল। যমের যুক্তিনিষ্ঠ ধর্মসম্মত ও তত্ত্বগর্ভ ভাষণে যমীর কামভাব তিরোহিত হইল। যে কোন অবস্থাতেই মানুষের প্রধান আশ্রয় হইল বিবেক,—ইহাই যমের উপদেশ। মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করাও নিতান্ত অনুচিত। যম যমীর এইরূপ আখ্যান বৃহদ্দেবতা গ্রন্থেও (৬।৪৫) পাওয়া যায়।

আমাদের পূর্ব পুরুষ যম দেবতা। তাঁহাকে হব্যাদির দ্বারা স্তব করিতে যজমান উপদিষ্ট হইয়াছেন। (পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্। বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য—১০।১৪।১)। সকল প্রাণীকেই যমদেবের নিকট যাইতে হয়।

আমাদের কুকর্ম্ম ও সুকর্ম্মের দ্রষ্টা এই যমরাজ। যমরাজের পথ আচ্ছাদিত করিতে কেহ সক্ষম নহে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে পথে প্রস্থান করিয়াছেন সেই পথেই সকল প্রাণী স্বীয় কর্মানুযায়ী গন্তব্য স্থানে যাইয়া উপনীত হয়। (যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতি রপর্ভর্তবা উ। যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরে না জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনুস্বাঃ—১০।১৪।২)

আদিত্য যমরাজের পিতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ('বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তে'—১০।১৪।৫)। মৃতের জন্য যমকর্তৃক রক্ষিত স্থানটি দিবা রাত্রি জলদ্বারা সজ্জিত, তাহাতে পিশাচাদির স্থান নাই। যমের ছলন্ত চারিচক্ষু-বিশিষ্ট কুকুর যাহাতে মৃতের কোনপ্রকার অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে সেইজন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে স্তব করা হয়। ত্রিকদ্রুকযাগের দেবতা এই যমরাজ পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং ছয়টি স্থানে বসবাস করেন—১০।১৪।১৬।

সোমপায়ী বলিয়া যমদেবতার একাধিকবার স্তুতি করা হইয়াছে—১০।১৪ ; ১০।১৩৫)। যজমান তাঁহাকে স্তুতি কালে বলিতেছেন যে তাঁহার পূর্বগামী সকলেই যমদেবের সহিত একটি বৃক্ষে উপবিষ্ট আছেন এবং যজমানও যেন সেই বৃক্ষে আরোহণ করিতে সক্ষম হন। ইহাই একান্ত অভিলাষ (যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ—১০।১৩৫।১)। এই যমদেবতা প্রজাবৃন্দের প্রভুস্বরূপ (অত্রা নো বিশ্‌পতিঃ—১০।১৩৫।১) পেঁচা এবং কুকুর যমের দূত বলিয়া উল্লিখিত। যমের গৃহই যজমানের পবিত্রধাম। এই পবিত্র বিশ্রামাগার দেবতাদের দ্বারা নির্মিত। সেখানে দেবতাদের সুখার্থে বাদ্যযন্ত্র বাজান হয় এবং তাঁহারা বিবিধ স্তুতির দ্বারা সমলঙ্কৃত হয়েন, ('ইদং যমস্য সাদনং দেবমানং যদুচ্যতে। ইয়মস্য ধমাতে নাড়ীরয়ং গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ—১০।১৩৫।৭)।

ঊষাদেবী

ঋগ্‌বেদে প্রায় কুড়িটি সূক্তে ঊষাদেবীর স্তুতি করা হইয়াছে। এই কুড়িটি সূক্তে ঊষাদেবীর অপূর্ব রূপলাবণ্যের বর্ণনার ভঙ্গিটি বড়ই চিত্তাকর্ষক। ঋগ্‌বেদের ঊষাদেবী সত্যিই অতুলনীয়া। প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্যের অতিশয় লাবণ্যময়ী দেবী 'অরোরা'র (Aurora) রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন 'টিটেনাস'। এই অরোরা দেবী এবং ঊষাদেবী রূপে ও গুণে সমতুল্য। একজন যুবক যেমন যুবতীকে অনুসরণ করে সূর্যদেবও তেমনি ঊষাদেবীকে অনুসরণ করেন—"সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি

পশ্চাৎ"—১৷১১৫৷২)। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যে সায়ণাচার্য্যের উক্তি—"যথা কশ্চিন্মনুষ্যঃ শোভমানাবয়বাং গচ্ছন্তীং যুবতিং স্ত্রিয়ং সততমনুগচ্ছতি তদ্বৎ'—অর্থাৎ কোন একজন মনুষ্য অলংকারে সুশোভিতা গমনশীলা যুবতীর যেমন অনুসরণ করে তদ্রূপ। সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে পূর্বাকাশের কোণে যে একটি অপূর্ব মনোলোভা অরুণ বর্ণ ফুটিয়া উঠে তাহাই উষা এবং এই ক্ষণটিকেই বলা হইয়াছে উষাকাল। এই উষাকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হইলেন উষা। এই উষাকালেই দর্শপূর্ণমাসাদির প্রারম্ভিক ক্রিয়া যজমানেরা করিয়া থাকেন এবং কৃষককুলও ঠিক এই ক্ষণটিতেই হাল গরু লইয়া মাঠের দিকে যাত্রা করে। সায়ণাচার্য্যও একটি ঋক্ মন্ত্র (১৷১১৫৷২) ব্যাখ্যার প্রাক্কালে এই তথ্যগুলির সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন—'যত্র যস্যামুষসি জাতায়াং দেবযন্তো দেবং দ্যোতমানং সূর্যং যষ্টুমিচ্ছন্তো নরাঃ যজ্ঞস্য নেতারো যজমানাঃ। যুগানি। যুগশব্দঃ কালবাচী। তেন চ তত্র কর্তব্যানি কর্মানি লক্ষ্যন্তে, যথা—দর্শপূর্ণমাসাবিতি। অগ্নিহোত্রাদীনি কর্মানি। বিতন্বতে বিস্তারয়তি। যদ্বা দেবযন্তঃ দেবযাগার্থং ধনমাত্মন ইচ্ছন্তো; যজমানঃ পুরু বা যুগানি হলাবয়বভূতানি কর্ষণায় বিতন্বতে প্রসারয়তি।' অর্থাৎ সূর্যোদয়ের ঠিক প্রাক্কালে সূর্যকে স্তুতি করিতে সমুৎসুক যজমানবর্গ দর্শপূর্ণমাস এবং অগ্নি-হোত্রাদি কর্মের প্রারম্ভ করেন। অথবা অর্থাভিলাষী যজমান অর্থলোভার্থে দেবপূজা সম্পাদন করিতে লাঙ্গল প্রভৃতি লইয়া ক্ষেতের দিকে গমন করেন।

সুতরাং এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে উষা সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছাড়া আর কেহই নহেন। বেদে উষা হ্রস্ব উ কারই দৃষ্ট হয়। অভিধানমতে উষা, ঊষা উভয়ই শুদ্ধ। বঙ্গভাষায় ঊষা বানানই সাধারণতঃ প্রচলিত। দেবতামণ্ডলীকে যজ্ঞকর্মে আহ্বানকারক একটি মন্ত্রে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে অধিষ্ঠাত্রী দেবীই যে উষা এই তথ্য সুস্পষ্ট রূপে পরিবেশিত হইয়াছে—

'বিশ্বান্ দেবাঁ আ বহ সোম পীতয়েঽন্তরিক্ষাদুষস্তুম।
সাস্মাসুধা গোমদশ্বাবদুকথ্যমুষো বাজং সুবীর্যম্ ॥" (১-৪৮-১২)

এই মন্ত্রে অন্তরীক্ষলোক হইতে সকল সোমপায়ী দেবতাদের যজ্ঞস্থলে বহন করিয়া লইয়া আসিবার জন্য দেবী উষাকে স্তব করা হইয়াছে। 'হে উষা, অশ্ব এবং গোসমন্বিতা, ধনশালিনী তুমি আমাদের অন্নসম্পন্ন কর।'

আকাশ উষাদেবীর মাতৃস্থানীয়া বলিয়া ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। অত্যুজ্জ্বল বসনভূষণে সুশোভিতা উষা অতুল পার্থিব ঐশ্বর্যের অধিকারিণী—

'এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি ব্যুচ্ছন্তী যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ।
বিশ্বস্যেশানা পার্থিবস্য বস্ব উষো অদ্যেহ সুভগে ব্যুচ্ছ ॥' (১৷১১৩৷৭)

রাত্রি এবং উষা এই ভগিনীদ্বয় এই মার্গে বিচরণ করেন--

'সমানো অধ্বা স্বস্রোরনন্তস্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে।
ন মেথতে ন তস্থতুঃ সুমেকে নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ॥'

সূর্যের দীপ্তিতেই উষা দীপ্তিমতী। নিরুক্তকার যাস্কাচার্য 'বিভাবরী' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই উক্তির সত্যতা নিরূপণ করিয়াছেন। উষার ষোলটি নামের মধ্যে একটি নাম বিভাবরী। যাস্কাচার্য বলিয়াছেন— 'বিশেষেণ ভাতি দীপ্যতে আদিত্য কিরণসম্বন্ধাৎ' অর্থাৎ সূর্যের কিরণের দ্বারা বিশেষ ভাবে শোভা পায় এই অর্থে উষা বিভাবরী আখ্যায় ভূষিতা।

যাস্কাচার্য নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ে উষার রূপের তারতম্য ভেদে ষোলটি অভিধান প্রদর্শন করিয়াছেন,—'বিভাবরী। সুনরী। ভাস্বতী। ওদতী। চিত্রামঘা। অর্জুনী। বাজিনী। বাজিনীবতী। সুম্নাবরী। অহনা। দ্যোতনা। শ্বেত্যা। অরুষী। সূনৃতা। সূনৃতাবতী। সুনৃতাবরী —' ইতি 'ষোড়শোষো নামানি'- অর্থাৎ বিভাবরী হইতে আরম্ভ করিয়া সুনৃতাবরী পর্যন্ত উষার ষোলটি নাম। বেদে অশ্ববতী গোমতী প্রভৃতি বিবিধ নামে উষার স্তুতি করা হইয়াছে। এই উষাদেবী যেন যজমানকে সত্য বলেন এবং ধনসম্পদে সমৃদ্ধিশালী করেন—

"অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো—ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে।
উদীরয় প্রতিমা সূনৃতা উষশ্চোদ রাধো মাঘানাম্ ॥ (১৷৪৮৷২)

পৃথিবীর সকলের বিষয়েই উষা সুপরিজ্ঞাত (বিশ্বসুবিদ)। গৃহকর্ত্রীর মতই ইনি সর্বজনকে লালন পালন করেন। তাঁহার সমাগমেই পদাদি অবয়বযুক্ত জীব স্বকীয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া উঠে এবং পক্ষিজগৎ তাহাদের গগন বিহারাদিতে রত হয়—

'আধা যোষেব সূনর্য্যুষা যাতি প্রভুঞ্জতী।
জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ ॥' (১৷৪৮৷৫)

এই মনুষ্যলোকে সৌভাগ্যশালিনী দেবী উষা রথারূঢ়া হইয়া শুভাগমন করেন— 'শতং রথেভি সুভগোষা ইয়ং কিং যাত্যভি মানুষান্' (১৷৪৮৷৭) উষার আগমনে মনুষ্য এবং বিহগকুলে মহা আনন্দোৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। ইহার ফলেই সকলে উৎফুল্ল হইয়া বিচরণ করে—

'বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি।
উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবো অন্তেভ্যস্পরি ॥' (১৷৪৯৷৩)

রাত্রের অন্ধকার নাশ করিয়া এক আলোকোদ্ভাসিত জগতের সন্ধান দেন দেবী উষা। রাত্রির মসীময়ী যবনিকা বিদূরিত করিয়া বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী নর্তকীর মতই উদিত হইয়া দেবী উষা বিশ্বময় তাঁহার অরুণালোক ছড়াইয়া দেন (১।৯২।৪)। উৎফুল্লা উষা সুষমামণ্ডিতা যুবতীর মতই শোভা পান (১।৯২।৬)। ভগিনী রাত্রি হইতে উষা নিজেকে লুকাইয়া রাখেন এবং স্বীয় প্রেমাস্পদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমুৎসুক থাকেন। অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী উষার জ্যোতিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতি—'ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' (১।১১৩।১)। ভোগ, পূজা, ধন, দৃষ্টি এবং আরোগ্য প্রভৃতির প্রেরণা দান করিয়া তিনি পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন (১।১১৩।৫)। রাজ্য, যশ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকল স্থলেই উষার সমান অধিকার রহিয়াছে। অজর, অমর এই দেবী স্বকীয় ইচ্ছাতেই গতিমতী। তিনিই সূর্যের গতিপথ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১।১১৩।১৬)। তিনি দেবমাতা অদিতির মুখস্বরূপ এবং যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ ('যজ্ঞস্য কেতুঃ ১।১১৩।১৯)। এই কান্তিময়ী দেবী নিজ দেহকে বিকশিত করিয়া সূর্যের সমান রূপ প্রাপ্ত হন এবং যুবতীর মতই যেন মৃদু হাস্যে হৃদয়দ্বারে ঝঙ্কার দিয়া যান (১।১২৪।১০)। গৃহপত্নী যেমন সর্বপ্রথম ঘুম হইতে জাগরিত হইয়া গৃহের সর্বজনকে নিদ্রা দেবীর ক্রোড় হইতে জাগ্রত করেন উষা দেবীও যেন তদ্রূপ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অখিল জগৎকে জাগাইয়া তোলেন (১।১২৪।১০)। সূর্যের বিচিত্রবর্ণযুক্ত রশ্মিজালের বসনে বিভূষিতা হইয়া উষা দেবী তাঁহার অপরূপ সাজসজ্জা করেন—'ব্যুচ্ছন্তী রশ্মিভিঃ সূর্যস্য' (১।১২৪।৮)

উষার আগমনে প্রকৃতিরাজ্যেও জাগে আনন্দের হিল্লোল। বিবিধ পক্ষীর কলতানে মুখরিত হইয়া উঠে বনানীকান্তার। হালগরু সমেত ক্ষেত্রের দিকে গমনরত কৃষকের অন্তরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে আনন্দের সুর। পবিত্র উষাকালেই মানুষ স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ঋগ্বেদে উষার বর্ণনায় প্রকৃতির কোন দৃশ্যই অবহেলিত হয় নাই। উষার সমাগমে মনুষ্যের কর্ম-ব্যস্ততা, বিহগকুলের ঐকতান প্রভৃতি সত্যিই বড় চিত্তাকর্ষক। কবিমানসে উষাকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরনবীন, চিরসবুজ।

দৈবনীতি উল্লঙ্ঘন না করিয়া একই ঋতের পথে চলিয়াছে চিরতরুণী উষার নিত্য আসা যাওয়া। কান্তিময়ী উষাদেবী অপরূপ মোহময় সাজে সজ্জিতা হইয়া প্রতি গৃহে গমন করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ প্রদান করেন।

ঋগ্‌বেদের 'কাব্যিকসৌন্দর্য' আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে—ঊষা দেবী, অপাং নপাৎ নামক বিদ্যুৎ দেবতা সূর্য, পর্জন্য প্রভৃতির উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রগুলি কল্পনার ইন্দ্রজালে অপরূপ কাব্যধর্মে অতুলনীয় রসোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। ঋগ্‌বেদের ঊষাদেবীর স্তোত্রসমূহ বর্ণনার লালিত্যে এবং কাব্যিক রসে গীতিধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। ঊষার সূক্তসমূহের বর্ণনামাধুর্যে মোহিত হইয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতপ্রবর Winternitz (ভিণ্টারনিৎস্) মহাশয়ও বলিয়াছেন—যে প্রধানতঃ ঊষাসূক্তের ভাষার লালিত্য এবং কাব্যালঙ্কার আমার মনকে ঝঙ্কৃত করে— (History of Indian Literature প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৯১)। কাব্যালঙ্কার রচনাচাতুর্য এবং ভাষার ললিতকলায় মুগ্ধ Macdonellও ঊষা সূক্তের গীতিধর্মিতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণনামূলক ধর্মীয় গীতিকাব্যগুলির মধ্যে ঊষার মাধুর্য্য অতুলনীয় এবং ঊষার সূক্তে গীতিকাব্যের অপূর্ব মুক্তার মালা শোভা পাইতেছে ('Pearls of lyric poetry')।

সরস্বতী দেবী

বেদে সরস্বতী দেবীরও স্তব দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বসমেত পাঁচটি সূক্তে সরস্বতীর স্তুতি করা হইয়াছে। এই সূক্ত পাঁচটির মধ্যে তিনটিতে (৬।৬১ ; ৭।৯৫ ; ৭।৯৬) কেবল সরস্বতী দেবী স্তুত হইয়াছেন। অবশিষ্ট সূক্তদ্বয়ের মধ্যে একটিতে (১।৩) মাত্র দুইটি ঋকে সরস্বতীর বন্দনা রহিয়াছে এবং আর একটি সূক্তে (১০।১৭) সরণ্যু, পূষা, আপ প্রভৃতির সহিত সরস্বতী দেবীর স্তোত্র পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু একটি প্রশ্ন মনে জাগে যে এই সরস্বতী দেবী বলিতে 'নদী সরস্বতী' বোধ্য, না বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সর্বজনবন্দিতা বাগদেবী সরস্বতী বোধ্য। সপ্তম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে সরস্বতীকে নদীসমূহের মধ্যে বেগবতী বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। (বৃহদু গায়িষে বচোৎসূর্যা নদীনাম্—৭।৯৬।১)। একই সূক্তে বলা হইয়াছে যে নদীসমূহের ভিতর শ্রেষ্ঠ সরস্বতীর উৎস হইল পর্বত। তথা হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বেগবতী হইয়া সরস্বতী প্রবহমানা, তিনি রাজা নহুষের প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার জন্য ঘৃত এবং দুগ্ধ দোহন করিলেন (একা চেতৎসরস্বতী নদীনাং শুচির্যতি গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ। রায় শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরেঘৃ্তং পয়ো দুদুহে নাহুষায়—৭।৯৫।২)।

নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত বাক্‌দেবীর সাতান্নটি নামের মধ্যে একটি

হইল সরস্বতী। আবার এই অধ্যায়ে উক্ত নদীর সাঁইত্রিশটি নামের মধ্যেও সরস্বতী নামের উল্লেখ রহিয়াছে। সায়ণাচার্যও প্রথম মণ্ডলে তৃতীয় সূক্তের একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে সরস্বতীকে নদী ও বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী এই উভয় রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সরস্বতীর বাক্ ও নদী এই দুই রূপ নিঘণ্টুকার কর্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে। (সর্ত্তেস্তদ্বাতী বৃষ্ট্যধিদেবতাত্বাৎ উদকবতী হি মাধ্যমিকা বাক্। সৈব চাসীন্নদী সরস্বতী); ইহার তাৎপর্য এই যে 'মাধ্যমিকা' দেবী বাক্ বৃষ্টির অধিদেবতা তিনিই আবার সরস্বতী নদী। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন 'তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদীবৎ দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি' (নিরুক্ত ২।২০) অর্থাৎ সরস্বতী পদটির ব্যুৎপত্তি নদীর ন্যায় আবার দেবতার ন্যায় হয়। নিঘণ্টুতে সরস্বতী শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া বলা হইয়াছে— 'সন্তেরসুন্ সরঃ। গদ্যপদ্যাদিরূপেণ প্রসরণমস্যাস্তীতি—' এই ভাবে দেবতারূপিণী সরস্বতী নির্বচন করা হইয়াছে। গদ্যপদ্যাদি রূপেও এই বাক্‌দেবী গতিমতী। বেদে নদীসূক্তে সরস্বতী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং সরস্বতী বলিতে নদী সরস্বতী এবং দেবী বাক্ উভয় দেবতাই বোধ্য। নদী যেমন প্রসার-শালিনী এবং উৎস হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত তাহার গতি, বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী বাক্‌ও ঠিক তেমনি গতিশীলা। গদ্যপদ্যময়ী এই দেবীর গতিতে রহিয়াছে এক চিত্তাকর্ষক সুললিত ছন্দ। মানুষ তাহার পরিকল্পিত সীমাতে পৌঁছাইতে সক্ষম হয় দেবী সরস্বতীর কৃপাতেই। এই দেবী যাহার প্রতি সুপ্রসন্না হন তাহার অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় এবং অভীষ্ট বস্তু তাহার নিকট সহজলভ্য হয়। এই বাক্‌দেবীকে দেখিয়াও কেহ কেহ দেখে না, শুনিয়াও শুনে না— অর্থাৎ সেই ব্যক্তি বাক্‌দেবীর অনুগ্রহলাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়।

এই দেবী সরস্বতী 'পাবক' পবিত্রকারিণী, বুদ্ধির দ্বারা তিনি অন্ন উৎপাদনে সমর্থ। যজ্ঞ কর্ম সফলকারিণী এই দেবী (পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ —১।৩।১০)। সত্যকর্ম এবং শোভনবুদ্ধির প্রেরণাদাত্রী এই বাগ্‌দেবী সরস্বতী (চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্ ১।৩।১১)। বিশাল জ্ঞানসমুদ্র এই দেবীর কৃপাতেই সৃষ্ট হইয়াছে। কর্ম দ্বারা তিনি সর্বজনকে চেতনা দান করেন (মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি—১।৩।১২)। অতুলনীয় এই দেবীর দান ; তিনি কাহাকেও পুত্র প্রদান করেন, কাহাকেও আবার অতুল বিভবের অধিকারী করেন। হবির্দাতা বধ্র্যশ্বকে এই দেবী দিবোদাস নামে এক পুত্র-ধন দান করিয়াছিলেন। তিনিই কৃপণ পণিকে শুচিশুদ্ধ করিয়াছিলেন

(ইয়মদদাদ্ রভসমৃনচ্যুতং দিবোদাসং বধ্র্যশ্বায় দাশুষে—৬।৬১।১)। দেবতার নিন্দাকারীকে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। দেবতার নিন্দা করার জন্য ত্বষ্টার পুত্রকে এই দেবীই নাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে (সরস্বতী দেবনিদো নিবর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ—৬।৬১।৩)। এই অন্নবতী দেবী আমাদিগকে অন্ন প্রদানদ্বারা পরম পরিতৃপ্তি দান করেন (প্রণো দেবী সরস্বতী বাজেভি বাজিনীবতী ধীনামবিত্র্যবতু—৬।৬১।৪)। বেদে শত্রুনাশিকা রথারূঢ়া বলিয়া দেবী সরস্বতীর স্তুতি আছে। উজ্জ্বলবর্ণা এই দেবী পার্থিব এবং দিব্য ধনের অধিকারিণী। দেবীর কায়িক বর্ণনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশাল বৃক্ষের মতই এই আশ্রয়প্রদায়িণী দেবীর শরণাগত জনগণ অশেষ কল্যাণ লাভ করেন (তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপাস্থয়াম্ শরণং ন বৃক্ষম্—৭।৯৫।৫)। বুদ্ধি-প্রদায়িণী বাগ্‌দেবী সরস্বতী যজমানের কামনা পূরণ করেন। আরোগ্যকারিণী এই দেবী সরস্বতী—(অণমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে—১০।১৭।৮)।

শতসহস্রধারায় প্রবহমানা নদীর মত দেবী সরস্বতীও এই পৃথিবীতে ভাষার শতসহস্রধারায় রূপায়িত। পৃথিবীর সর্বত্রই এই দেবীর অবাধ গতি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর মনুষ্যকুল এই বাগ্‌দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিতে সর্বদা সমুৎসুক। সরস্বতীকে ঋষি 'অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে' (২·৪১-১৬) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই সম্বোধন হইতেই বুঝা যায় সরস্বতীকে বৈদিক আর্যগণ কত উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন।

বৈদিকোত্তর যুগে ভারতবর্ষে পবিত্রতায় ও মাহাত্ম্যে গঙ্গার যে স্থান সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ে ও লোকাচারে দৃষ্ট হয়, বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর সেই মহিমা ও উচ্চ স্থান ছিল। ঋগ্‌বেদের মাত্র শেষ মণ্ডলে একবার গঙ্গার নাম পাওয়া যায়। মহাভারতেও সরস্বতী তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। লোমহর্ষণকে হত্যা করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলরামের সরস্বতী তীর্থে যাইতে হইয়াছিল। অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর ভৌগোলিক আলোচনা এই গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে।

পৃথিবী

অন্নদাত্রী পৃথিবী মর্ত্যবাসীর মাতৃস্থানীয়া। ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা এই পৃথিবীকেই দেখি ও পৃথিবীর বাতাস গ্রহণ করি। আমাদের স্বল্প পরিসর

জীবনের লীলাখেলার আরম্ভ এবং অন্ত এই পৃথিবীর বুকেই। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবীর বক্ষপ্রসূত রসই আমাদের জীবনধারণের সহায়ক। সেই কোন সুদূর অনাদিকাল হইতে পৃথিবী মাতা আমাদের সন্তান সন্ততি-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়া অসীম ধৈর্য সহকারে মনুষ্যকুলের প্রতিপালনে নিরতা রহিয়াছেন। এই পৃথিবী মাতা আমাদের আরাধ্যা, আমাদের বন্দনীয়া। অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডে পৃথিবীর অসীম উপকারের কথা এবং অতুলনীয় মহিমার বর্ণনা সত্যই অতি চিত্তাকর্ষক। তথায় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পৃথিবীর গুণানুকীর্তন করা হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদেও পৃথিবীকে সুললিত ভাষায় স্তুতি করা হইয়াছে। তবে ঋগ্‌-বেদের একটি মাত্র সূক্তে এই সুজলা সুফলা মাতৃদেবীর স্তুতি পরিলক্ষিত হয় (৫-৮৪); কিন্তু কয়েকটি সূক্তে দ্যাবা পৃথিবী আখ্যায় আকাশ এবং পৃথিবীর যুগ্ম স্তুতি দৃষ্ট হয়। সূর্য কিরণে এই পৃথিবী যেমন সন্তাপিত হয় তেমনি আবার বায়ুদেবতার বারিধারায়ও এই মর্ত্যস্থল সিক্ত ও স্নিগ্ধ হয়। অর্থাৎ সূর্যের তেজে পৃথিবী সন্তপ্ত এবং বায়ুদেবতার বর্ষণে পৃথিবী সিক্ত হয় (স্তেগো ন ক্ষামত্যেতি পৃথ্বীং, মিহং, ন বাতো বিহ বাতি ভূম—১০।৩১।৯)। নিরুক্তকার যাস্কাচার্য তাঁহার নিঘণ্টুতে পৃথিবীর একুশটি প্রতিশব্দ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে পৃথ্বী, অবনি, ক্ষমা প্রভৃতির নির্বচন প্রদর্শন কালে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। পৃথিবী শব্দটির অর্থ যাহা 'অতি প্রথিতা' অর্থাৎ বিস্তীর্ণা। রক্ষা বা পালন করা অর্থে অবনি, প্রাণিসমূহ এই পৃথিবীতেই নিবাস করে তজ্জন্য তাহার একটি নাম ক্ষমা (ক্ষিয়ন্তি নিবসন্ত্যস্যাং প্রাণিনঃ), অথবা পদার্থসমূহ এই স্থলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এই অর্থেও পৃথিবীর নামান্তর হইল ক্ষমা (ক্ষয়ন্তি অবয়বং গচ্ছন্তি অস্যাং পদার্থা ইতি বা)। এই পৃথিবীতে যজমানগণ দেবতার স্তুতি করেন—এই অর্থে পৃথিবীর একটি নাম হইল ইলা (ঈড়্‌স্তুতৌ), (ঈড্যতে স্তূয়তে বাস্যাং যজমানো দেবান্, ইন্ধে দীপ্যতে বা অস্যাং শ্রীভিঃ)। পৃথিবীর অপর একটি নাম পূষা, কারণ পৃথিবী সকলকে ধারণ এবং পোষণ করেন। (ধারয়তি সর্বাণি ভূতাণি পোষয়তি আভরণানি ইতি)। ভাষ্যকার মাধবের মতে পোষয়িত্রীর সাক্ষাৎ রূপই পূষা অর্থাৎ পৃথিবী (পূষা পোষয়তীতি তস্য প্রত্যক্ষং রূপম্)।

বেদে পৃথিবী দেবীর সহিত অন্য কোন দেবদেবীর স্তুতি দৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র একযোগে (দ্যৌ) এবং পৃথিবীর কয়েকটি স্তোত্র পরিলক্ষিত হয়।

বেদে পৃথিবী অতি উদার বলিয়া বর্ণিত, এমন কি এই উদারতা পর্বত প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথিবীই মেঘরাশিকে স্বকর্মে প্রবৃত্ত করান। অর্জুনী পৃথিবীর অপর একটি নাম। এই বসুধার বক্ষপ্রদেশই ক্ষুদ্র বিশাল বৃক্ষরাজিসমূহের উৎসস্থল ('দৃলহা চিদ্যা বনস্পতীন্ ক্ষ্ময়া দর্ধর্ষ্যোজসা'—৫।৮৪।৩)।

যজ্ঞের পুষ্টিবর্ধক এই দেবতাদ্বন্দ্ব আকাশ এবং পৃথিবী। পুত্রতুল্য যজমানকে এই দেবতাদ্বয় বরণীয় ধনদ্বারা সম্পদ্‌শালী করিয়া তোলেন। অন্যান্য দেবতাদের সহিত আকাশ এবং পৃথিবী যজ্ঞ শালায় আগমন করেন ('প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী ঋতাবৃধা মহী স্তুষে বিদথেষু প্রচেতসা। দেবেভির্যে দেবপুত্রে সুদংসসেত্থা ধিয়া বার্যাণি প্রভূষতঃ'—১।১৫৯।১)। যজমানকে সুখ প্রদান করেন এই দুই দেবতা (তে হি দ্যাবা-পৃথিবী বিশ্বশংভুব ঋতাবরী রজসো ধারয়ৎকবী—১।১৬০।১)। পিতামাতা সন্তানকে যেমন লালন পালন করিয়া পরিবর্ধিত করিয়া তুলেন আকাশ এবং পৃথিবীও ঠিক তেমনি ধরাপৃষ্ঠের সকলকে প্রতিপালন করেন (উরুব্যচসা মহিনী অসশ্চতা পিতা মাতা চ ভুবনানি রক্ষতঃ—১।১৬০।২)। ঋগ্বেদের ষষ্ঠমণ্ডলে একটি সূক্তে (৬।৭০) আকাশ এবং পৃথিবীকে যৌথভাবে যে স্তুতি করা হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। বহু কর্মের নিষ্পাদক এই আকাশ এবং পৃথিবী। সুশোভন কর্মসম্পাদক এই দেবতাযুগল। সুশোভন কর্ম সম্পাদক যজমানের জন্য আকাশ এবং পৃথিবী অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। আকাশ ও পৃথিবীর উপাসকগণ সন্তান সন্ততি সমন্বিত হইয়া সমৃদ্ধিশালী হয়। উক্ত মণ্ডলের একস্থানে আকাশকে ধরাতলবাসীর জনক এবং ধরিত্রীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে—(উর্জং নো দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ পিন্বতাং পিতামাতা বিশ্ববিদা সুদংসসা—৬।৭০।৬)। ভূলোক ও দ্যুলোককে যুগপৎ 'রোদসী' বলিয়াও বেদে অভিহিত করা হইয়াছে। ৬।৫১।৫ মন্ত্রে দ্যুলোককে পিতা, পৃথিবীকে মাতা, বসুগণকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।—

'দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবী মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতা বসবো মৃড়তা নঃ'। প্রাচীন গ্রীক্ কাব্যেও আকাশকে পিতৃরূপে এবং বসুন্ধরাকে মাতৃরূপে বহু স্থানে সম্বোধন করা হইয়াছে। দেবরাজকে গ্রীক্ ভাষায় যেরূপ Zeus (জিউস) বলা হয়, আকাশকেও তদ্রূপ বহুস্থানে Zeus সম্বোধন করা হইয়াছে। এই জিউস্ সংস্কৃতের দ্যৌস্ শব্দের নিকট আত্মীয়। একটি গ্রীকৃপদ্যে দ্যুলোককে

'Zeus Pitar' বলা হইয়াছে; ইহা উক্ত বেদমন্ত্রের 'দ্যৌস্পিতর্' এর সমানার্থক; শব্দসাম্যও লক্ষণীয়।

বায়ু দেবতা

অন্যান্য দেবতার মত বায়ুদেবতার স্থান ঋগ্বেদে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। অধিকাংশ সূক্তে তিনি ইন্দ্রদেবতার সহিত স্তুত হইয়াছেন ও সোমপানকারী রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। বায়ুর কোন কায়িক বর্ণনা বেদে পাওয়া যায়না।

অন্তরীক্ষলোকের দেবতাগণের মধ্যে বায়ুই প্রধান। যাস্কাচার্য বায়ুর ব্যুৎপত্তি নিরুক্ত গ্রন্থের দৈবতকাণ্ডের দশম অধ্যায়ের প্রথম পাদে দেখাইয়াছেন —'বায়ুঃ বার্তেবা' অর্থাৎ বা ধাতু হইতে বায়ুশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সাধারণভাবে আমরা বায়ুর বিষয়ে বলিতে পারি যে বায়ু পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু তাহা চোখে দেখা যায় না। বায়ু এক নিমেষের জন্য প্রবাহিত না হইলে আমাদের জীবনধারণ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইবে। কি আশ্চর্য এই বায়ুদেবতা। তাঁহাকে দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করা যায়না; শুধু বায়ুর বেগ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ করিতে পারা যায় এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শের অনুভূতি হয়। ঋগ্বেদে স্পষ্টভাবেই ঋষিগণ গাহিয়াছেন কোথায় এই দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন? কোথা হইতেই বা এই দেবতার আগমন হইল? ক স্বিজ্জাতঃ কুত আ বভূব—১০।১৬৮।৩। দশম মণ্ডলের একশত আটষট্টিতম সূক্তে ঋষিগণ স্পষ্ট ভাবেই বায়ুকে এইরূপে স্তুতি করিয়াছেন যে তাঁহার রূপের প্রত্যক্ষদর্শন হয়না (ঘোষা ইদস্য শৃন্বিরে ন রূপম্—১০।১৬৮।৪)।

বায়ুদেবতা জলের সখা ('অপাং সখা'—১০।১৬৮।৩), জলের পূর্বে বায়ু সঞ্জাত হইয়াছে (প্রথমজা), তিনি সত্যের দ্বারা ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত (ঋতাবা); তিনি দেবসমূহের আত্মাস্বরূপ (আত্মা দেবানাম্—১০।১৬৮।৪), অপ্রতিহতগতি তিনি স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন (যথাবশং চরতি দেব এষঃ—১০।১৬৮।৪)। বায়ুদেবতা রথে আরূঢ় হইয়া গমন করেন, তাঁহার রথের শব্দ ভীষণ। বৃক্ষাদি উৎপাটন করিয়া বায়ুদেবতার রথ প্রধাবিত হয় (১০।১৬৮।১); এমন কি বায়ুদেবতার রথ যখন চলে, তখন পর্বতও কাঁপিতে থাকে। ঘোটক বাহিত রথে বায়ুদেবতা যখন গমন করেন, তখন তিনি যেন সমস্তলোকের অধীশ্বররূপেই গমন করেন (তাভিঃ সযুক্ সরথং দেব ঈয়তেঽস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য

রাজা—১০।১৬৮।২)। একস্থানে লালরঙযুক্ত ঘোটককে বায়ুর রথবাহক বলা হইয়াছে (১।১৩৪।৩)।

ইন্দ্রকে যে ভাবে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করা হইয়াছে, বায়ুকেও তদ্রূপ সোমপানের নিমিত্ত স্তুতি করা হইয়াছে (বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতা। তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্—১।২।১)। বায়ুর স্তোত্রে আরও বহু-স্থানে বায়ুকে সোমপানের নিমিত্ত স্তুতি করা হইয়াছে (১।১৩৪।১; ১।১৩৫।১)। বায়ুর নিমিত্ত সোম দুগ্ধমিশ্রিত করা হয়; সেই দুগ্ধমিশ্রিত সোম তিনি পান করেন, তিনি সোমপায়ী। সোমপানের নিমিত্ত আটানব্বইটি (৯৮) ঘোটকবাহিত রথে বায়ু যজ্ঞশালায় আগমন করেন (৪।৪৮।৪)। উজ্জ্বল ধনযুক্ত হইয়া তিনি ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞশালায় আগমন করেন (১।১৩৫।৪)। লোকের কল্যাণকর কর্মে বায়ুদেবতা সতত নিযুক্ত থাকেন। দশম মণ্ডলের একশত ছিয়াশীতম সূক্তে বায়ুকে অতি কল্যাণকর কর্মের কর্তারূপে কীর্তন করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে বায়ু ওষধির মতই গুণসম্পন্ন হইয়া আমাদের নিকট আগমন করেন; তিনি আমাদের আয়ুবর্দ্ধন করেন; তিনি মঙ্গলময় ও সুখপ্রদানকারী (বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ূংষি তারিষৎ—১০।১৮৬।১)। উক্ত মণ্ডলে বায়ুকে ঋষি তাঁহাদের পিতা ও ভ্রাতারূপে সম্বোধন করিয়াছেন (উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা ১০।১৮৬।২), বায়ু আমাদের সখাও। বায়ুদেবতার ধামে অমৃতনিধি বিরাজ করিতেছে, তাই যজমান প্রার্থনা করিতেছেন যে অমৃতের দ্বারা তাঁহাদের জীবন যেন সিক্ত হয়।

ঋগ্‌বেদে 'বাত' এবং 'বায়ু' একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। 'বাত' দেবতা ঝঞ্ঝার দেবতা। বাতদেবতা যেরূপ 'বাতাপর্জন্যা' রূপে দ্বন্দ্ববদ্ধভাবে স্তুত হইয়াছে, বায়ু দেবতাও ইন্দ্রের সহিত যুগলভাবে স্তুত হইয়াছেন। বায়ুকে সোমপানকারী রূপে বহুবার আহ্বান করা হইয়াছে; বাত দেবতার তজ্জাতীয় সম্বোধন শ্রুত হয় না।

অপাং নপাৎ

ঋগ্‌বেদের অপাং নপাৎ দেবতার সূক্ত সংখ্যা হিসাবে মাত্র একটি পূর্ণ সূক্ত পরিদৃষ্ট হয় (২।৩৫); কিন্তু দশম-মণ্ডলের সপ্তবিংশতিতম সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রে উক্ত দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।......দশম মণ্ডলের সপ্তবিংশতিতম সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে

অপাং নপাৎ জলাধিপতি দেবতা; তিনি সমুদ্রগর্ভে বসবাস করেন ('অধ্বর্যবোঽপ ইতা সমুদ্রমপ্যাং নপাতং হবিষ্য যজধ্বম্' ১০-৩০-৩)। ইন্দ্রের নিমিত্ত সোমরস প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে পবিত্র জলের প্রয়োজনে ঋষিগণ অপাং নপাৎ দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত সোমরস অর্পণ করিবেন (তস্মৈ সোমং মধুমন্তং সুনোত ১০-৩০-৩)। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে অপাং নপাৎ দেবতা সোমরস পান করেন। ঋত্বিকগণ তাঁহার সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত তাঁহাকে সোমরস অর্পণ করিলে সেই দেবতা উত্তম জল দান করিবেন ও তাহার সাহায্যে সোমরস উত্তমরূপে শোধন করা হইবে এবং সেই জল মিশ্রিত স্বাদু সোমরসই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হইবে।

অপাং নপাৎ দেবতার সূক্তসংখ্যা যদ্যপি স্বল্প তথাপি ঐ অল্পসংখ্যক মন্ত্রেই আমরা উক্ত দেবতার কায়িক বর্ণনা, প্রকৃতি প্রভৃতি জানিতে সমর্থ হই। দ্বিতীয় মণ্ডলের পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে তিনিই জীবগণের প্রাণস্বরূপ জলের দ্বারা এই অখিল সংসার রচনা করিয়াছেন (অপাং নপাৎ সুমর্যস্য মহ্না বিশ্বান্ যর্যো ভুবনা জজান)। তিনি সমুদ্রের বড়বানলের বর্দ্ধক ও পবিত্র নির্মল জল তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া রহিয়াছে (২।৩৫।৩)। অশ্বিযুগল বেদে যেরূপ অভয়প্রদানকারী দেবতা, অপাং নপাৎ দেবতাও তদ্রূপ অভয়প্রদানকারিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যজমান স্তুতি করিতেছেন,—'হে বিদ্বান! তুমি দ্রোহি হিংসুক হইতে স্তোতাকে রক্ষা কর' (স্বক্রুর্হো রিষঃ সম্পৃচঃ পাহি সূরীন্—২।৩৫।৬)। এই দেবতা মিথ্যাবাদী এবং অদানশীল কৃপণ ব্যক্তির প্রতি কখনও প্রসন্ন হন না, তাহারা তাঁহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত থাকে (২।৩৫।৬)।

বর্ষাকালে এই দেবতা প্রভূত জলপ্রদানপূর্ব্বক উত্তম অন্ন উৎপাদনের পথ সুগম করিয়া দেন। তাঁহার যজমানকে তিনি যেন ধনদান করিবার নিমিত্ত সর্বদা সমুৎসুক হইয়া আছেন।

তিনি সত্য, পবিত্র এবং তেজস্বী। সমস্ত প্রাণী তাঁহার অংশমাত্র— 'যো অপ্স্বা শুচিনা দৈব্যেন ঋতাবাজস্র উর্বিয়া বিভাতি। বয়া ইদন্যা ভুবনান্যস্য প্রজায়ন্তে বীরুধশ্চ প্রজাভিঃ'। —২।৩৫।৮। এই দেবতা ওষধি সমূহেরও উৎপাদন কর্তা।

ঋত্বিকগণ বলিতেছেন, ইলা, সরস্বতী ও ভারতী এই ত্রাসরহিতা দেবীত্রয় অপাং নপাৎ দেবতার জন্য অন্নধারণ করিয়া থাকেন। এই দেবতার রূপ, আকৃতি এবং বর্ণ সুবর্ণের মতই উজ্জ্বল। তাঁহাকে তেজস্বী ও প্রদীপ্তরূপেও

স্তুতি করা হইয়াছে। এবং তাঁহার নিবাস স্থানও হিরণ্য-ভাস্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসন্দৃগপাং নপাৎ সেদু হিরণ্যবর্ণঃ। হিরণ্যয়াৎ পরি যোনের্নিষদ্যা হিরণ্যদা দদত্যন্নমস্মৈ ॥' ২।৩৫।১০। যজমান তাঁহাকে মিত্ররূপে আহ্বান ও স্তুতি করেন (২।৩৫।১২)।

অপাং নপাৎ দেবতার এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে তিনি জলের মধ্যেই বাস করেন, তাঁহার কৃপাতেই জল পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছে, কারণ, দ্বিতীয় মণ্ডলের পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সর্বপ্রথম প্রকটিত জলই অপাং নপাৎ এবং তাহার সারভাগই হইল সোমরস। জলেই উক্ত দেবতার স্থিতি, জল দ্বারাই তিনি পরিবেষ্টিত, জলেই তাঁহার দিব্যপ্রকাশ।

এই অপাং নপাৎ দেবতার বাহ্য প্রতীক হইল বিদ্যুৎ; তিনি বিদ্যুতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তজ্জন্য স্বর্ণবর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় তাঁর আকৃতি ও বেশভূষাও হিরণ্যবর্ণ। মেঘগর্ভস্থ জল হইতেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য জলই অপাং নপাতের উদ্ভবস্থান। বর্তমান সংস্কৃতে 'নপাৎ' শব্দের অর্থ নপ্তা বা নাতি কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে 'নপাৎ' শব্দের অর্থ পুত্র; 'ন পততি বংশঃ যস্য হেতোঃ'।

অপাং নপাৎ দেবতাকে Macdonell বিদ্যুৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'আশু হেমন্'—বিশেষণটি অপাং নপাৎকে বুঝাইবার নিমিত্ত তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং একবার শুধু অগ্নিকে উদ্দেশ্য করিয়া এই বিশেষণের প্রয়োগ হইয়াছে। তাই Macdonell মনে করেন যে অগ্নির বিদ্যুৎ প্রভাই অপাং নপাৎ। কারণ, অগ্নিকে সোজাসুজি অপাং নপাৎ না বলিয়া জলে গর্ভরূপে অবস্থিত বলাই যুক্তিযুক্ত [The epithet asu-heman swiftly—'speeding', applied three times to Apam-napat, in its only other occurence refers to Agni. Hence Apam-napat appears to represent the lightning form of Agni which lurks in the cloud. For Agni, besides being directly called Apam-napat, is also termed the embryo (garbha) of the waters—A Vedic Reader for students P.P. 67]

বৃহস্পতি

বৃহস্পতিকে আমরা বাচস্পতিরূপেও জানি। ঋগ্‌বেদে বৃহস্পতিকে স্বতন্ত্রভাবে সর্বসমেত সাতটি (৭) সূক্তে এবং ইন্দ্র ও বৃহস্পতিকে একযোগে একটি সূক্তে (৪।৪৯) স্তুতি করা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের অষ্ট 'দেবসু' মধ্যে বৃহস্পতিও রহিয়াছেন বাচস্পতিরূপে। কিন্তু ঋগ্‌বেদে এই অষ্টদেবসুর নাম পাওয়া যায় না; যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রথম ইঁহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অঙ্গিরাতনয় বৃহস্পতির শান্তরূপ ও বিকটরূপ বেদে লক্ষণীয়। যাহারা প্রকৃত শান্ত, সাধু শ্রেণীর তাহাদের জন্য বৃহস্পতি অতি কমনীয়; পক্ষান্তরে, যাহারা দ্রোহী অর্থাৎ যাহাদের স্বভাব শত্রুতাচরণেই লিপ্ত তাহাদের নিকট বৃহস্পতি সংহার মূর্তিস্বরূপ। ঋষি তাঁহার স্তুতিপ্রসঙ্গে সেইজন্যই গাহিয়াছেন,—'যস্তস্তম্ভ সহসা বিজ্‌মো অন্তান্ বৃহস্পতিস্ত্রিষধস্থো রবেণ। তং প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্' (৪।৫০।১)। ইহার তাৎপর্য এই যে স্বীয় শক্তির দ্বারা বৃহস্পতি সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; সমস্ত দিক তাঁহার বশীভূত। ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক তাঁহারই অধীন; তিনি বিশিষ্ট জিহ্বাযুক্ত, প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাকে পুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই একই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে শত্রুগণ তাঁহার ভয়ে সদা কম্পমান।

এই দেবতার অবয়বের বর্ণনাও কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারা যায়। তিনি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট, তাঁহার পৃষ্ঠভাগ নীল, তাঁহার রং সুবর্ণময়। তিনি শর-চাপযুক্ত এবং সুবর্ণযষ্টি ধারণকারী। এই সুদর্শন বৃহস্পতি অনেক বাহন-যুক্ত এবং বাদ্যদ্বারা সজ্জিত (৭।৯৭।৭)। অগ্নিকে যেভাবে ঐশ্বর্যের স্বামী রূপে কীর্তন করা হইয়াছে, বৃহস্পতিকেও তদ্রূপ ধনদাতারূপে স্তুতি করা হইয়াছে। যজমানগণ ধনের আশায় উত্তমরূপে এই দেবতার স্তুতি পাঠ করেন। এক স্থানে তাঁহাকে ও ইন্দ্রকে পার্থিব এবং দিব্য ধনের অধিকারি-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—(৭।৯৭।১০; ৭।৯৮।৭)।

ঘোটক-বাহিত রথও এই দেবতার যান। তিনি সেই রথে চড়িয়া যুদ্ধ করেন ও রাক্ষস নিধন করেন।

তাঁহাকে বেদে 'বুনতেয়ঃ', 'ঋতাস্পৃশ', 'অদ্রিদুগ্ধা'—ইত্যাদি বিভিন্ন সংজ্ঞায় বিভিন্নরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। তাঁহাকে 'ভুবিজাতঃ'—উচ্চবংশ-জাতরূপেও আহ্বান করা হইয়াছে। বৃহস্পতি দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিঃ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৩।২; ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিঃ—তৈত্তিরীয়

সংহিতা ৮।১।৮) ইন্দ্রের অনেকগুলি কর্মের সহিত বৃহস্পতির কর্মের মিল পাওয়া যায়। যেমন বেদে শত্রুর বিজয়কারিরূপে ইন্দ্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ বৃহস্পতিকেও শত্রুধনাপহারী দেবতারূপে দেখিতে পাই। বৃহস্পতিকে বহুবার বৃত্রহত্যাকারী বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে; 'বল' নামক দৈত্যের কবল হইতে ইন্দ্র গাভী সমূহ মুক্ত করিয়াছিলেন, বৃহস্পতিকেও বল নামক দৈত্যের মর্দক ও গাভীর মুক্তিদাতারূপে স্তুতি করা হইয়াছে (৪।৫০।৫), ইন্দ্রের প্রিয় পানীয় দ্রব্য সুমধুর সোমরস উক্ত দেবতার পেয়। বৃহস্পতিকে সোমরস পানের নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত আহ্বান করা হইয়াছে (৪।৫০।১০) এবং সোমরস যে তাঁহার প্রিয় পেয় তাহারও উল্লেখ আছে।

চতুর্থমণ্ডলের পঞ্চাশত্তম সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বৃহস্পতিকেও অন্ধকারনাশক বলা হইয়াছে, যেমন সূর্যকে বহুবার তমোনাশকরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। বৃহস্পতির ভয়েই সূর্য বন্য পশুর মত আকাশমার্গে ভ্রমণ করেন (১।১৯০।৩)। সেই মহান্ দেবতার যশ আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র বিঘোষিত (অস্য শ্লোকো দিবীয়তে পৃথিব্যামবত্যা—১।১৯০।৪)। সুমার্গরত যজমানের তিনি মিত্র ও দুষ্টের শাস্তা—এই মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যবাণীতে শ্রুত হয়, 'পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'। সেই বলবান্ শ্রেষ্ঠ, পূজ্য বৃহস্পতি বহু মনুষ্যের উপকার সাধনের নিমিত্তই প্রকাশিত (১।১৯০।৮)। উল্কাপাতের সময় যেমন অত্যুজ্জ্বল আলোকের উদ্ভব হয়, বৃহস্পতি ঠিক তেমনি আলোকযুক্ত ও তেজস্বী (১০।৬৮।৪)। আকাশ হইতে তিনিই অন্ধকার বিতাড়িত করেন (১০।৬৮।৬)।

তিনি দিবা ও রাত্রিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন (১০।৬৮।১১)। অমঙ্গল-নাশক ও রোগ নিবারক এই দেবতা মনুষ্যের দুর্গতিও নাশ করেন (১০।১৮২।১)। যজমান স্তুতি করিতেছেন তিনি যেন তাঁহাদিগের কুবুদ্ধি ও অকল্যাণকর বিষয় নাশ করেন; রোগ বিদূরিত করিয়া তাঁহাদিগকে যেন ভয় হইতে দূরে রাখেন (১০।১৮২।৩)।

এই দেবতাকে আমরা বেদে পাঁচটি বিশেষরূপে দেখিতে পাই।

বৃহস্পতি দেব একটি বৃহস্পতি গ্রহরূপে, দ্বিতীয়তঃ, শব্দ অর্থাৎ রাত্রির দ্যোতকরূপে, তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মণস্পতিরূপে, চতুর্থতঃ, ব্রাহ্মণরূপে এবং পঞ্চমতঃ, নৃপতিগণের পুরোহিতরূপে ও দেবতাগণের পুরোহিতরূপে।

আমরা বৃহস্পতিদেবতার স্তোত্রে বহুস্থানে তাঁহাকে অত্যুজ্জ্বল ও শব্দ-কারকরূপে দেখিতে পাই। আকাশে বজ্রের শব্দ এই বৃহস্পতিদেবের শব্দ

মনে করিলে এবং বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে বৃহস্পতিকে বিদ্যোতিত মনে করিলে আমরা বলিতে পারি যে এই বৃহস্পতি দেবতা বিদ্যুৎ ও বজ্রের দ্যোতক।

যে রাজা ব্রাহ্মণপুরোহিত বৃহস্পতিকে অনুবর্তন করেন অর্থাৎ তাঁহার নির্দেশমতন রাজত্ব পরিচালনা করেন প্রজাগণ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সেই নৃপতির বশ্যতা স্বীকার করে,—'তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবানমন্তে যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি'।

রাত্রিদেবী- বেদে রাত্রিদেবীর স্তবও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দেবীর উদ্দেশ্যে স্তুত মন্ত্র সংখ্যা স্বল্প, মাত্র দুইটি সূক্তেই তাঁহার স্তব দৃষ্ট হয়। প্রথম মণ্ডলের শততম সূক্তে রাত্রিদেবীর উল্লেখ রহিয়াছে আবার দ্বিতীয়-মণ্ডলের দ্বাত্রিংশত্তম সূক্তে এবং দশম মণ্ডলের একসপ্তবিংশতিতম সূক্তে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এবং চিত্তাকর্ষকভাবে রাত্রী দেবী আরাধিত হইয়াছেন। দশমমণ্ডলের উক্ত সূক্তটি কাব্যিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়।

নিঘণ্টুতে তেইশটি রাত্রিবাচক শব্দ দৃষ্ট হয়; —শ্যাবী, ক্ষপা, শর্বরী, অক্তু, ঊর্ম্যা, রাম্যা, যম্যা, নম্যা, দোষা, নক্তা, তমঃ, রজ, অসিক্নী, পয়স্বতী, তমস্বতী, ঘৃতাচী, শিরিণা, মোকী, শোকী, ঊধঃ, পয়ঃ, হিমা, বাস্বী।

এই রাত্রিবাচক তেইশটি শব্দের মধ্যে কয়েকটির ব্যবহার লৌকিক সংস্কৃতেও দৃষ্ট হয়। তবে অল্প কয়েকটি স্বল্প পরিবর্তিত রূপে লৌকিকে স্থান পাইয়াছে। যেমন—বেদে নক্তা কিন্তু লৌকিকে নক্তম্ (রাত্রি)। ক্ষমা, শর্বরী প্রভৃতি লৌকিকে অপরিবর্ত্তিতভাবেই ব্যবহৃত হয়। গোধূলির প্রথম-ভাগ ধবলবর্ণ ধারণ করে, এই জন্য রাত্রির একটি নাম শ্যাবী। 'ক্ষীপ্যতে সূর্যাচারেণ ক্ষপা' – ক্ষীর স্বামীর এই অভিমতের তাৎপর্য হইল এই যে সূর্যের অস্তাচলে যিনি প্রেরিত হন তিনিই ক্ষপা। এই ভাবে বিশেষ বিশেষ অর্থে রাত্রির এক একটি নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যাস্কাচার্যের মতে 'রম্' ধাতুর সহিত ত্রিপ্ প্রত্যয়যোগে রাত্রিশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্ব স্ব কর্ম হইতে দিবাচর প্রাণিবর্গ বিরত হয় বলিয়াই রাত্রিশব্দ (উপরমন্তি দিবাচরাঃ স্বব্যাপারেভ্যঃ)। একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সূর্য হইতেই রাত্রি জাত হইয়াছেন (যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায় এবা রাত্র্যুষসে—১।১১৩।১)। সূর্য অস্তগামী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রির আগমন হয় বলিয়াই সূর্য হইতে রাত্রির জন্ম হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। আকাশপুত্রী রাত্রিদেবী ঊষার ভগিনী। একই পথে উভয়ের আসা-যাওয়া কিন্তু কখনও উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় না।

দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাত্রিংশত্তম সূক্তে রাত্রিদেবীর বর্ণনা ভাষার চমৎকারিত্বে এবং বর্ণনামাধুর্যে অনুপম হইয়া উঠিয়াছে। শোভনীয়া রাত্রিদেবী আবাহন যোগ্যা; ধনসমন্বিত বীরপুত্রলাভার্থে তাঁহার স্তব করা হয়। এই সৌভাগ্য-শালিনী দেবী আমাদের বিবিধ ভাবে রক্ষা করেন। স্থূল আধারযুক্তা রাত্রিদেবী দেবতাকুলের ভগিনীরূপে বর্ণিতা (সিনীবালি পৃথুষ্টকে যা দেবানামসি স্বসা—২।৩২।৬)। বহু প্রজননসম্পন্না, অন্ধকারযুক্ত শোভনীয় বাহু এবং অঙ্গুলিযুক্তা বলিয়া রাত্রিদেবীর বর্ণনা রহিয়াছে, (যা সুবাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ সুষূমা বহুসূবরী—২।৩২।৭)। অন্ধকারের রাণী রাত্রিদেবী, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র যেন তাঁহার রত্নালঙ্কার (রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্য ক্ষভিঃ। বিশ্বা অধিশ্রিয়োঽধিত—১০।১২৭।১)।

রাত্রিদেবী স্বর্গস্থ দেবকুল এবং পৃথিবীস্থ প্রাণীকুলকে স্থাবরজঙ্গমকে সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার জ্যোতির উদ্‌গমেই অন্ধকার নাশ হয় (ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ—১০।১২৭।২)। বিহগকুলের আশ্রয় যেমন বৃক্ষ তেমন কল্যাণকারিণী রাত্রি-দেবীর ক্রোড়েই আমাদের সুষুপ্তি ঘটে। জগতের সকলপ্রকার কোলাহল রাত্রিদেবীর আগমনেই নিঃশেষ হয় এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি নিদ্রাদেবীর কোলে নিজেদের সমর্পণ করে। বৃকাদি বন্যজন্তু এবং তস্করাদি যেন যজমানের কোনপ্রকার অপকার করিতে সক্ষম না হয়, এইজন্যেই রাত্রিদেবীর স্তব করা হয়।

এই দিব্যালঙ্কারভূষিতা, কল্যাণকারিণী রাত্রিদেবীকে গুঙ্গু, সরস্বতী, ইন্দ্রানী, কুহুদেবপত্নী প্রভৃতির সহিত উত্তম আশ্রয় লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে (যো গুঙ্গুর্যা সিনীবালি যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ২।৩২।৮)।

ঋগ্‌বেদের এই রাত্রিদেবীর সূক্তরাজিতে এবং বাগ্‌দেবীর সূক্তে (১০-১২৫) বৈদিকোত্তর যুগের শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর উৎপত্তির বীজ নিহিত আছে।

এই সকল প্রসিদ্ধ দেবদেবী ব্যতীত ঋগ্‌বেদে কয়েকজন অপ্রসিদ্ধ দেবীর নাম পাওয়া যায় যথা—ইন্দ্রানী, অরণ্যানী, সীতা, ইলা, সরণ্যূ, সূর্যা, অসু, রাকা প্রভৃতি। তাঁহাদের সূক্তগুলি কাব্যরসে সমৃদ্ধ। আমরা তাদৃশ অপ্রসিদ্ধ কয়েকজন দেবীর পরিচয় দিতেছি।

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রের পত্নীর নাম ইন্দ্রাণী। তাঁহার অপর নাম পুলোমপুত্রী

বা শচী। সেই ইন্দ্রাণীকে স্তুতি করা হইয়াছে 'ইহেন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে' (১।২২।১২)। ইন্দ্রাণীকে বেদে অতি সৌভাগ্যশালিনী রমণী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কারণ তাঁহার প্রভু ইন্দ্র কখনও জরাবার্দ্ধক্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হন না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাসহাকে ইন্দ্রের পত্নীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার, শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।২।১।৮) সেই প্রাসহাই ইন্দ্রাণীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঋগ্‌বেদের ১০—১৪৫ সূক্তের ঋষি ইন্দ্রাণী এবং ১০—১৫৯ সূক্তের ঋষি পুলোমপুত্রী শচী। এই দুই সূক্ত হইতে জানা যায় যে ইন্দ্রের বহু পত্নী ছিল এবং তাহাদের প্রতি শচীর দ্বেষ ছিল। ১০—১৪৫ সূক্তের নামই সপত্নীবাধন; তাহার প্রথম ঋকে বলা আছে সপত্নীগণের নাশ জন্য শচী এক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। দশমমণ্ডলের একশত পঞ্চচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথম চারিটি মন্ত্রের অর্থ অতি চমৎকার। সপত্নীগণের প্রতি প্রতি-পত্নীর মনোভাব প্রতিযুগেই একরূপ।

অরণ্যাণীদেবী—অপ্রসিদ্ধ দেবীগণের মধ্যে অপূর্ব কাব্য-রসে পরিপূর্ণ অরণ্যাণীদেবীর বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বলা হইয়াছে,—'অরণ্যাণীদেবী কাহারও প্রাণবধ করেন না। যদি ব্যাঘ্র, তস্কর ইত্যাদি না আসে তাহা হইলে কোন ভয় নাই। বনে স্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতে পারিবে'।

আরও একটি মন্ত্রে ঋষি বনদেবীর স্তুতি করিতেছেন,—'আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্। প্রাহং মৃগানাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্', (১০—১৪৬—৬)—অর্থাৎ অরণ্যাণীর সৌরভ কস্তুরীর ন্যায়। তথায় যথেষ্ট খাদ্যও পাওয়া যায়। প্রথমে অরণ্যে কৃষিকার্য্যের অভাব ছিল। অরণ্যাণী হরিণদের মাতৃরূপিণী। বহুপ্রকারে আমি অরণ্যদেবীর স্তুতি করিতেছি। অরণ্যাণীতে শান্ত, চোর এবং হিংস্র প্রভৃতি সকল প্রকৃতির প্রাণীর বসবাস সম্ভব। শান্তপ্রকৃতির মুনি ঋষিগণ অরণ্যদেবীর অনায়াসলভ্য ফল খাইয়া জীবন ধারণ করেন (স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায়ং যথাকামং নিপদ্যতে—১০—১৪৬—৫)। চোরও অরণ্যে আশ্রয় নিতে পারে আর ব্যাঘ্র, সিংহ-আদি হিংস্র জন্তুরও অরণ্যই নিবাসভূমি।

সরণ্যু—যমরাজের মাতার নাম সরণ্যু। ঋগবেদের দশম মণ্ডলের সপ্তদশ সংখ্যক সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে সরণ্যুর বর্ণনা বিবস্বানের জায়ারূপে ও যমের মাতারূপে পাওয়া যায়। এই সরণ্যুদেবীর বিবাহে ত্রিলোকের সকলেই আমন্ত্রিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার যুগল এই দেবীর যোনিসম্ভূত। সরণ্যু

ত্বষ্টার দুহিতা। 'ত্বষ্টাদুহিত্রে বহতুং কৃনোতী ভুবনং সমেতি। যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ' (১০—১৭—১)।

ইলা—অগ্নিদেবতার স্ত্রীরূপে ইলা বেদে কীর্তিতা। নিরুক্তকার যাস্কাচার্য বলিয়াছেন 'অগ্নায়ীলেতি স্ত্রিয়ঃ' অর্থাৎ 'অগ্নায়ী' 'ইলা'—এই দুই দেবী অগ্নির স্ত্রী। ইলাকে ঋগ্‌বেদে নানারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রে ইলাকে ধৃতহস্তা, অন্নরূপিণী, হবির্লক্ষণাদেবী বলা হইয়াছে। আবার অন্য একটি মন্ত্রে (১০—৭০—৮) ইলাকে মনুর যজ্ঞের হবিঃসেবনকারিণীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩১—১১ সূক্তে অনবদ্য ভাষায় এই দেবীকে বর্ণনা করা হইয়াছে যে ইলাই মানবজাতির পৌরোহিত্য-কারয়িত্রী এবং নহুষের উপদেশদাত্রীরূপে দেবতাগণ তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন —

'ইলামকৃণ্বন্ মনুষ্যস্য শাসনীং
দেবা অকৃন্বন্ নহুষস্য বিশ্‌পতিম্।'

সীতা—যে সীতাকে লইয়া আদি কবি বাল্মিকী আদিকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সীতার নামও বেদে পাওয়া যায়। তবে রামায়ণের সীতা ও বেদের সীতা এক নহে। বেদে সীতা শব্দের অর্থ হইতেছে হলকর্ষণের দ্বারা চিহ্নিত ভূমিরেখা। শুক্ল যজুর্বেদের ভাষ্যকার মহীধরও সীতা শব্দের একই অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত রামায়ণে যেরূপ সীতাকে নরকলেবর-ধারিণী দেবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, ঋগ্‌বেদেও সীতাকে চিন্ময়ী দেবী-রূপেই স্তুতি করা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের ৪—৫৭—৫, ৬, ৭ তিনটি মন্ত্রে সীতার গুণানুকীর্তন করা হইয়াছে। এই সূক্তে চতুর্থ মন্ত্রে লাঙ্গলের নাম (শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্) এবং লাঙ্গলের ফালার নাম (শুনং ন ফালাবিকৃষন্ত ভূমিম্) অষ্টম মন্ত্রে দৃষ্ট হয়।

সীতা সৌভাগ্যবতী, পৃথিবীর নিম্নপ্রদেশে দেবী সীতা গমন করিতে পারেন। যেহেতু সীতা দেবী সৌভাগ্যপ্রদায়িনী সেই জন্যই আমরা দেবীর স্তুতি করিতেছি।

[অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি ॥
(৪—৫৭—৬)]

সূর্যা—সূর্যের পুত্রীর নাম সূর্যা। ঋক্ সংহিতায় সূর্যাকে দেবী এবং ঋষি উভয় সংজ্ঞাই দেওয়া হইয়াছে (১০—৮৫)। সূর্যার বিবাহের পর অশ্বিনী-

কুমারযুগল এক রথে তাঁহাকে লইয়া যান। দশমমণ্ডলের ৮৫—২০ মন্ত্রে সূর্যার বিবাহে কিংশুক পুষ্পে শোভিত রথের মনোরম বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে --

'সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং
সুবৃতং সুচক্রম্।
আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে
বহতুং কৃণুষ্ব' ॥ ২০ ॥

অর্থাৎ 'হে সূর্যে, পতিগৃহে গমন করিবার সময় তুমি শ্রেষ্ঠ পলাশ ও শাল্মলী কাষ্ঠ নির্মিত অতি সুন্দর সুবর্ণের মত উজ্জ্বল এবং চক্রযুক্ত-রথে আরোহণ কর। হে সূর্যে, সোমের সুখের নিমিত্ত তুমি অমৃতলোকে গমন কর'। এই সূক্তে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক-ভাবে সূর্যার অনেক প্রকার বর্ণনা আছে।

অসুনীতি দশম মণ্ডলের ৫৯—৫, ৬ ঋকে ঋষি অসুনীতির স্তুতি করিয়াছেন। অসুনীতিকে সেখানে প্রাণনেত্রীরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে- 'হে অসুনীতে! আমাদের মন আমাদের নিকট দাও। আমাদিগকে উত্তম পরমায়ু প্রদান কর। সূর্য যে স্থানে আছেন, সেই স্থানে বসবাসের যোগ্যতা আমাদের দাও'—(১০।৫৯।৫)। ষষ্ঠমন্ত্রে স্তুতি করা হইতেছে—'হে অসুনীতে! আমার প্রাণ পুনরায় আমাকে প্রত্যর্পণ কর। আমাকে পুনরায় নেত্র প্রদান কর যাহাতে আমি ভোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হই। আমার যেন কখনও নাশ না হয় এবং আমার যেন চিরকাল কল্যাণ সাধিত হয়। আমি যেন সূর্যের দর্শনের জন্য চিরকাল বিদ্যমান থাকি'

'অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তমনুমতে মৃডয়া নঃ স্বস্তি ॥'
(১০ – ৫৯ - ৬)

সিনীবালী, রাকা, গুংগু—এই দেবীত্রয়ের নামের উল্লেখ ২—৩২—৫, ৬, ৭, ও ৮ এই চারিটি মন্ত্রে পাওয়া যায়। সিনীবালী সুবাহু, সুন্দর অঙ্গুলীযুক্তা, লোকরক্ষিণী এবং বহুপ্রসবিনীরূপে বন্দিতা হইয়াছেন।

রাকা দেবী ধনদাত্রী এবং শোভনা। উক্ত সূক্তের অষ্টমমন্ত্রে গুঙ্গু, সরস্বতী, ইন্দ্রাণী এবং বরুণানীকেও আহ্বান করা হইয়াছে। দশম মণ্ডলের ১৮৪ সূক্তের নাম গর্ভরক্ষণ সূক্ত। উক্ত সূক্তে সিনীবালী ও

সরস্বতীকে গর্ভ রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে। সিনীবালী দেবতাগণের ভগিনী রূপেও বন্দিতা (যা দেবানামসি স্বসা ; ২—৩২—৬)।

পৃশ্নিদেবী—ঋগ্বেদের এই পৃশ্নিদেবীর নাম বা বর্ণনা পৃথক ভাবে পাওয়া যায় না। ইঁহাকে মরুদ্গণের মাতারূপে আমরা বেদের মন্ত্রে দেখিতে পাই। প্রথম মণ্ডলের ২৩।১০ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে। উগ্রা হি পৃশ্নিমাতরঃ'—অর্থাৎ সমস্ত মরুৎ সংজ্ঞক দেবগণকে সোমপানের নিমিত্ত আমি আমন্ত্রণ করিতেছি। সেই পৃশ্নিপুত্রগণ অতি উগ্র। অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দশম মন্ত্রে পৃশ্নিদেবীকে সোমরস আহরণ-কারিণীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে 'ত্রীণিসয়াংসি পৃশ্নয়ো দুদ্রহে বজ্রিণে মধু। উৎসং কবন্ধমুদ্রিণম্'—অর্থাৎ মরুৎসংজ্ঞক দেবগণের মাতা পৃশ্নিদেবী বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত 'উৎস' 'কবন্ধ' এবং 'অদ্রি' নামক তিন সরোবরে মধুর সোমরস দোহন করিয়াছিলেন।

শ্রীদেবী—বেদের অপ্রসিদ্ধ দেবীগণের মধ্যে শুক্লযজুর্বেদে শ্রীদেবীর বর্ণনায় কাব্যিক সৌন্দর্য্য সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীশব্দের অর্থ সম্পদ লক্ষ্মী, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি। এই সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই শ্রীদেবীরূপে বন্দিতা হইয়াছেন। শ্রীমৎ সায়নাচার্য শ্রীসূক্তের প্রথম মন্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে জাতবেদা অগ্নিই শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হরিণীরূপে অরণ্যে সঞ্চরণ করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকা দেবীপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। সায়ণ বলেন—"শ্রীর্ধৃত্বা হরিণী-রূপমরণ্যে সংচচার হেতি দেবীপুরাণাচ্চ"। এই শ্রীদেবী সুবর্ণ ও রজত পুষ্পে গ্রথিত মাল্যে বিভূষিতা ; হিরণ্ময়ী দেবী চন্দ্রের মত শোভা পাইতেছেন। এই দেবী অনেক সুলক্ষণযুক্তা—

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাং।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ"॥

ইহার তাৎপর্য এই যে, হে জাতবেদ, তুমি হিরণবর্ণা, হরিণী, স্বর্ণরজত-নির্মিত পুষ্পমাল্য শোভিতা, চন্দ্রাভাযুক্তা ও স্বর্ণবর্ণা লক্ষ্মীদেবীকে আনয়ন কর ; কারণ তুমি শ্রুতি বচনে হোতারূপে পরিচিত। পদের লালিত্যে ও কাব্যিক সৌন্দর্যে এই শ্লোকটি সত্যই মনে এক অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার করে। সমগ্র শ্রীসূক্তই অতি মধুর, উপমাসমৃদ্ধ ও কাব্যরসোচ্ছল। সেই শ্রীদেবীর অনুগ্রহে যজমান সুবর্ণ, গো, ধেনু, অশ্ব, পুত্র, পৌত্র, মিত্র ইত্যাদি ধন লাভ করিয়া থাকেন (যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহং—২)। ঋষি

প্রার্থনা করিতেছেন 'দেবতাগণ কর্তৃক বন্দিতা পদ্মবিভূষিতা উজ্জ্বল যশোময়ী আনন্দদায়িনী শ্রীদেবীর আমি শরণাপন্ন, তিনি আমার অশুভ অলক্ষ্মীকে নাশ করুন।'

'চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে
দেবজুষ্টামুদারাম্।
তাং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে,
নশ্যতাং ত্বাং বৃণে॥'

পরিশিষ্ট (খ)

ঋগ্‌বেদের সংবাদসূক্ত (Dialogue Hymns)

ঋগ্‌বেদের প্রায় কুড়িটি সূক্তের সহিত মহাকাব্যের এবং নাটকের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। সংবাদ-সূক্ত বলিয়া সুপরিচিত এই বর্ণনামূলক সূক্তগুলিকে ওল্ডেনবার্গ (Oldenberg) 'আখ্যান সূক্ত' (Narrative Hymns) নাম দিয়াছেন। ওল্ডেনবার্গের মতে প্রাচীন মহাকাব্য ছিল গদ্য এবং পদ্যের সংমিশ্রণ ; কথোপকথনগুলি ছিল পদ্যাত্মক এবং বর্ণনাসমূহ ছিল গদ্যাত্মক। পদ্যাংশটি কেবল মাত্র বংশানুক্রমে সংরক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু গদ্যাংশটির সংরক্ষণ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। ফলে মন্ত্রবহুল ঋগ্‌বেদের ন্যায় সামবেদেও গদ্যাংশের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। ওল্ডেনবার্গ তাঁহার তথ্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেই যে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ ছিল তাহা নহে, প্রাচীন আইরিশ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি দেশের আদিম সাহিত্যও গদ্যাত্মক এবং পদ্যাত্মক। সকল স্থলেই পদ্যের সহিত গদ্যও সংরক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু ঋগ্‌বেদে গদ্যাংশের সংরক্ষণ সম্ভব হয় নাই।

অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গের এই সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। ম্যাক্‌স্‌মূলার এবং সিলভ্যাঁ লেভির মতে ঋগ্‌বেদের সংবাদ-সূক্তগুলি হইল এক ধরণের নাটক। মূলারের এই মতবাদটি হার্টেল (Hertel), শ্রোয়েডার (Schroeder), ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের উৎস বা বীজ হইল ঋগ্‌বেদের সংবাদসূক্তগুলি। ভিন্টারনিৎস্‌ এই পরস্পর বিরোধী দুইটি মতের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাচীন ব্যালাড্‌ বা লোকগীতিগুলিই মহাকাব্য এবং নাটক উভয়ের উৎস। বর্ণনাভঙ্গী এবং নাটকীয় বস্তুর সহযোগেই এই ব্যালাড্‌ কাব্যগুলি গঠিত। মহাকাব্য হইল প্রধানতঃ বর্ণনামূলক এবং নাটকের বীজ এই ব্যালাড্‌ কাব্যের মধ্যেই নিহিত। তিনি বলেন যে আখ্যান খুব সামান্য ক্ষেত্রেই ওল্ডেনবার্গের অনুমিত গদ্যাত্মক মূল কাব্য ছিল। তবে এই ধরণের কোন কাব্যেই মহাকাব্যের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়না আবার নাটকের পূর্ণরূপও

পাওয়া যায়না। সংবাদ-সূক্তগুলি অংশতঃ মহাকাব্যধর্মী ও অংশতঃ নাট্যধর্মী। ঋক্‌সংহিতার পরবর্তী বাঙ্‌ময়ে সংবাদ-সূক্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। নিম্নে ঋক্‌সংহিতার কয়েকটি প্রখ্যাত সংবাদ-সূক্তের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

পুরুরবা-উর্বশী সংবাদ;— ঋগ্‌বেদে পুরুরবা এবং উর্বশীর আখ্যান সংবলিত সংবাদ-সূক্তটি (১০।৯৫) অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। মর্ত্তের মানব পুরুরবা স্বর্গের অপ্‌সরা উর্বশীর প্রেমে গভীর ভাবে আবদ্ধ। বর্ষচতুষ্টয় উর্বশী পুরুরবার পত্নীরূপে মর্তভূমিতে অধিষ্ঠান করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন গর্ভবতী হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। উন্মত্তপ্রায় পুরুরবা বাহির হইলেন প্রেয়সীর সন্ধানে। অবশেষে উর্বশীর সন্ধান পাইলেন এক সরোবরে; স্বর্গের অপ্‌সরী তখন সঙ্গিনীদের সহিত জলক্রীড়ায় ব্যাপৃতা।

ঋগ্‌বেদে কীর্ত্তিত এই আখ্যানটি শতপথ ব্রাহ্মণে গদ্যাকারে আখ্যানের রূপ লইয়াছে (১১, ৫, ১)। এই ব্রাহ্মণে আখ্যানটির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দৃষ্ট হয়। উর্বশী কয়েকটি বিশেষ সর্ত্তে পুরুরবার সহধর্মিনী হইতে সম্মত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি হইল যে তিনি পুরুরবাকে বিবস্ত্র অবস্থায় কখনও যেন দর্শন না করেন; করিলে তিনি অন্তর্ধান করিবেন। এদিকে গন্ধর্বগণ সাময়িকভাবে মর্ত্যবাসিনী উর্বশীকে গন্ধর্বরাজ্যে ফিরিয়া পাইতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে একদিন রাতের অন্ধকারে উর্বশীর প্রতিপালিত অতি আদরের মেষশাবক দুইটি অপহরণ করিলেন। শাবক দুইটি উর্বশীর শয্যার পায়াতে বদ্ধ ছিল। ঐ সময় পুরুরবা সম্পূর্ণ নগ্ন ছিলেন এবং পোষাক পরিধান সময় সাপেক্ষ বলিয়া তিনি সেই অবস্থাতেই অন্ধকারের মধ্যে তস্করদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তে গন্ধর্বকুলপ্রেরিত বিদ্যুতের তীব্র আলোকে রাজার নগ্নরূপ উর্বশীর সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এইভাবে পুরুরবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়ায় উর্বশী তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন। দুঃখে উন্মত্তপ্রায় রাজা তখন বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উর্বশীসহ কয়েকজন অপ্‌সরা রাজহংসের রূপ ধরিয়া সন্তরণরত ছিলেন। এই সময় উর্বশীর সহিত রাজার যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই অনবদ্য সাবলীল সংলাপ ঋগ্‌বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। উর্বশীকে ফিরাইবার জন্য রাজার সকল আকুতি সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল। উর্বশীর মন টলিল না। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—"নারীজাতির সহিত কোন স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় না; শালাবৃক অর্থাৎ হায়েনার হৃদয়ের মতই তাহাদের হৃদয় কঠোর ও

নিষ্ঠুর।" ইহা একটি যুগপৎ সম্ভোগশৃঙ্গার ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের মর্মস্পর্শী করুণ প্রেমের কাহিনী। ইহার আবেদন চিরন্তন ও বিশ্বজনীন। পরবর্ত্তী ভারতীয় কবি-মানসে ইহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। হরিবংশ, বিষ্ণু পুরাণ, কথাসরিৎসাগরে এই উপাখ্যানটির উল্লেখ রহিয়াছে। কবিবর কালিদাসের বিশ্রুত বিক্রমোর্বশীয় নাটকের উপজীব্য কথাবস্তুও এই সংবাদ-সূক্ত।

যম-যমী-সংবাদ :—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্তে আমরা যম এবং যমীর কথোপকথনের মধ্যে প্রাচীনকালের আরও একটি মূল্যবান আখ্যান পাই।

ঋগ্বেদে শিশুমার একটি বৃক্ষরূপে কল্পিত। যমদেব সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া অন্য দেবতার সহিত সোম পান করেন (১০·১৩৫ ১)। যম ও যমী মনুর ন্যায় বিবস্বানের সন্তান। যম-যমী সংবাদে যমী যমকে বলিতেছে— "বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে, নির্জন প্রদেশে তুমিই (যমই) আমার (যমীর) সহচর"। পৃথ্বী-বক্ষে সর্বপ্রথম মানবজাতির উৎপত্তি প্রথম প্রেমিক-প্রেমিকা হইতেই হইয়াছিল। এই তথ্যের ইঙ্গিত আখ্যানটিতে ও এই কথোপকথনে পাওয়া যায়। পৃথিবীর বক্ষ হইতে মানবজাতি যাহাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া না যায় সেইজন্য যমী তাহার ভ্রাতাকে তাহার সহিত অবৈধ মিলনে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করিতেছে। ভ্রাতাকে ভগ্নীর প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্য ভগ্নী কামোদ্দীপক শব্দরাজির দ্বারা তাহার অবৈধ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। যম ছিল অত্যন্ত সংযমী। সে অতি সাধু ও নম্রভাষায় সুনীতি ও সন্মার্গ স্মরণ করাইয়া দিল এবং রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত পুরুষ-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্নীর মিলন যে অবৈধ ও নিষিদ্ধ—তাহা ভাল ভাবে বুঝাইয়া ভগ্নীকে সেই অন্যায় কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিল। এই সকল বাক্যালাপে ভাবের দুর্বোধ্যতা রহিয়া গিয়াছে। এই আখ্যানটি কি ভাবে সমাপ্ত হইল তাহা কথিত হয় নাই। উপরন্তু এই আখ্যাননিষ্ঠ পরবর্ত্তী কোনও সাহিত্য এই সংবাদের পরিণতির উপর কোনও আলোকপাত করে নাই। বাইবেলে প্রথম পুরুষ আদম ও প্রথম স্ত্রী ইভের পুত্র ও কন্যার মধ্যে অবৈধ বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনের কাহিনী যম-যমীসংবাদ পাঠে স্বতঃই মনে উদিত হয়।

সরমা-পণি সংবাদ :—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একশত আট সংখ্যক সূক্তে সরমা ও পণির উক্তি-প্রত্যুক্তি বা সংলাপ বর্ণিত হইয়াছে। পণিগণ ইন্দ্রের গাভীসমূহ অপহরণ করিয়া কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সেই গুপ্ত স্থানটি ছিল পর্বত-বেষ্টিত। ঋষিগণের কোন কিছুই অজানা ছিল

না। বৃহস্পতি, সোম ও মেধাবী ঋষিগণ এই সংবাদ জানিতেন। সরমাকে দেবরাট্ ইন্দ্র দূতী হিসাবে গাভীসমূহের অন্বেষণ জন্য পাঠাইলেন। সরমা বহুদূরস্থান অতিক্রম করিয়া রসা নদী পার হইয়া গাভীর রব শুনিতে পাইল। পণিগণ বেশ স্পষ্টই বুঝিল যে ইনি ইন্দ্রের দূতী। গাভী প্রত্যর্পণ করিতে সরমা পণিগণকে বলিল। পণিরা সরমার কথা প্রথম উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল। পণিরা সরমাকে সেখানে তাহাদের ভগ্নীরূপে অবস্থান করিতে বলিল, উদ্দেশ্য ছিল এই সরমা যেন পুনরায় ইন্দ্র সমীপে প্রত্যাবর্তন না করিতে পারে। সরমাকে ভুলাইবার জন্য পণিরা নানা প্রলোভনপূর্ণ বাক্য শুনাইতে লাগিল, "হে সরমা, কি কার্যের জন্য তুমি এই স্থানে আসিয়াছ, এই স্থান তো অতি দূরবর্ত্তী। এই স্থানে যে আসে সে আর পশ্চাৎ ফিরিতে পারে না। এই গভীর রাত্রে তুমি এইস্থানে আসিয়াছ ; তুমি এই সুগভীর নদী কি ভাবে অতিক্রম করিলে। আমাদের এখানে তুমি কি বস্তুইবা ইচ্ছা কর"। তদনন্তর সরমা তাহার আগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। এই সরমা-পণির কথোপকথনে ইন্দ্রের বল-বিক্রমও সরমা বর্ণনা করিয়াছে। ইন্দ্র সমস্ত পণিগণকে ধরাশায়ী করিবে তাহাও শুনাইয়াছে। তদনন্তর পণিগণ বলিল যে তাহারা গো-অশ্বাদি নানা ঐশ্বর্যে বিভূষিত ; উপরন্তু পর্বত-বেষ্টিত দুর্গম তাহাদের নিবাস স্থান, ইন্দ্র তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না। সরমা পণিদের চক্রান্তমূলক ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্ক উপেক্ষা করিয়া পণিগণকে অতি দূরদেশে পলায়ন করিতে নির্দেশ দিল।